সূচীপত্র

দুমুখো সাপ
গন্তব্য
গল্পসংগ্রহ (১ম ২য় ৩য় ৪র্থ
মাসের প্রথম রবিবার
বারো বিলাসিনী
হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
জগদ্দল
নাটের গুরু
লগ্নপাত্ত
হ্রেষাধ্বনি
রূপায়ণ
অপরিচিত
বিষের স্বাদ
দুরন্ত চড়াই
অলিন্দ
অন্ধকার গভীর গভীরতর
ত্রিধারা
চৈতি
আঁধির আলোয়

চেতনার অন্ধকারে

সকলের মুখে এক কথা।

সকলের মুখে একই প্রশ্ন। 'একি, ওকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

কী রকম দেখাচ্ছে? ললিতাকে কি আর চেনাই যাচ্ছে না? দেড় মাসের মধ্যে একটা মানুষের—একটি মেয়ে কতখানি বদলে যেতে পারে, কত পরিবর্তন হতে পারে যে, সকলের-সবাইয়ের মুখে কেবল এক কথা, একই জিজ্ঞাসা, 'ললিতাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? দেড় মাস বাদে বেড়িয়ে ফিরল। যাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল, তাদের সবাইয়েরই রীতিমতো চেহারা ফিরে গিয়েছে। ওকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

বাড়ির সবাই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললো। ললিতাকেও জিজ্ঞেস করলো। ললিতা সকলের সামনেই হাসলো। হেসে অবাক হয়ে, ভুরু বাঁকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'কেমন আবার দেখাচ্ছে। আমি যেমন ছিলাম, তেমনিই আছি। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কথাটা কেউ বিশ্বাস করলো না। বাড়ির সবাই ওর মুখের দিকে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলো। ললিতার হাসির মধ্যে গভীর কোন রহস্য লুকিয়ে আছে কী না, বোঝবার চেষ্টা করলো ওর মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু সকলের মুখ দেখেই বোঝা গেল, কেউ কোন রহস্য উদ্ধার করতে পারছে না।

এমন কি, ললিতা যাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল, বড় দাদা আর বড় বৌদি, তারাও অবাক। তাদেরও একই জিজ্ঞাসা। ওর বড়দা, একমাস আগে, বাইরে থাকতেই জিজ্ঞাসা করেছিল, 'হ্যাঁ রে ললু, তোর কি শরীর-টরীর খারাপ হয়েছে নাকি?'

ললিতা জবাব দিয়েছে, 'না তো।'

বৌদি বলেছে, 'কিন্তু তোমাকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

ললিতা হেসে বলেছে, 'কোথায়?'

বড়দা বলেছে, 'না না, হাসির কথা না ললু, শরীর যদি খারাপ হয়ে থাকে,

বলবি তো। তোর বৌদি বলছিল, ক'দিন ধরে তোকে যেন কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। চুপ করে বসে যেন কী ভাবিস?'

মনে পড়ছে, ললিতা তখন দাদা-বৌদির সঙ্গে, বম্বে ছেড়ে হায়দ্রাবাদের দিকে চলেছে। চলেছে মানে, বম্বে থেকে যেদিন অওরঙ্গাবাদ যাওয়া হবে, তার আগের দিন রাত্রে, হোটেলের ঘরে বসে এই সব কথাবার্তা চলছিল।

দাদার কথা শুনে ললিতা আবার তেমনি করে হেসেছিল। বলেছিল, 'বৌদি ভুল দেখেছে।'

ললিতা টের পেয়েছিল, বৌদি ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছিল। বৌদি যেন ওর মুখ আর শরীরের দিকে দেখে, কিছু আবিষ্কার করতে চাইছিল। বলেছিল, 'সেটা না হয় ভুল দেখেছি ভাই, প্রায় দিন তিনেক ধরে তুমি মোটেই ভাল করে খাচ্ছ না, সেটাও কি ভুল দেখেছি?'

ললিতা তখন শব্দ করেই হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'কী যে বল তুমি বৌদি, তার ঠিক নেই। হঠাৎ আমি কম খেতে যাব কেন?'

দাদা-বৌদি দু'জনেই ললিতার মুখের দিকে তাকিয়ে, খানিকক্ষণ চুপ করেছিল। তখনকার মতো, বৌদি আর কোন কথা না বলে, সামনে থেকে চলে গিয়েছিল। চলে যাওয়ার ভঙ্গি থেকেই বোঝা গিয়েছিল, বৌদি রাগ করেছে। করাটাই স্বাভাবিক, কারণ বৌদির সঙ্গে ওর যথেষ্ট সখিত্ব। বৌদির একটা দাবি আছে, ললিতার কিছু হয়ে থাকলে, ও তা নিশ্চয়ই তাকে বলবে।

দাদা আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁ রে, বেড়াতে বেরিয়ে মন-টন খারাপ হয় নি তো?'

ললিতা বলেছিল, 'কেন?'

'কেন আবার কী, হয়তো যে কোনো কারণেই তোর ভাল লাগছে না। আমাদের সঙ্গে বেড়াতে হয়তো ভাল লাগছে না।'

ললিতা বলেছিল, কী যে বল তুমি দাদা। খারাপ লাগলে তোমাদের সঙ্গে আমি বেরোতাম নাকি।'

দাদা বলেছিল, 'তখন হয়তো বুঝতে পারিস নি।'

ললিতা বলেছিল, 'মোটেই না। আমার সে সব কিছুই হয় নি। তোমরা মিছিমিছি ভাবছ। আমি বেশ ভালই আছি।'

দাদা একটু চুপ করে থেকে, গলা নামিয়ে আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'মায়া কিছু বলে-টলে নি তো?'

প্রবীর ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছিল। সবাই প্রবীরের বিস্মিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। এমন কি ললিতার মেজদাও।

দু'বছরের মধ্যে, প্রবীরের প্রতিষ্ঠা এবং ললিতার সঙ্গে তার বিয়ে, সবই স্থির হয়ে গিয়েছিল। সেই দু'বছরের মধ্যে, ললিতার মেজদার বিয়ে হয়েছিল, হায়দ্রাবাদে ট্রানসফার হয়ে চলে গিয়েছিল। প্রবীরও ললিতাদের পরিবারে স্বীকৃত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিয়ের আর দু'মাস বাকী। বিয়ের আগে, বাপের বাড়ির লোকের সঙ্গে এই শেষ বেড়ানো।

কিন্তু এই শেষ বেড়ানো ললিতাকে কোথায় টেনে নিয়ে গেল। প্রবীরকে ও কী বলবে? কেমন করে বলবে? মুখ ফুটে একটি কথাও ললিতা বলতে পারবে না। যে প্রবীরকে পাবার জন্য ও বাড়িতে বিদ্রোহ করেছিল, যাকে ও ভালবেসেছে, যার সঙ্গে ও ইতিমধ্যেই নিজেকে অচ্ছেদ্য ভেবেছে, যার সঙ্গে সারা জীবন কাটাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তাকে ও কী বলবে?

না, প্রবীরকে ও কিছুই বলতে পারবে না। বলা যায় না। সংসারে সমস্ত কিছুরই একটা যুক্তি আছে। বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য বলে একটা কথা আছে। যাকে আজ পর্যন্ত জীবনের কোনো কথাই গোপন করে নি, তাকে ও এমন কথা কী করে বলবে, যার কোনো যুক্তি নেই।

প্রবীরের জুতোর শব্দ শোনা গেল। প্রবীর ওপরে আসছে। ললিতা তৈরি হল।

প্রবীর কাছে এসে ললিতার দিকে একবার তাকিয়ে বললো, একি, সত্যি দেখছি চেহারাটা খুব খারাপ করে দিয়েছ। আমি ভাবলাম, সবাই বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করে বলছে।'

ললিতা হাসলো। বললো, 'বাড়াবাড়ি তো নিশ্চয় করছে। তুমিও তাদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে যে।'

প্রবীর অবাক হয়ে বললো, 'তার মানে?'

ললিতা বললো, 'তার মানে, তুমিও সকলের মতো এক কথাই বলছ।'

প্রবীর ললিতার আরো কাছে এসে, ললিতার মুখের দিকে চোখ রেখে বললো, 'বলব না? সত্যি যে চেহারাটা খারাপ করে দিয়েছ। কী হয়েছে বল তো?'

ললিতা ঘাড় নেড়ে বললো, 'কী আবার হবে। কিছু হয় নি তো।'

প্রবীর বললো, 'তাই কখনো হয়। রঙটা রীতিমতো চাপা দেখাচ্ছে। চোখের কোল বসা, যেন রোগে ভুগে উঠেছ। মুখটা তো বেশ রোগা।'

ললিতা হেসে বললো, 'বাজে কথা।'

প্রবীর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ললিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ললিতার বুকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠলো। প্রবীর ওকে চেনে, বুঝতে পারে। সে বুদ্ধিমান, দেখবার এবং বোঝবার চোখ তার আছে। ললিতা একবার ভাবলো, প্রবীরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিলেই ধরা পড়তে হবে। প্রবীর ভাববে, নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে।

ললিতা সহজভাবেই হাসবার চেষ্টা করলো। বললো, 'কী দেখছ?'

প্রবীর বললো, 'তোমাকে।'

'আমাকে বুঝি আগে কখনো দেখ নি?'

'দেখেছি, কিন্তু এমনটি কখনো দেখি নি।'

'কেমনটি?'

প্রবীর জবাব না দিয়ে, ললিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রবীর কথা না বলে, তাকিয়ে থাকতেই ললিতার অস্বস্তি বেড়ে উঠছে। ও বললো, 'আমার এই চেহারার কথা বলছ?'

প্রবীর বললো, 'চেহারা তো বটেই, তার সঙ্গে আরো কিছু।'

ললিতা মনে মনে শিউরে উঠলো। কিন্তু যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা আবার কী, বুঝলাম না তো।'

প্রবীর বললো, 'সেটা হল এই, তুমি আমাকেও বলতে পারছ না, তোমার কী হয়েছে। তুমি যেন আমার কাছে, নিজেকে ঠিক খুলে ধরতে পারছ না।'

ললিতা তেমনিভাবেই হাসবার চেষ্টা করলো, বললো, 'কী বলব বল। কিছু না হয়ে থাকলে, তোমার কাছে কী মুখ খুলব। একটা মিথ্যে কথা তো বানিয়ে বলতে পারি না।'

প্রবীর ললিতার প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'সত্যি কিছু হয় নি?'

'কী আবার হবে, আশ্চর্য!'

'আমি বলছি না তোমার জীবনে বিরাট কোন ঘটনা ঘটে গেছে।

তোমার দাদা, বৌদির সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলে। যদি কিছু ঘটতো তাঁরা তা জানতে পারতেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোমার কোনো মানসিক ব্যাপার ঘটেছে কী না।'

ললিতা মাথা নেড়ে হাসলো। বললো, 'মানসিক ব্যাপার কিছু ঘটলেও, বাস্তবে কোনো ঘটনা চাই তো। আর শুধু শুধু আমার মানসিক কিছুই বা ঘটতে যাবে কেন বল। আমি যাবার আগের দিনও তো তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

প্রবীর বললো, 'তাইতেই তো আরো আশ্চর্য হচ্ছি ললিতা। এমন কি ঘটতে পারে যে তোমাকে প্রায় রুগ্ন দেখাচ্ছে। কোথায় বেড়াতে গেলে, চেহারা আরো সুন্দর করে ফিরবে, তার বদলে একেবারে উল্‌টো!'

ললিতা বললো, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। এত ভাবছ কেন ?'

প্রবীর জিজ্ঞেস করলো 'তোমার শরীর ঠিক আছে তো ? অনেক সময় রুগী নিজেই বুঝতে পারে না তার কী হয়েছে।'

ললিতা যেন তবু একটা কৈফিয়ত পেল। বললো, 'তা অবিশ্যি বলতে পারি না। এমনিতে তো আমি কিছু ফীল্ করছি না।'

প্রবীর বললো, 'সেরকম হলে, আমার মনে হয় রক্তটক্ত পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।'

ললিতার বুকের মধ্যে যেন রক্ত হিম হয়ে গেল। এক মুহূর্ত দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল। তারপরে বললো, আমার মনে হয় না সেরকম কিছু হয়েছে। তবু যদি মনে করো, তা হলে দেখানো যেতে পারে।'

প্রবীর বললো, শুধু শুধু তো আর কিছু হতে পারে না। একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। আমার মনে হয়, অবহেলা না করাই ভাল।'

প্রবীর কথা বলতে বলতে বারে বারেই ললিতার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তাতে বোঝা যাচ্ছিল, প্রবীর মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছে না, সন্তুষ্ট হতে পারছে না। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ললিতার কাছ থেকে সে আশানুরূপ জবাব পায় নি। তার বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো চোখে কেমন একটা সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা জেগে রয়েছে।

তা ছাড়া ললিতা বুঝতে পারছে, ওর নিজের ব্যবহারও যথাযোগ্য হচ্ছে না। এত দিন পরে দেখা, ওর দিক থেকে নিশ্চয়ই আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা উচিত ছিল। যারা নিজেদের মধ্যে একদিন দেখা না পেলে, অন্তত টেলিফোনেও কথা

বলে, তারা দেড মাস পরে সামনা-সামনি, কাছাকাছি হয়েছে, তবু তেমন কোনো কিছুই উত্তেজনা বা উচ্ছ্বাস ঘটল না ললিতার মনে। প্রবীরও হয়তো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারতো, সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু একটা মাত্র ব্যাপার নিয়েই সেটা সম্ভব হল না। ইদানীং প্রবীর সুযোগ-সুবিধে পেলেই, ললিতাকে একাধিক চুম্বন না করে ছাড়তো না। বিশেষ করে যখন থেকে ওদের নিজেদের মধ্যে কথা পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে, যখন থেকে ওরা নিজেদের নিজের স্বীকার করে নিয়েছে। আজও প্রবীরের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক ছিল। হয়তো প্রবীর তাই আশা করে এসেছিল। কিন্তু ললিতার মুখের দিকে তাকিয়েই, তাকে থমকে যেতে হল। সে দেখলো নিজে, সকলের মুখে যে কথা শুনে এসেছে, তা সত্যি। অতএব তার পক্ষে আর উচ্ছ্বসিত হওয়া সম্ভব হল না।

প্রবীর ললিতার একটি হাত ধরে, নিজের বুকের কাছে টেনে নিল। ললিতার মনে হল ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। প্রবীর হয়তো ওর বুকের ধক্‌ধক্ শব্দ শুনতে পাবে। ওর মুখের ভিতরটা শুকিয়ে উঠছে। এখন আর সোজাসুজি প্রবীরের মুখের দিকে তাকাতেও পারছে না।

প্রবীর ললিতার চিবুক ধরে, মুখ তুলে ধরলো। ললিতা হাসলো। প্রবীর বললো, 'সত্যি বল তো লক্ষ্মীটি, তোমার কী হয়েছে। কোনো কারণে কি তোমার মন খারাপ হয়েছে?'

ললিতা মুখে কোনো জবাব না দিয়ে, ঘাড নাডলো।

প্রবীর আবেগের সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'তবে? তবে ললিতার সেই আলোর ঝলক কোথায় গেল? তাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? তোমাকে কেউ মনে কষ্ট দিয়েছে?'

ললিতা আবার ঘাড নাড়লো। কিন্তু প্রবীরের মুখের সামনে ও যেন আর মুখ তুলে ধরে রাখতে পারলো না। ওর চোখে যেন জল আসছে। হঠাৎ ও প্রবীরের বুকের মধ্যে মুখ রাখলো। জোরে মুখটা চেপে ধরে, চুপ করে রইলো।

প্রবীর কিছু বললো না। সে ললিতাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে রইলো। একটু পরে, বুকের কাছ থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে, ললিতা বললো, 'দিনটা আরো এগিয়ে দেওয়া যায় না?'

প্রবীর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ দিনটা?'

ললিতা কিছু না বলে, প্রবীরের বুকের জামার বোতাম খুঁটতে লাগলো। প্রবীর হঠাৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের বিয়ের দিন?'

ললিতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

প্রবীর যেন আরো অবাক হল। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার তাই ইচ্ছা ?'

ললিতা নিচু স্বরে বললো, 'হ্যাঁ। আমি তোমার সঙ্গে কোথাও চলে যাব। আমার কিছুই ভাল লাগছে না।'

প্রবীর সহসা কিছু বললো না। কয়েক মুহূর্ত ললিতার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপরে বললো, 'বেশ, তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তাই হবে।'

ললিতা আবার প্রবীরের বুকের ওপর মুখ চেপে রাখলো। আসলে প্রবীরের কাছ থেকে ও নিজেকে আড়াল করে রাখতে চাইছে। প্রবীরের সঙ্গে চোখে চোখে তাকাতে চাইছে না। কিন্তু ও বুঝতে পারছে, প্রবীর ওর আচরণকে সহজভাবে নিতে পারছে না। তার মতো বুদ্ধিমান ছেলের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, কোথাও কিছু একটা ঘটেছে। অবিশ্যি প্রবীর সে কথা আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। যাবার আগে কেবল বললো, 'আর কিছু নয়, আমার ভয় তোমার শরীরটার জন্য। সে রকম যদি কিছু বোঝ, তা হলে তুমি নিজে থেকেই বলো।'

ললিতা বললে, 'বলব।'

প্রবীর চলে যাবার পরে, নিচে নেমে, যে ঘরে টেলিফোন, সেই ঘরে উঁকি দিল। দেখলো কেউ নেই। ললিতা প্রায় চোরের মতো এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। দরজাটা বন্ধ করে দিল। টেলিফোনের রিসিভার তুলে, দ্রুত ডায়াল ঘোরালো। কয়েক সেকেণ্ড পরেই, ওপার থেকে সাড়া পেয়ে বললো, 'স্বাতী আছে নাকি ?···আমি ওর বন্ধু ললিতা।······আচ্ছা ধরে আছি।'

ললিতার চোখেমুখে একটা উত্তেজনা। ও পিছন ফিরে বন্ধ দরজার দিকে দেখলো। তারপরেই স্বাতীর গলার আওয়াজ পেলো, 'কী রে ললিতা, কবে ফিরলি ?' 'আজ সকালে। শোন্ স্বাতী বেশি কথা বলবার সময় নেই। কাল সকালে তুই একবার আমাদের বাড়িতে আসবি। আমি তোকে আসতে বলেছি, তা যেন বলিস না। তুই আমার সঙ্গে এমনি দেখা করতে এসেছিস, খোঁজ নিতে এসেছিস, আমি এসেছি কী না।'

ওপার থেকে প্রশ্ন এল, 'ব্যাপার কী ?'

ললিতা বললো, 'কাল বলব, আজ নয়। ছেড়ে দিচ্ছি, কেমন, আসিস কিন্তু।'

বলেই ললিতা টেলিফোন নামিয়ে রাখলো। মনে হল, ওর যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তবু দাঁড়াতে সাহস পেল না। তাড়াতাড়ি মুখের অবস্থা স্বাভাবিক করে ধীরে-সুস্থে দরজা খুললো। সামনে কেউ নেই। ললিতা একটু স্বস্তি বোধ করলো। যদিও ওর বুকের মধ্যে যেন থরথর করছে। অসম্ভব দুর্বল বোধ করছে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে, মাঝপথে বড বৌদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বৌদি জিজ্ঞেস করলো, 'প্রবীর চলে গেল নাকি ?'

ললিতা বললো, 'এই তো গেল।'

ললিতা বুঝতে পারছে, বৌদির ধারণা, ও প্রবীরের সঙ্গে নিচে নেমে এসেছিল। তবু যা হোক রক্ষা। বৌদি বললো, 'মা প্রবীরের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন। আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন।'

ললিতার মনে একটা খটকা লাগলো। প্রবীর সাধারণত মায়ের সঙ্গে দেখা না করে যায় না। আজ দেখা না করেই চলে গিয়েছে। স্বাভাবিক, প্রবীরের পক্ষে আজ এটা খুবই স্বাভাবিক। তার মনে আজ নানা প্রশ্ন জেগে উঠেছে। নিশ্চয়ই অনেক অশান্তি অস্বস্তি আর অনেক জিজ্ঞাসু ভাবনা নিয়ে সে ফিরে গিয়েছে। কিন্তু ললিতার কোনো উপায় নেই। ললিতা ওর নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পডলো। উপুড হয়ে, বিছানায় মুখ গুঁজে দিয়ে, বারে বারে বলে উঠলো, 'আমাকে ক্ষমা কর প্রবীর, আমাকে ক্ষমা কর।'

ঘণ্টাখানেক বাদে খাবার ডাক পড়লো। খাবার ইচ্ছা না থাকলেও, ললিতা খেতে গেল। কারণ না গেলেই, নতুন কৌতূহল, নতুন প্রশ্ন দেখা দেবে। আবহাওয়া যতো স্বাভাবিক রাখা যায় ততোই ভালো।

পরের দিন সকালবেলা-ই স্বাতী এল। ললিতা তাকে যেমন করে বলে দিয়েছিল, তেমনিভাবেই এল। খোঁজ নিল ললিতা এসেছে কী না। তারপর বন্ধু দর্শনে, দোতলায় ছুটে এল। সেও এসেছে তীব্র কৌতূহল নিয়ে। কিন্তু ললিতার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। অবাক চোখে ললিতার দিকে তাকালো।

ললিতা হেসে বললো, 'কী, চেহারার কথা বলবি তো ?'

স্বাতী বললো, 'হ্যাঁ। তোর কি কোন অসুখ করেছে নাকি ?'

ললিতা বললো, 'হ্যাঁ, আমাকে মরণ ব্যাধিতে ধরেছে। সারাবার জন্য তোর সাহায্যের দরকার।'

'কী ব্যাপার বল্‌তো ?'

'ওইটি জিজ্ঞেস করিস না। সাহায্য যদি করিস, তা হলে একটাই কণ্ডিশন, এখন কিছুই জানতে চাইবি না।'

স্বাতী জিজ্ঞাসু অবাক চোখে ললিতার দিকে তাকিয়ে রইলো। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে ললিতার সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিল। বললো, 'কী বলছিস, কিছু বুঝতে পারছি না।'

ললিতা বললো, 'পরে বুঝিয়ে বলবো। আপাতত যা বলছি, তা করতে পারবি কী না বল ? সেটা শুনি আগে।'

'দিন তিনেকের জন্য আমি তোদের বাড়ি থাকতে যাচ্ছি। অর্থাৎ তুই আমাকে কয়েকদিন তোদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখতে চাইছিস, এটাই বলতে হবে। যদিও—।'

ললিতা কথাটা শেষ করলো না। স্বাতী জিজ্ঞেস করলো, 'যদিও ?'

'যদিও আমি তোদের বাড়িতে থাকবো না।'

'কোথায় থাকবি ?'

'সে কথা এখন না। পরে বলবো।'

স্বাতী কয়েক মুহূর্ত ললিতার দিকে চেয়ে থেকে বললো, 'প্রবীরের সঙ্গে কোথাও যাবি ?'

ললিতা করুণভাবে একটু হাসলো, প্রবীরের সঙ্গে আজ আমি কোথাও গেলে আমাকে বাধা দেবার কেউ নেই, লুকোবারও দরকার নেই।'

'তবে ?'

'সেটা আমি তোকে পরে বলবো।'

স্বাতী আবার কয়েক মুহূর্ত ভাবলো। বললো, 'কিন্তু, তোদের বাড়ি এমন কিছু দূরে না, কলকাতা শহরের মধ্যেই। যদি জানাজানি হয়ে যায়, তুই আমাদের বাড়িতে নেই ?'

ললিতা বললো, 'সে ভার তোকেই নিতে হবে, যাতে জানাজানি না হয়।'

স্বাতীর চোখে মুখে অস্বস্তি। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, 'কবে যাবি ?'

ললিতা বললো, 'আজ, এখনই। তুই গিয়ে মাকে বল, আমাকে কয়েকদিনের জন্য তোদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাস্‌। বলবি, আমি রাজী আছি। মা রাজী হয়ে যাবে।'

স্বাতী তবু একটু ভাবলো। তারপরে বললো, 'ঠিক আছে, আমি মাসীমার সঙ্গে কথা বলে আসছি।'

স্বাতী বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই ললিতার মায়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এল। মা ললিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্বাতী তোকে ওদের বাড়িতে কয়েকদিন নিয়ে রাখতে চাইছে। যাবি নাকি?'

ললিতা বললো, 'যাব।'

'মা বললেন, প্রবীরকে তা হলে খবরটা দিতে হয়।'

ললিতা বললো, 'আমিই দিয়ে দেব।'

মা স্বাতীর দিকে একবার দেখলেন। বললেন, 'তা হলে ঘুরে আয়।'

স্বাতীর দিকে ফিরে বললেন, 'স্বাতী, তুমি একবার আমার সঙ্গে এস।'

স্বাতী মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ললিতা তাড়াতাড়ি তৈরি হতে লাগলো। একটা ছোট স্যুটকেসে কয়েকটি জামা কাপড় ইত্যাদি ভরে নিল। চেক বইটাও নিল। ব্যাংকে ওর অ্যাকাউন্ট আছে, কিছু টাকাও আছে।

একটু পরেই স্বাতী এল। ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'মা কী বললে?'

'মাসীমা বললেন, আমার কাছে কয়েকদিন থাকলে তোর ভালই হবে, তোর কী হয়েছে না হয়েছে, সে সব আমাকে বলতে পারবি। তাতে তোর মন ভালো হয়ে উঠবে।'

ললিতার বুকের মধ্যে টনটন করে উঠলো। হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারলো না। চুপ করে রইলো। তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'মা যে এ'রকম বলবে, আমি তাই ভেবেছিলাম। চল্ তা হলে আর দেরি করবো না।'

বাড়ির বাইরে এসে, ট্যাকসিতে উঠে, ললিতা ড্রাইভারকে একটা রাস্তার নাম বললো। স্বাতী জিজ্ঞেস করলো, 'সেখানে গিয়ে কি করবি?'

'ব্যাংক থেকে টাকা তুলবো।'

স্বাতী তেমনি অবাক জিজ্ঞাসু চোখে ললিতার দিকে চেয়ে রইলো। ললিতা স্বাতীর দু'হাত ধরে বলে উঠলো, 'রাগ করিস না স্বাতী। এখন কিছু জানতে চাসনে, পরে তোকে সবই বলবো।'

স্বাতী বললো, 'রাগ করছি না, আমার কেমন যেন ভয় করছে ললিতা।'

ললিতা বললো, 'ভয়ের কিছু নেই। তুই নিশ্চিন্ত থাক্। তুই শুধু আমার এই কয়েক দিনের এ্যাবসকণ্ড করা দিনগুলোকে বাঁচিয়ে দে।'

ছু'জনে ব্যাংকে এল। ললিতা টাকা তুললো। স্বাতী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'দু'হাজার টাকা দিয়ে কী করবি?'

ললিতা বললো, 'সঙ্গে থাকা ভালো। চল্, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

স্বাতীকে বাড়ি পৌঁছে দিতে ট্যাকসিতে উঠল। বললো, 'মনে হয়, পরশু সকালেই তোর কাছে চলে আসবো! তুই মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলিস, জানাস আমি তোদের বাড়িতে বেশ ভালো আছি, যেন চিন্তা না করে।'

শেষ মুহূর্তে স্বাতী তার আবেগ আর উদ্বেগ চেপে রাখতে পারলো না। তার চোখে জল এসে পড়লো। বললো, 'শোন্ ললিতা, তুই কোনো বিপদ আপদ ঘটাবি না তো?'

ললিতা বললো, 'না, বিপদ যাতে না ঘটে তার জন্যই চেষ্টা করছি। তুই ভাবিস না।'

স্বাতী ট্যাক্সি থেকে নেমে গেল। ললিতা চলে গেল।

ললিতা দক্ষিণ থেকে এল উত্তর কলকাতায়। উত্তর কলকাতায় যতোটা ভালো সম্ভব, তেমন একটি নার্সিং হোমে এসে ঢুকলো। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে বললো, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।'

ডাক্তারটি যুবক। একবার ললিতাকে দেখলো, ওর স্যুটকেস দেখলো। নার্সকে ডেকে বললো, 'এঁকে আমার ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও।'

নার্সিং হোমের ভিতরে, অন্য একটি ঘরে ললিতাকে নিয়ে গেল নার্স। সেখানে কেউ নেই। একটু পরেই ডাক্তার এল। চেয়ারে বসে বললো, 'বলুন, হোয়াটস য়্যুর ট্রাবল।'

ললিতা ডাক্তারের দিকে চোখ তুলে একবার দেখলো, তারপর বললো, 'আমার—আমার—।'

কথাটা বলতে পারছে না। ললিতার অসুস্থ মুখে রক্তের ছাপ পড়লো। ডাক্তার খুব সহজভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার বোধহয় পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে।'

ললিতা যেন নিষ্কৃতি পেল, বললো, 'হ্যাঁ।'

'কতো দিন।'

'দু'মাস।'

'আপনি তো অবিবাহিতা মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

'দেন, হোয়াট ইজ দ্য স্টোরি ইন্‌ বিহাইণ্ড?'

ললিতা ডাক্তারকে আবার দেখলো, টেবিলে আঙুল ঘষলো। বললো, সেটা কি জানা খুব দরকার।'

'ডাক্তারের কাছে কিছু না লুকোনই ভালো।'

ললিতা বললো, 'লুকোবার কিছু নেই, বলবারও কিছু নেই। এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র।'

'যথা?'

'ঘটে গেছে।'

ডাক্তার একটু হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, 'আগেও এরকম ঘটেছে নাকি?'

ললিতার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো অপমানে। ওর মুখ একটু শক্ত হল, বললো, 'না!'

ডাক্তার বললে, 'আমার কথাটা অন্যভাবে নেবার দরকার নেই। কথাটা আমার জানা দরকার। কেন না, মনে হচ্ছে, আপনি একেবারে তৈরি হয়েই এসেছেন, এবং একেবারে একলা। এতোটা সাহস পেলেন কী করে?'

ললিতা বললো, 'অবস্থার চাপে। তা ছাড়া আমার এক বন্ধুর ব্যাপারে আমি এসব জানি।'

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বললো, 'আপনার আসল নাম ঠিকানা দিতে পারবেন তো?'

'সেটা কি দরকার আছে?'

'নিশ্চয়ই। আপনার কোনো বিপদ আপদ হলে, আমি কার কাছে জানাবো?'

'সে সম্ভাবনা কি আছে?'

'নেই বলেই মনে হচ্ছে। তবু আমার জানা থাকা দরকার। আপনার আসল নাম, ঠিকানা এবং বয়স! আপনাকে শুধু এটুকু গ্যারাণ্টি দিতে পারি, প্রয়োজন না হলে, ওসকে কিছুই জানাজানি হবে না। এমন কি রেকর্ডও থাকবে না।'

ললিতা ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালো। লোকটিকে ওর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করলো। বললো, 'বেশ, আমি সবই বলবো।'

ডাক্তার একটি কাগজ আর কলম এগিয়ে দিয়ে বললো, 'এতে লিখে দিন।'

ললিতা তার নাম, স্বাতীর বাড়ির ঠিকানা এবং বয়স লিখে দিল। ডাক্তার দেখলো, একটু হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, 'ইতিমধ্যে কোনোরকম বাজে ওষুধ-বিষুধ খান নি তো?'

'কিছুই না।'

'ভেরি গুড। চলুন, আপনাকে একবার দেখে নিই।'

ডাক্তার বেল টিপে নার্সকে ডাকলো। বললে, 'এঁকে আমি একটু দেখবো। ও. টি-তে নিয়ে যাও।'

ডাক্তার যা পরীক্ষা করবার করলো। বললো, 'আজ সারা দিনে কিছু করবার নেই। ভোরে কুারেট হবে। রাত্রে খাবার পরে অবিশ্যি দরকার।'

ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'আমি এখানেই থাকতে পারি তো?'

'হ্যাঁ, পারেন। চলুন, ফর্মালিটিগুলো সেরে নেবেন।'

আবার আগের ঘরে ফিরে এল। ফর্মালিটি আর কিছুই না। ডাক্তার কোনো দ্বিধা না করেই বললো, 'পাঁচশো টাকা দিন। তা ছাড়া পার ডে কেবিন চার্জ কুড়ি টাকা। আজ আর কাল থাকতে হবে। ওষুধ ইনজেকশন যা লাগবে, সব আপনারই একসপেন্স। বাকী যা কিছু, নার্স আপনাকে বলে দেবে।'

ললিতার ভয় ছিল, হয়তো আরো অনেক বেশি টাকা লাগবে। ও সমস্ত টাকাটাই একসঙ্গে দিয়ে দিল। তারপরে নার্স ওকে নিয়ে গেল কেবিনে। ছোট ঘর, কিন্তু তেমন অপরিচ্ছন্ন না। অসুবিধা একমাত্র, অ্যাটাচড বাথরুম নেই। না থাক, ঘরের বাইরে, দু' পা গেলেই বাথরুম। নার্স সব দেখিয়ে দিল। এবং নার্সটি যে ওকে বারে বারেই চেয়ে দেখছে, সেটা ও লক্ষ্য করেছে। দেখুক, কিছু করবার নেই। হয়তো ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসেছে, অনেক কিছু ভেবেছে। তাতেও আপত্তি নেই। নার্সরা এরকম ঘটনা রোজই হয়তো দেখে থাকে। হেসে থাকে, ভেবেও থাকে, আবার ভুলেও যায়। ললিতা কৃতজ্ঞতা বোধ করছে শুধু ডাক্তারটির ওপরে। লোকটি ওকে আর যাই হোক, বাজে কথা জিজ্ঞাসা করে বিপদে ফেলতে চায় নি।

সারাটি দিন প্রায় শুয়ে শুয়ে কেটে গেল। দুপুরে ভালো করে খেতে পারে নি। খাবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। রাত্রেও বিশেষ খেতে পারলো না। রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় আর একবার ও. টি-তে যেতে হল। জীবনে এ এক নতুন'

অভিজ্ঞতা। এখানে লজ্জা আর সংকোচের কোনো প্রশ্ন নেই। তবু নার্সের হাতে সেফটি রেজার দেখে ওর যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। চোখ বুজে পড়ে রইলো। ডাক্তারও যা করণীয় তা করলো। এই প্রথম ললিতা যন্ত্রণা বোধ করলো। মনে হল, ওর তলপেটে একটা আড়ষ্ট ব্যথা ধরে রইলো। বুঝতে পারলো, শরীরের অভ্যন্তরে কোনো ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে।

সারাটা রাত্রি কেটে গেল। ঘুম এল না, একটা নিঝুম ভাব নিয়ে বিছানায় পড়ে রইলো। ভোরবেলা নার্স এসে ওকে ডাকলো। নিয়ে গেল অপারেশন থিয়েটারে। গিয়ে দেখলো, ডাক্তার সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত। ডাক্তারের সঙ্গে আর একজন রয়েছে, সেও যুবক। ললিতা টেবিলের ওপর শুয়ে পড়বার পরে সে-ই এসে ওর হাত ধরে নাড়ি দেখলো। স্টেথিসকোপ দিয়ে হার্ট পরীক্ষা করলো।

নার্স ইতিমধ্যে ইনজেকশনের শিরিঞ্জে ওষুধ ভরে নিয়েছিল। নতুন ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিল। বোঝা গেল, এ ডাক্তার অ্যানেসথেটিক। সে অন্য ডাক্তারের দিকে একবার তাকালো। ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বললো, 'ঠিক আছে।'

অ্যানেসথেটিক ললিতাকে ইনজেকশন ফুঁড়লো, বললো, 'এক দুই করে গুনে যান।'

ললিতা গুণতে লাগলো, 'এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তে—রো ···চৌ···।' অন্ধকার···অন্ধকার ···সমস্ত চেতনা জুড়ে গভীর অন্ধকার নেমে এল। দৃষ্টি আর মন বলে কিছুই রইলো না।

কিন্তু অন্ধকার চেতনার মধ্যে একটা বৃত্ত ছড়িয়ে পড়লো। সেই আলোর বুকে ললিতা নিজেকে দেখতে পেলো। দেখলো চলন্ত ট্রেন। ফার্স্ট ক্লাসের করিডরে ও আর বড় বৌদি জানলার দিকে ঝুঁকে বাইরে তাকিয়ে আছে। ওদের পাশ ঘেঁষে, অন্যান্য যাত্রীরা চলাফেরা করছে।

ললিতা বাইরে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ওর মনটা পড়ে আছে ঠিক পিছনেই সিঙ্গল কুপে-এর ওপরে। সিঙ্গল কুপে-এর দরজাটা খোলা। সেখানে একজন মাত্র যাত্রী। চোখের সামনে তার বই খোলা। দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত তার সঙ্গে ললিতার অনেকবার চোখাচোখি হয়েছে। কিন্তু প্রতি বারেই ললিতার বুকের মধ্যে চমকে উঠেছে। কেন, ও তা জানে না।

লোকটির বয়স কত হবে ? বোধহয় চল্লিশের মধ্যে। দীর্ঘ দেহ, শ্যাম বর্ণ। বড় বড় কোঁচকানো কালো চুল, কপালের ওপরে একটি বিন্দু থেকে যেন সিংহের কেশরের মতো পিছন দিকে নেমে গিয়েছে। আয়ত টানা চোখ, খড়্গ নাসা, চিবুকের মাঝখানেতে একটা ঢেউ। পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি।

এই বর্ণনাটা এমন কিছু না। কিন্তু মানুষটির চোখে কি আছে ? বিষণ্ণতা ? ব্যথা ? অথবা ক্ষুধা ? ললিতা কিছুই বুঝতে পারছে না। কেবল যতোবারই তারসঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে, ওর বুকের মধ্যে চমকে উঠেছে। মুখে রঙের ছোপ লেগে গিয়েছে। চোখের পাতা নেমে গিয়েছে। কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে দেখতে ইচ্ছা করেছে।

কেন ? লোকটি কি ওর পরিচিত ? মনে পড়ে না। এ মুখ যেন ভাস্করের তৈরি পাথরের মূর্তির মতো। এ মুখ যেন অনেকটা ঈশ্বরের বিগ্রহের মতো। কেন এ কথা মনে হচ্ছে ? ললিতা কি সম্মোহিতা নাকি ! ওর যেন নিশির ডাকের ঘোর লাগছে। বৌদি দাদা পরিবার-পরিজন, সর্বোপরি প্রবীর—কোন কিছুই ওর মনে আসছে না। কামরার মধ্যে ঢুকে বৌদি দাদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারে বারে বাইরের করিডরে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে। কেন। এ কি বিভ্রম। ঘুরে ফিরে মানুষটির মুখ ভেসে উঠছে। লোকটি একলা কেন ? একটা কুপ-এর মধ্যে দুজন থাকবার কথা। কিন্তু একজন যাচ্ছে, কে লোকটি ? লোকটির ছবি দেখেছে নাকি কখনো।

ললিতার ভিতরে যেন তোলপাড় করছে। বারে বারে বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সন্ধের মুখে সেও বেরিয়ে এল। দীর্ঘদেহ মানুষটি করিডর দিয়ে হেঁটে, ললিতার পাশ ঘেঁষে যাবার সময়ে মুহূর্তের জন্য যেন দাঁড়ালো। ললিতার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু সে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে তাকালো। তখন গাড়ি একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে চলেছে, নিচে স্রোতস্বিনী তরঙ্গায়িত নদী।

ললিতা দরজার দিকে তাকালো। লোকটির দৃষ্টিতে কী আছে ? বিষণ্ণতা, ব্যথা না ক্ষুধা ? তার দৃষ্টি যেন ললিতার বুকের গভীরে গিয়ে বিদ্ধ হচ্ছে। অথচ তার চোখে কোনো তীব্রতা নেই, ঝলক নেই। অন্য কী যেন আছে।

সে দরজা বন্ধ করে আবার ফিরে এল। আবার ললিতার পাশ দিয়ে গেল। কুপ-এর মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। একটু পরে ললিতা আস্তে আস্তে পিছন ফিরে দেখলো। চোখাচোখি হল। ললিতা চোখ সরিয়ে নিজের কামরায় ঢুকে গেল। কে ও ? না, ললিতা আর বাইরে যাবে না। আর তার চোখের দিকে তাকাবে না।

রাত্রি ন'টা পর্যন্ত ললিতা কামরার মধ্যে বসে রইলো। খাবার এল, সকলে মিলে খেলো। হাত ধুতে বাইরে গেল। দেখলো পাশের সিঙ্গল কুপ-এর দরজা অর্ধেক বন্ধ। ভিতরে তাকে দেখা যাচ্ছে। সে গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। গন্ধেই টের পেলো, সে ড্রিঙ্ক করছে। ললিতার চোখের কোণ কুঁচকে উঠলো। তাড়াতাড়ি বাথরুমে চলে গেল। হাত ধুয়ে ফিরে আসবার সময় আবার তাকালো। অর্ধেক খোলা দরজা দিয়ে এবার চোখাচোখি হয়ে গেল। লোকটি কি কাঁদছে নাকি। কেমন যেন অসহায় দেখালো চোখের দৃষ্টি। যেন ব্যথায় ভরে গিয়েছে।

ললিতা নিজের কামরায় ঢুকলো। দাদা ওপরের বার্থে উঠে পড়েছে। নিচের একটা বার্থে বৌদিও শোবার ব্যবস্থা করছে। অন্য একটি ওপরের বার্থে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তিনি অনেক আগেই শুয়ে পড়েছেন। ললিতা একটা ম্যাগাজিন খুলে বসলো। বৌদি জিজ্ঞেস করলো, 'শোবে না ?'

'পরে। তুমি শোও।'

বৌদি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়লো। করিডরে যাত্রীদের আনাগোনা আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগলো। এক সময়ে সব চুপ হয়ে গেল। গাড়ির শব্দ আর ঘুমন্ত নিশ্বাসের শব্দ। ললিতা উঠে দাঁড়ালো। বাতি অফ করলো। দরজা খুলে বাইরে গেলো। করিডর ফাঁকা। পাশের কুপ-এর দরজা তেমনি আধ-খোলা। ললিতা দেখলো, সেই দীর্ঘদেহ মূর্তি, উপুড় হয়ে গদির ওপরে পড়ে আছে। প্রায় অর্ধেক শরীর গদির বাইরে। যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

কী ব্যাপার ? মাতাল হয়ে গিয়েছে নাকি ? নাকি ওভাবেই ঘুমোচ্ছে ? ললিতা দু'দিকে দেখলো। কেউ নেই। ও দরজার কাছে এগিয়ে, ভিতরে উঁকি দিল। সীটের পাশে, ছোট টেবিলের মতো জায়গায়, বোতল আর গেলাস। লোকটির মাথার কাছে একটা বই। আলো জ্বলছে। কোনো রকম বিছানাপত্র নেই। ওপরের বার্থে বড় একটা স্যুটকেস।

সরে এল ললিতা। বাথরুমের দিকে এগোলো। কণ্ডাক্টর গার্ড এগিয়ে এল।. এসে, সেই সিঙ্গল কুপে-তে উঁকি দিল। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। ললিতা বাথরুমে না গিয়ে ফিরে এল। এখন আর কিছু দেখবার নেই। দরজাও খোলা হবে না। ও নিজের কুপে-তে গিয়ে ঢুকলো। শুয়ে পড়লো, কিন্তু ঘুম এলো না।

ডাক্তার এল। ললিতা একটা ফোন নাম্বার দিয়ে বললো, 'এই নাম্বারে ফোন করে, প্রবীরকে ডেকে দিন, বলুন ললিতা তাকে ডাকছে।'

প্রবীর না আসা পর্যন্ত দু'হাতে মুখ ঢেকে পড়ে রইলো।

প্রবীর এল আধঘণ্টার মধ্যেই। ললিতার চোখে জল, কিন্তু ভেজা স্বরে বললো, 'বসো প্রবীর। কোনো কিছু বলার আগে, আশা করি কিছু আন্দাজ করতে পারছো?'

প্রবীর বললো, 'পারছি।'

'তারপরে?'

'তারপরে তুমিই বল।'

'বলবো বলেই এখানে ডেকে এনেছি। তোমাকে ফাঁকি দিতে পারবো না। তারপরেও যদি তোমার দরজা আমার জন্য খোলা থাকে···।'

কথা শেষ করার আগেই, ললিতার সারা শরীর মথিত করে কান্না ছুটে এল। প্রবীর ওকে দু'হাতে ধরে বললো, 'দরজা খোলার কোনো প্রশ্ন নেই। আমরা অন্য যুগে বাস করছি। তুমি আমাকে এখানে ডেকে এনেছ, তাতেই সব বলা হয়ে গেছে। তোমার মন এখনো আমাকেই চায়, আমি আছি। কেননা আমি তোমাকে এখনো চাই।'

'প্রবীর!'

ললিতা আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। প্রবীরের দুটো হাত টেনে নিয়ে নিজের মুখে চাপা দিল।

প্রবীর আরো নিবিড় হয়ে বললো, 'শান্ত হও ললিতা, চুপ করো।'-

প্রবীর ললিতার অ্যানেসথেসিয়ার গন্ধে ভরা উষ্ণ ঠোঁটের ওপর ওর মুখ নামিয়ে নিয়ে এল।

কুস্তি সংবাদ

তখন আমি বিহারের সাঁওতাল পরগনার কোন এক জায়গায় বেড়াবার উপলক্ষে অবস্থান করছিলাম। স্বাস্থ্যান্বেষণের কোন ব্যাপার ছিল না। যকৃত প্লীহা ফুসফুস ইত্যাদি বেশ ভালভাবেই তাদের কাজ করছিল। ক্ষুধামান্দ্য অম্ল অজীর্ণ উপসর্গ সকল আমাকে কোনরকমেই স্পর্শ করে নি। আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল, সাঁওতাল পরগনায় প্রকৃতি উপভোগ। রক্তমৃত্তিকা, খোয়াই, ছোটখাটো পাহাড়, খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, শালের বন, তালের জটলা এসব দেখা; এই প্রকৃতির মধ্যে ঘোরাফেরা। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, সেখানকার জল-বায়ুর একটি বিশেষগুণ, ক্ষুধাটা গিয়েছিল, এবং বেশি খেয়েও হজম হত। আমিও সাধ্যমত আহারে বিশ্বাসী এবং অভ্যস্ত। তথাপি প্রকৃতির হাত থেকে রেহাই পাই নি। ক্ষুধার প্রাবল্যটা প্রকৃতই বেড়ে গিয়েছিল।

বিহারের সাঁওতাল পরগনায় আমি যেখানে ছিলাম, সেটা একটা ছোটখাটো শহর। সে শহরও, নিতান্তই রেলওয়ে স্টেশনকে ঘিরেই। প্রকৃতপক্ষে, শহর শব্দটাই বোধহয় ব্যবহার করা চলে না। কিছুই দোকান-পাট, ছোট একটি বাজার, যে বাজারে আনাজপাতির বিশেষ অভাব। প্রধানত মুরগী, ডিম, পায়রা এসবই বেশি। চাল-ডাল-আটা ইত্যাদি মুদী দোকানেই পাওয়া যেত। মাছও কিছু কিছু আসত। বাঙালি চেঞ্জারদের পক্ষে তাতেই কুলিয়ে যেত। আমার সব থেকে ভাল লাগত ওখানকার স্থানীয় দই। যদিও বাঙালিদের সেই বিহারী দইয়ের স্বাদ মোটেই ভাল লাগত না। কারণ সে দই মিষ্টি না, এবং অনেক ক্ষেত্রেই গরুর দুধের না হয়ে, মহিষের দুধের হত। হাঁড়ি উপুড় করে ধরলেও, সেই দই পাথরের মত হাঁড়িতে আটতে থাকত। হাত দিয়ে খেলে রীতিমত মাখন চটচট করত। তবে স্টেশনের সামনের সেই ছোট বাজারটুকু বাদ দিলেও সেখান থেকে মাইল তিনেক দূরে সপ্তাহে দু'দিন হাট হত। কাছাকাছি দশবারো মাইলের মধ্যে, অধিবাসীরা সকলে সেখানেই হাটে যেত, আমরাও যেতাম।

যাই হোক, হাট-বাজার খাদ্য-স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিয়ে আমার কিছু বলার নেই

প্রসঙ্গক্রমে কথাগুলো এসে গেল। আমি সেখানে অলসভাবে বেড়িয়ে বেড়াতাম। আমার সঙ্গে কেউ ছিল না। যে বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়ি দেখাশোনা করত যে লোকটি, সে একজন মাঝবয়সী সাঁওতাল হলেও, বিহারী বলেই তাকে ভুল হত। সে সেই অঞ্চলের বিহারীদের দেহাতী ভাষাতেই কথা বলত, এবং তার চালচলনের মধ্যে কোথাও সাঁওতাল আদিবাসীর সন্ধান পাওয়া যেত না। সে-ই আমাকে রান্না করে দিত। এবং পরিচর্যা বলতে যা বোঝায় তা করত।

স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে, একটি বিশাল কাঁকর-পাথর বিছানো প্রান্তরের দু'পাশে দুটো গ্রাম আছে। বিহারী অধিবাসীদের গ্রাম। গ্রাম খুব বড় না। দুটো গ্রামই ছোট, অধিবাসীরা সকলেই প্রায় কৃষিজীবী বা পশুপালক। দু'চার ঘর গোয়ালাও আছে। আর আশেপাশে সাঁওতালদের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘর-গৃহস্থালি রয়েছে।

অনেক দিনই সেই গ্রামের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেহাতী ছেলেমেয়েদের গরু-মহিষ চরাতে দেখেছি। দেখে ভাল লাগত, যখন চোখে পড়ত, ছেলেমেয়েরা বিশাল কালো মহিষের পিঠে চেপে, ছোট হাঁটু ডোবানো নদী পার হয়ে যেত। অনেক সময় দেখতাম, পশুরা মাঠে চরছে, রাখাল ছেলেমেয়েরা খাবার খাচ্ছে বা গাছতলায় মুখের ওপর গামছা চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। কেবল ছোটরাই নয়, কখনো কখনো বড়দেরও দেখতে পেয়েছি। বড়দের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি।

সেখান থেকে ফিরে আসার কয়েক দিন আগে, পড়ন্ত বেলায়, সেই গ্রামের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গ্রামের ভিতরে কখনো বড় একটা প্রবেশ করতাম না। একদিন গানের শব্দ পেয়ে, গিয়েছিলাম। যে দিনের কথা বলছি, সেই দিন, প্রান্তরের ডানদিকের গ্রামে একটা জটলা দেখতে পেয়েছিলাম, এবং মেয়ে-পুরুষদের চড়া গলায় কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। তার জন্য আমার কোন কৌতূহল ছিল না। আমি একটি মেয়ের আর্তনাদ শুনে, কৌতূহলিত এবং আকৃষ্ট হয়ে, গ্রামের দিকে গিয়েছিলাম।

জটলার কাছে গিয়ে দেখলাম, মেয়ে-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-যুবা, অনেকেই সেখানে রয়েছে। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে। বয়স্কা-মেয়েদের কেউ হয়তো তার কোলের শিশুটিকে বুকজোড়া খুলেই খেতে দিয়েছে, যেন ক্ষুধার্ত একটি বাছুর সবুজ কচি ঘাসের বুকে মুখ ডুবিয়ে আছে, এবং সেই সঙ্গেই মা চিৎকার করে কথা বলে চলেছে। তাতে শিশুটির খাবার যেমন কোন ব্যাঘাত ঘটছে না, তেমনি মায়ের কথা ও চিৎকারেও কোন বাধা ঘটছে না। পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ হুঁকো

হাতে। মাঝে মাঝে টানছে, উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে কথা বলছে। কেউ বা শুকনো তামাক পাতার সঙ্গে চুন মিশিয়ে বাঁ হাতের তালুতে রেখে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ঘষছে। কেউ ঘাস-পাতার দড়ি পাকাচ্ছে বা দা দিয়ে তামাক পাতা কাটছে। কিন্তু কথা ও চিৎকার সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। সকলেই যে কাজ করছে, তা নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে, যারা কাজ করছে তারাও রীতিমত উত্তেজিত এবং এই আসরে অংশ নিচ্ছে।

জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে, গ্রামের বারোয়ারী তলার মত, যেখানে গ্রামের লোকেরা মিলিত হয়, পঞ্চায়েত বসে, নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, বিচার করে, এবং রায় দেয়। এদের বোধহয় সেই রকম কোন পঞ্চায়েতের আসরই বসেছে, কারণ এদের কথার মধ্যে 'সরপঞ্চ্' কথাটা কয়েকবারই আমি শুনতে পেলাম।

আমরা বাঙালিরা সাধারণভাবে হিন্দী বলতে যা জানি, এদের কথাবার্তা ঠিক সে-রকম না। একে ঠিক কী ধরনের 'বুলি' বলে, আমি জানি না। বিহারের মৈথিলি বুলি একরকম, যা আমরা বাঙালিরা সাধারণত বুঝে উঠতে পারি না। কারণ সে-মৈথিলি বুলি, শিক্ষিত বাঙালির জানা বিদ্যাপতির কবিতার ভাষা না। আমি এখন যাদের কথা বলছি, এদের ভাষা আবার অন্যরকম, যা আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছি না। তবে কতগুলো ইতর গালিগালাজের ভাষা বোধহয় একরকমই হয়। যেমন 'ছিনার' অর্থাৎ বাঙলায় যাকে ছিনাল বলা হয়, এখানে সে বিশেষণটি কয়েকবারই শুনতে পেয়েছি। কয়েকটি ক্রিয়াপদ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইতর উচ্চারণ, যেসব কথা লিখে প্রকাশ করা যায় না, তাও শুনতে পাচ্ছি।

যাকে উদ্দেশ্য করে এসব গালিগালাজ এবং ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত ইতর ভাষা প্রয়োগ করা হচ্ছে, সে একটি মেয়ে। তার বয়স এগারো-বারোর বেশি না, জানি না, তার চেয়েও কম কী না। মেয়েটির কালো চোখ, একটু বোঁচা বোঁচা নাক, কিন্তু কটা কটা মুখখানি বেশ মিষ্টি, বটের পাতার মত গড়ন। ঠোঁট দু'টি রাঙা। মাথার চুলে বেশ কিছু দিন তেল পড়ে নি, জট পাকানোর মত দেখাচ্ছে। শরীরের গঠন ছিপছিপে, পূর্ণাঙ্গ নারী হয়ে ওঠার অবকাশ যেন এখনো হয় নি, অথচ পূর্ণতার একটি স্পর্শ যেন তার শরীরে লেগেছে।

মেয়েটির দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। সামনে ছড়ানো ধুলো মাখা পা দু'টিও বাঁধা। ময়লা একটি কাপড় আর জামা তার গায়ে। সে কাঁদছে মাথা নিচু করে। তার মুখে বা হাঁটু অবধি তোলা কাপড়ের নিচে দেখলেই বোঝা যায়, তাকে প্রহার করা হয়েছে।

গোটা ছবিটা নিষ্ঠুর আর করুণ। করুণতর আরও এই কারণে, মেয়েটির বয়সী অন্যান্য মেয়েরা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। নির্দয় ঘৃণা প্রজ্বলিত চোখে। কেউ বা বিদ্রূপে শাণিত হাসি নিয়ে। নিজেদের মধ্যে তারা কী সব বলাবলিও করছে, কিন্তু তা একান্ত নিজেদের সমবয়সীদের মধ্যে। অন্যেরা সে-কথা শুনতে পাচ্ছে না।

কী এমন ব্যাপার ঘটতে পারে, বা মেয়েটি এমন কী অপরাধ করতে পারে, যার জন্যে গোটা গ্রামের মানুষ একত্র হয়ে এরকম শাস্তি দিচ্ছে! ও কি চুরি করেছে? ও কি কারো পালিত পশুকে বিষ খাইয়েছে, অথবা দুধের বাটে তুক্ করেছে? এ ধরনের দু'-একটা ঘটনার কথা শুনেছি, এসব অঞ্চলে নাকি ঘটে এবং সকলেই বিশ্বাসও করে। কেন না, ডাইনিতন্ত্রটা এখানে খুবই চলে, ডাইনি বিরোধী ঘৃণাও প্রচণ্ড। কিন্তু এ-রকম একটি মেয়ে কি ডাইনিতন্ত্র জানে? ডাইনিরা তো একটু বয়স্ক হয় বলেই জানি।

অবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিলাম। কিন্তু সকলে আমার দিকে মুখ তুলে এমনভাবে দেখছে, আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন মনে হল না। এটা গ্রামের মানুষদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। আমি একজন ভিন্‌দেশী অপরিচিত, ভিন্ন সমাজের মানুষ। স্বভাবতই তারা বিরক্ত হতে পারে। তাই আমি মনে মনে বিশেষ কৌতূহল নিয়ে, সেখান থেকে সরে এসে চলে যাবার উদ্যোগ করলাম। এই সময়ে শুনতে পেলাম, বাবুজী!

আমি ফিরে তাকালাম। দেখলাম, মাথায় চাদর জড়ানো একটি প্রায় বৃদ্ধলোক আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কালো মুখে, সাদা খোঁচাখোঁচা দাড়ি। লোকটিকে দেখেই চিনতে পারলাম। এ আমাকে রোজ দই দেয়। তাকে আমি দহিবালা বলে ডাকি।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেয়া দহিবালা?'

দহিবালার উচ্চারিত দেহাতী ভাষা আমার পক্ষে বলা বা লেখা সম্ভব নয়, তাই তার কথা আমি বাঙলাতেই লিখছি। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবুজী, আপনি চলে যাচ্ছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ। কেন না, আমার মনে হচ্ছে এটা তোমাদের গ্রামের কোন একটা ব্যাপার, আমার এখানে থাকা উচিত না।'

দহিবালা বলল, 'কথাটা বাবু ঠিকই বলেছেন। আজ সকাল থেকেই আমাদের এখানে গ্রামের পঞ্চায়েত বসেছে, একটা বিচার চলেছে।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সকাল থেকেই?'

'হ্যাঁ বাবুজী, সকাল থেকেই।'

'কিন্তু তুমি তো আজ সকালে আমাকে দই বিক্রি করতে গেছলে।'

'তা গেছলাম। কাজকর্ম তো সব বন্ধ করে দেওয়া যায় না। যার যা কাজ তাকে তা করতেই হবে, কারণ পঞ্চায়েত করলে তো আর পেট ভরবে না! কিন্তু সমাজ-ঘরের ইজ্জত রক্ষা করতে হলে পঞ্চায়েতও বসাতে হবে। তাই পঞ্চায়েতের ফাঁকে ফাঁকে কাজকর্মও করে নিতে হয়।

এসব তথ্য আমার জানা ছিল না। তা ছাড়া, এমন কি ব্যাপার ঘটতে পারে যে তার জন্য সকাল থেকে পঞ্চায়েত বসেছে, এবং এ পড়ন্ত বেলাতেও তা শেষ হল না? মামলার আসামী যাকে দেখতে পাচ্ছি, সে নিতান্তই একটি বালিকা। *এমন কী অপরাধ সে করতে পারে, একটা গোটা দিনেও যার বিচার* করা গেল না?

আমি দহিবালাকে শুধু জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার নিশ্চয়ই খুব গুরুতর?'

দহিবালার ভাষা বাঙলায় অনুবাদ করলে, এইরকম হয়, 'অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কারণ ব্যাপারটার মূল এখনো বোঝাই যাচ্ছে না।'

সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত যদি একটা ব্যাপারের মূলই না বোঝা যায়, তা হলে তো মারাত্মক ব্যাপারই হবে। আমার কাছে ঘটনাটা তো রীতিমত রহস্যময় বলে ঠেকল।

দহিবালা আবার বলল, 'এখন পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না, ব্যাপারটা যা ঘটেছে, তা মানুষের কাজ কিনা; অথবা কোন প্রেতাত্মার, যারা বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। যদি প্রেতাত্মার কাজ হয়, তবে বুঝতে হবে গ্রামের ওপর অপদেবতার নজর পড়েছে, দেবতার অভিশাপ লেগেছে। তা হলে গ্রামে মড়ক লাগবে। ফসল ফলবে না। একটা তছনছ কাণ্ড হয়ে যাবে। পঞ্চায়েতের মুখিয়ার মনে সেই রকম একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।'

বিংশ শতাব্দীর অর্ধ শতকে, কথাগুলো শুনে খুবই অবাক লাগে। এখনো যে মানুষ এসব বিশ্বাস করে, ভাবা যায় না। কিন্তু এই যে আমার সামনে দহিবালা, হাঁটুর ওপরে ময়লা ধুতি, গায়ে সামান্য একটা সুতি কাপড়ের জামা, মাথায় জড়ানো চাদর, এবং যেসব নরনারী আমার সামনে বসে আছে, এবং উঁচুনিচু দিগন্তবিস্তৃত রক্তাভ ভূমি, শ্যামল এবং রুক্ষতায় মিশ্রিত প্রকৃতি, এসবের মাঝখানে তাদের বিশ্বাসের একটা মূল বা শিকড় আছে বলে মনে হয়। আমার

মন দিয়ে যতই অবিশ্বাস করি, এইসব মানুষদের আমি অবিশ্বাসী মিথ্যাচারী ভাবতে পারি না।

কিন্তু আমার অবাক লাগছে। মানুষ বা অপদেবতা এমন কী কাজ করেছে, যে জন্য এরকম ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাতে পারে, এবং বালিকাটির সঙ্গেই বা সে-সবের সম্পর্ক কী। এটা তো স্পষ্টই যে, যা-ই ঘটে থাকুক, ওই বালিকাটি হচ্ছে সমস্ত অপরাধের মূলে।

দহিবালা আবার বলল, 'অবিশ্যি কোন দেবতার দয়াও হতে পারে। বাবুজী, আমরা আমাদের মানুষের চোখ দিয়ে সব সময়ে দেবতার লীলা বুঝতে পারি না। এখন মোট সমস্যাটা হচ্ছে, কাজটা কে করেছে? দেবতা, অপদেবতা, মানুষ? এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলেই বিচার হয়ে যাবে।'

রীতিমত ওদের বিষয়। এমন কী কাজ, যা দেবতা, অপদেবতা বা মানুষ, সকলের দ্বারাই ঘটতে পারে।

দহিবালা হঠাৎ বলল, 'আপনি বসুন না বাবুজী।'

'আমার কোন আপত্তি নেই। গ্রামবাসী বা পঞ্চায়েতের লোকেরা আপত্তি করবে কী না, সেটাই প্রশ্ন।'

আমার জবাবের আগেই দহিবালা মুখ ফিরিয়ে, গলা চড়িয়ে কী যেন বলে উঠল। সকলেই আমার দিকে ফিরে তাকাল।

দহিবালার 'বাবুজী' শব্দটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি দেখলাম, খাটিয়ার ওপরে তিনজন বসেছিল। তিনজনেই বুড়ো। তারাই বোধহয় পঞ্চায়েতের তিন প্রধান। ওরা আমার দিকে তাকিয়ে, নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করল। তারপরে দহিবালাকে যা বলল, তার মর্মার্থও বুঝতে পারলাম, আমাকে তারা এ আসরে বসতে দিতে সম্মত আছে।

দহিবালা আমাকে ডেকে বলল, 'আসুন বাবুজী।'

এবার আমি একটু লজ্জিত হলাম। আমাকে সেই তিন প্রধানের খাটিয়ার এক পাশেই বসতে দেওয়া হল। আমি তাদের কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলাম। তারাও মাথা নত করে, কপালে হাত ঠেকিয়ে আপ্যায়ন করল, এবং একজন বলল, 'বাবুজী, আমরা ভারি বিপদে পড়েছি। তার জন্য পঞ্চায়েত বসেছে।'

আমি চুপচাপ ঘাড় নাড়লাম।

প্রধানদের একজন সকলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'আমাদের এভাবে বসে থাকা চলে না। আমরা এখনো খাঁটি জবাবটা পাইনি।'

একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক হঠাৎ ছিপটি হাতে হাত-পা বাঁধা মেয়েটির কাছে ছুটে গেল এবং ছিপটি দিয়ে সজোরে মেয়েটির শরীরের যত্রতত্র প্রহার করতে লাগল। চিৎকার করে যা বলতে লাগল তা হচ্ছে, তুই এখনো মুখ ফুটে সত্যি কথা বলবি কিনা (গালাগালগুলো লেখা যায় না)। এতগুলো লোকের সামনে তুই এখনো মিথ্যা কথা বলছিস! হয় তুই মুখ খোল, তা না হলে তোকে খুন করে ফেলব।

বলেই ছিপটি দিয়ে আবার সপাং সপাং করে মারতে লাগল। বালিকাটি আর্তনাদ করে উঠল।

এই আর্তনাদ শুনেই আমি এগিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এই নিষ্ঠুর নারকীয় কাণ্ড আমি আর দেখতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন ছিপটির আঘাত আমারই গায়ে লাগছে। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কারোর মুখেই কষ্টের লেশমাত্র নেই। সকলেই চোখমুখ শক্ত করে, ঘৃণার দৃষ্টিতে বালিকাটির দিকে চেয়ে আছে।

একজন চিৎকার করে বলল, 'এ অপদেবতার কাজ না হয়ে যায় না। তা না হলে ছুঁড়ি এতক্ষণে মুখ খুলত।'

বালিকাটি কান্নার আর্তনাদের মধ্যে বলে উঠল, 'আমি তো বলছি, আমি তো সবই বলছি।'

আমার পাশ থেকে, তিন প্রধানের একজন চিৎকার করে বলল 'হেই মুনিয়ার মা, তুমি থামো।'

যে স্ত্রীলোকটি বালিকাটিকে মারতে মারতে নিজেই হাঁপিয়ে পড়েছিল, সে এবার প্রহার থামাল।

প্রধান বলল, 'বল মুনিয়া, তুই সত্যি কথা বল। আমরা তোর কাছ থেকে সত্যি কথা শুনতে চাইছি।'

বোঝা গেল, বালিকার নাম মুনিয়া। এবং প্রহার করছিল ওর মা।

আর একজন প্রধান চেঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু তুই কিছুই জানিস না—এ কথা আমরা শুনতে চাই না।'

মুনিয়া তখন প্রহারে প্রহারে অবসন্ন। ওর মাথাটা নুয়ে পড়ে প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকেছে। আঘাতের জায়গাগুলিতে হাত বোলাতে পারছে না বলে, গায়ের পেশী ও চামড়া কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমার মনে হল, সত্যি ওরা মেয়েটাকে খুন করেও ফেলতে পারে। যা-ই ঘটুক, আমার পক্ষে এই পীড়ন

বসে দেখা সম্ভব না। অথচ কিছু বলাও অসম্ভব। সে অধিকার আমার নেই, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। আমার কাছে খাটিয়ার নিচেই দহিবালা বসেছিল। আমি তার দিকে তাকালাম। কিন্তু সে মুনিয়ার দিকে উদ্‌গ্রীব চোখে তাকিয়েছিল। সকলেই মুনিয়ার দিকে দেখছিল।

মুনিয়া আস্তে আস্তে মুখ তুলল। ওর মুখ হাঁ হয়ে আছে, ওপর পাটির ঝকঝকে দাঁত আর জিভ দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো বোজা, গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আস্তে আস্তে ও ভেজা আরক্ত চোখ মেলে তাকাল, দৃষ্টিতে শূন্যতা। কয়েকবার কিছু বলবার চেষ্টা করেও বলতে পারল না, তারপরে উচ্চারিত হল, 'পানি…।'

প্রধানদের একজন বলল, 'ওকে পানি দাও।'

একটি বুড়ি ঝকঝকে ঘটি নিয়ে কাছে গিয়ে মুনিয়ার হাঁ-মুখে জল ঢেলে দিল। মুনিয়া ঢকঢক করে জল পান করল, গালের কষ বেয়ে কিছু গড়িয়ে পড়ল। মাথা নেড়ে জানালো, আর চায় না। তারপর আর একটু সময় ধুঁকে ও বলল, 'ভঁইষটাঁড়ের মাঠে—।'

সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠল। আমিও।

মুনিয়া আবার বলল, 'সেদিন ভঁইষটাঁড়ের মাঠে, গাছের তলায় আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম। আমার ভঁইষগরুরা তখন সেই মাঠে চরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি ঘুমোচ্ছিলাম…

মুনিয়ার কথা শেষ হবার আগেই, একটা প্রবল হট্টগোল লেগে গেল। সবাই হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে লাগল। সকলের চিৎকার চেঁচামেচি থেকে আমি যা বুঝতে পারলাম, তা হলো ভঁইষটাঁড়ের মাঠে 'গাছতলায়' মুনিয়ার ঘুমোবার কথা তারা সকাল থেকেই শুনেছে, আর শুনতে চায় না, এবং ঘুমোবার কথা তারা বিশ্বাস করে না।

মুনিয়া চুপ করে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল। তিন প্রধানের একজন চেঁচিয়ে বলল, 'মুনিয়া, তুই ভাল করে মনে করবার চেষ্টা কর। তোকে আমরা প্রথমেই বলেছি, তোর কোন ভয় নেই। লজ্জা করবারও কোন কারণ নেই। যা সত্যি, তুই তাই বল।'

একটি স্ত্রীলোক, যে তার শিশুকে, নিজের বুকটা মাঠের মত করে খুলে দিয়ে খাওয়াচ্ছিল, সে বলে উঠল, 'ওর আবার লজ্জা করবার কী আছে। ওর মত বেসরম (অশ্লীল গালাগাল) মেয়ে সরমকে চিবিয়ে খেয়েছে। ওর পেট ছিঁড়ে ফেলা উচিত।…'

তারপরে স্ত্রীলোকটি যা বলল, তা হল, মুনিয়ার বিশেষ অঙ্গে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া উচিত, এবং আরো যেসব ক্রিয়াকর্মের কথা বলল, তা যেমন অশ্লীল তেমনই নিষ্ঠুর।

দেখলাম, সকলেই সে কথা সমর্থন করল। মুনিয়ার বয়সী মেয়েরা ঘৃণার মধ্যেও হেসে, মুখে হাত চাপা দিল। মনে হল, তারা লজ্জা পেয়েছে।

এই সময়ে, আমার পাশ থেকে দহিবালা প্রধানদের উদ্দেশে নিচু গলায় বলে উঠল, প্রধানরা, 'তোমরা কিন্তু মুনিয়াকে কোন সময়েই ভাল করে কথা বলতে দিচ্ছ না। ও কথা শুরু করতে না করতেই সবাই চেঁচামেচি করছে।'

এক প্রধান বলল, 'কিন্তু মুনিয়া যে এক কথাই বারে বার বলছে।'

দহিবালা বলল, 'তা বলছে, কিন্তু ধৈর্য ধরে পুরো ঘটনাটা শোনাই হচ্ছে না। ও ভঁইষটাঁড়ের মাঠে গাছতলায় ঘুমোচ্ছিল, সেই সময়ে ওর ভঁইষগরুরা মাঠে চরছিল, তখন একজন ওর কাছে আসে, তাকে ও চেনে না···ব্যস্‌। অমনি সবাই এমন চেঁচামেচি হল্লা করছে আর মুনিয়ার বাবা মা মুনিয়াকে পেটাতে শুরু করছে। পুরো ঘটনাটা শোনা হচ্ছে না। তোমরা সবাইকে চুপ করতে বল। সাচ্চা ঝুটা যা-ই হোক, মুনিয়ার সব কথা শোনা দরকার।'

দহিবালার কথাগুলো আমার খুব ভালো লাগলো। যা-ই ঘটে থাকুক, (অবিশ্যি ঘটনার মাথামুণ্ডু আমি এখনো কিছুই বুঝি নি) তা পূর্বাপর সকলের শোনা উচিত। তা ছাড়া, আমার আরো মনে হল, দহিবালা প্রধান নয় বটে, কিন্তু তার বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ ভাল; এবং তাকে, সকলের মধ্যে হৃদয়বান বলে মনে হল।

দহিবালার প্রস্তাব, প্রধানদের বোধ হয় মনে লাগলো। তারা নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে আলোচনা করতে লাগলো।

আমি দহিবালার দিকে তাকালাম। দহিবালা মোটা নিচু স্বরে বলল, 'মেয়েটার কপাল খারাপ বাবুজী, তা না হলে কেন এমন হবে।' বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এখন তাকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হল, মুনিয়ার অপরাধটা কী? সে কী করেছে? কিন্তু তার আগেই, একজন প্রধান গোঁফে হাত বুলিয়ে, চিৎকার করে বলল, 'আমি সবাইকে চুপ করে থাকতে বলছি। মুনিয়া পুরো ঘটনাটা কী ঘটেছিল, আগে সব বলুক, তারপরে আমরা সত্যিমিথ্যা যাচাই করে দেখব। খটকা লাগলে, আমরা মুনিয়াকে জিজ্ঞেস করব, তোমরা কেউ কথা বলবে না। আসল কথা কী বেরিয়ে আসে, আগে আমাদের শোনা দরকার।'

তারপরে সে মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোন মুনিয়া, তুই ভয় না করে, শরম না করে, সমস্ত ব্যাপারটা বল। একটা কথাও তুই বাদ দিবি না।'

মুনিয়া তেমনি দূরের দিকে তাকিয়ে ছিল। ও ঠোঁট নেড়ে কিছু বলল, শোনা গেল না। তারপরে আবার গলা তুলে বলল, 'আমার হাত-পা তোমরা খুলে দাও।'

সকলেই অবাক হল মুনিয়ার কথা শুনে। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'দড়ি খুলে দিলেই ও পালিয়ে যাবে।'

দহিবালা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তা হলে মুনিয়াকে আমরা বর্শা বিঁধিয়ে মেরে ফেলবো। ও আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। কিন্তু যখন বলছে তখন ওর হাত-পা খুলে দাও।'

দহিবালার প্রতি আমি নিজেই কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম। তার কথায় যুক্তি ও সহৃদয়তাই দুই-ই আছে। তখন প্রধানদের একজন উঠে গিয়ে, মুনিয়ার বাঁধন খুলে দিল। মুনিয়া সেখান থেকে নড়ল না। উঠে বসল না। তার সুন্দর কচি মুখখানা চোখের জলে আর ধুলোয় আর ছিপটির দাগে অদ্ভুত দেখাচ্ছে, তবু এখন তার মুখে যেন একটু স্বস্তি আর আরামের ছাপ ফুটল। সে দু'হাত দিয়ে মাথার পিছনে চুল এলো খোঁপায় জড়িয়ে নিল। ময়লা কাপড়টাকে গায়ে ভাল করে গুছিয়ে জড়াল।

তারপরে সামনের দিকে দূরে তাকিয়ে বলল, 'আমি তাকে চিনি না···আমি তখন ভঁইষটাঁড়ের মাঠে, গাছতলায় নিদ্ যাচ্ছিলাম। আমার ভঁইষগরুরা মাঠে চরছিল। ঝট্‌সে আমার নিদ্ টুটে গেল, আমি দেখলাম, আমার পাশে সে বসে আছে।'

একজন প্রধান জিজ্ঞেস করল, 'সে কে?'

মুনিয়া বলল, 'তাকে আমি চিনি না। তাকে আমি আমার জীবনে কখনো দেখি নি। না ভঁইষটাঁড়ে, না শামপুরে, না শহরে বাজারে হাটে, না সাত দেবীতলা মেলায়, যেখানে তামাম দুনিয়ার লোক আসে। তাকে আমি কখনো দেখি নি।'

আর একজন প্রধান জিজ্ঞেস করল, 'তার উমর কত?'

মুনিয়া বলল, 'আমি জানি না, আমি মানুষের উমর বুঝি না।'

তখন আর একজন প্রধান জিজ্ঞেস করল, 'সে দেখতে কেমন। সে কি জোয়ান না বুড়ো ছিল?'

মুনিয়া এবার একটু ভাবল, কিন্তু সেই দূরে দৃষ্টি রেখে। তারপরে বলল, 'সে বুড়ো ছিল না। সে খুব বড় জোয়ান ছিল না। তার মাথায় বড় বড় চুল ছিল। তার রঙ কালো ছিল। সে দেখতে সুন্দর ছিল। তার গায়ে কোন জামা ছিল না, তার গায়ে চুল ছিল না।…'

মুনিয়া চুপ করল। তার মুখের অভিব্যক্তিতে একটু পরিবর্তন দেখা দিল। বড় বড় চোখে, মুখে যেন একটা স্বপ্নের ঘোর।

একজন প্রধান বলল, 'কোন কথা বাদ দিস না মুনিয়া। সব সত্যি কথা বল। সত্যি কথার থেকে বড় ধর্ম কিছু নেই, তাতে কোন লজ্জা নেই।'

আমার মনে হল, মুনিয়া প্রধানের কথা আদপে যেন শুনছেই না। ও আবার বলতে লাগল, 'আমি যখন চোখ মেলে তার দিকে তাকালাম, সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। আমার ভয় লাগল না। আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। তারপরে আমি দেখলাম আমার গা খোলা, আমার গায়ে তার হাত রয়েছে। সে কখন এসেছে, আমি কিছুই জানি না। সে আমাকে বলল, ভয় পেও না, আমি তোমাকে ভালবাসি। বলে সে আমার মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আমার খুব ভাল লাগছিল, মনে হচ্ছিল, সে যেন আমাকে মন্ত্র দিয়ে কেমন করে ফেলছিল। সে আমার পাশে শুয়ে আমার গায়ে হাত দিচ্ছিল। সে শিশুর মত আমার বুকে মুখ দিচ্ছিল, আমার সারা গায়ে হাত দিয়ে যেন খেলা করছিল।'

মুনিয়া আবার থামল। আমার মনে হল, আমি যেন এক অবিশ্বাস্য রূপকথা শুনছি। যদিও সেই রূপকথার মধ্যে, স্পষ্টতই বাস্তবের গূঢ় লক্ষণগুলোর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল।

একজন প্রধান জিজ্ঞেস করল, 'তখনো তুই চিনতে তাকে চিনতে পারলি না?'

মুনিয়া ঘাড় নেড়ে জানাল 'না।'

প্রধান আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোর কি মনে হল না, সে একটা ধূর্ত বদমাইস? তোর কি তখন মনে হয় নি, সে আর তুই-দুজনেই পাপ করছিস?'

মুনিয়া স্পষ্টভাবেই বলল, 'না। সে কী করছিল, আমি কিছুই জানি না। আমার ভাল লাগছিল। তাকেও খুব ভাল লাগছিল। আমি কোন দিকে তাকাই নি। শুধু তার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম…।'

তারপরে মুনিয়া যে ভাবে, যে ভাষায় পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দিল, তা মহাভারতের ভাষার থেকেও সরল এবং এত সরল ও গ্রাম্য যে, আমাদের লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকদের শ্রবণ পুড়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, লেখাও অসম্ভব।

মোট কথা, সে একটি পরিপূর্ণ রমণের বর্ণনা দিল, এবং তার দেহ ও মনের অনুভূতিসমূহের কথা স্পষ্ট করে বলল, যা আমার কাছে এখনো একটি স্বপ্নে দেখা ও শোনার মত মনে হয়। মুনিয়া আমাকে কেবল বিস্মিত করে নি, তার সত্য-বাদিতায় আমার মনে হয়েছিল, আমি বহু যুগ আগের ভারতের বুকে সেই যুগের মানুষদের মধ্যে বসে আছি। সেই ভাষা এবং বর্ণনার দ্বারা কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে না। এতক্ষণের সমস্ত রহস্য তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। দেবতা, অপদেবতা বা মানুষের কথা কেন উঠেছিল, তখন বুঝতে পারছিলাম।

মুনিয়া তার বর্ণনায় এ কথাও বলল, তার একটু রক্তপাত হয়েছিল, কষ্ট পেয়েছিল, কিন্তু ভাল লেগেছিল বেশি। সে যে গর্ভবতী হল, এ কথা সে জানত না। তারপরে মুনিয়ার যেন তন্দ্রার ঘোর লেগেছিল, এবং যখন তার তন্দ্রা ভেঙে যায়, তখন সে আর ছিল না। মুনিয়ার গা খোলা ছিল না, কাপড়চোপড় গুছিয়ে পরানো ছিল। মুনিয়া তখন মাঠের চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল, কোথাও তার চিহ্ন ছিল না। সবই যেন একটা ভোজবাজীর মত ঘটে গিয়েছিল। মুনিয়ার তখন কান্না পেয়েছিল, সে গাছতলায় বসে বসে খানিকক্ষণ কেঁদেছিল। ইতিমধ্যে তার ভঁইষ এবং গরুরা কোথায় চলে গিয়েছিল, দেখতে পাচ্ছিল না। খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে গিয়ে তাদের পেয়েছিল, তারা জল খেতে গিয়েছিল। জল দেখে পড়ন্ত বেলায় মুনিয়ার স্নান করতে ইচ্ছা হয়েছিল। সে স্নান করে, ভেজা কাপড়ে গৃহপালিত পশুদের নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল।

আরো জানতে পারলাম, এ ঘটনা ঘটেছে প্রায় ছ' মাস আগে। অর্থাৎ ভাদ্র মাসে। ভঁইষটাঁড়ের মাঠ আমার দেখা ছিল। ভাদ্রের দুপুরের রৌদ্রদগ্ধ নির্জন বিশাল মাঠের ছবি আমার চোখে ভেসে উঠেছিল। আর কেন জানি না, একটি প্রাচীন কবিতার কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, 'ই ভর বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।' যদিও মুনিয়ার বর্ণনায় কোন কথাই ছিল না, বলতে গেলে কোন প্রাকৃতিক বর্ণনাই ছিল না, তথাপি আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার অবাক লাগছিল, আমার সামনে মুনিয়া নামে যে দেহাতী বালিকাটি বসে ছিল, সে যে প্রায় ছ'মাসের গর্ভবতী, সে যে পুরুষ সঙ্গক্ষম, এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তার শরীরের দিকে তাকিয়ে আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। অথচ অবিশ্বাস করারও কিছু নেই, কারণ মুনিয়ার কথা থেকেই জানা গেল, গতকাল রাত্রে তার মা তার গর্ভবতী হবার কথা জানতে পারে, এবং

সে তার মাকে সব কথাই অকপটে বলেছে। কিন্তু সে কিছুই অনুমান করতে পারে নি, কেবল তার পেট একটু বড় হয়ে ওঠা ছাড়া এবং সে এ কথাও জানাল, তার কখনও ঋতুদর্শন ঘটে নি।

আরও একটা বিষয় আমার কাছে লক্ষণীয় মনে হল, গ্রামের যে-সব ক্রুদ্ধ অধিবাসীরা বসে ছিল, যারা অতি ইতর ভাষায় মুনিয়াকে গালাগালি করছিল, মুনিয়ার সমস্ত ঘটনা বর্ণনার সময় কেউ-ই কোনরকম বিদ্রূপ করা বা ইতর ভাষা বলে নি। সকলেই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

মুনিয়ার কথা শেষ হলে সকলেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। কারোর কারোর চোখেমুখে অবিশ্বাস এবং সংশয়ের অভিব্যক্তি। একজন প্রধান জিজ্ঞেস করল, 'মুনিয়া সেই মানুষকে তুই আর কখনো দেখতে পাস নি?'

মুনিয়া বলল, 'না। তাকে আমি জীবনে একবারই দেখেছি।'

তখন খাটিয়ার কাছেই একজন বৃদ্ধা উঠে দাঁড়াল। সাদা শন নুড়ি চুল বুড়ির মাথায়। তার চোখ ঘষা কাঁচের মত, সে অন্ধ। সে বলল, 'আমি এটা বলতে পারি, মুনিয়া যা বলেছে তা মিথ্যা হতে পারে না।'

সবাই অন্ধ বৃদ্ধার দিকে তাকাল। বৃদ্ধার চোখের ঘষা কাঁচের ক্ষেত্র কাঁপছে। মনে হয় মোটা পর্দার ভিতরে তার চোখের মণি নড়াচড়া করছে। সে আবার বলল, 'সরপঞ্চকে আমি এও বলতে পারি, মুনিয়ার পেটে যে বাচ্চা দিয়ে গেছে সে কখনো অপদেবতা হতে পারে না। সে যদি অপদেবতা হত, মুনিয়া পাগল হয়ে যেত, নয়তো অপঘাতে মারা যেত। কারণ অপদেবতারা যার ওপর ভর করে তার সর্বনাশ করে দিয়ে যায়।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সকলেই যেন দৈববাণী শোনার মত অন্ধ বৃদ্ধার কথা শুনছে, এবং বিশ্বাসও করছে।

বৃদ্ধা আবার বলল, 'মুনিয়ার পেটে কোন মানুষের বাচ্চাও নেই। মানুষ হলে, মুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হত না। ও চেঁচামেচি করত, আঁচড়ে কামড়ে দিত। আমাদের পশুপাখিদের এখনো মড়ক লাগে নি। গ্রামেও মড়ক লাগে নি। মাঠে এখনো ফসলের কোন ক্ষতি হয় নি, ফসল ভালই হয়েছে। আমার মনে হয়, এ কোন দেবতারই কাজ। মুনিয়াকে তাঁর ভাল লেগেছিল। তবু আমি একটা কথা বলব, মুনিয়ার বাচ্চা হওয়ার আগে যদি গ্রামের কোন ক্ষতি হয়, তবে বুঝতে হবে, এর মধ্যে কোন পাপ আছে।'

অন্ধ বৃদ্ধা চুপ করল। আমি সীমাহীন বিস্ময়ে দেখলাম, কারোর মুখে আর

কোন সংশয় বা অবিশ্বাস নেই। এমন কি পঞ্চায়েত প্রধানদেরও। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলাম কী ন', নিজেও ভাল জানি না, তথাপি যেন একটা স্বস্তি বোধ করলাম। বৃদ্ধার প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

তখন একজন পঞ্চায়েত প্রধান চিৎকার করে, সকলের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা সোতিয়া বুড়ির কথা সবাই মেনে নিচ্ছ?' প্রায় সকলেই একযোগে বলে উঠল, তারা মেনে নিচ্ছে। প্রধান বলল, 'পঞ্চায়েতও তাই মেনে নিচ্ছে। কিন্তু এখন কথা হল, শামপুরের লছমনের ব্যাটার সঙ্গে মুনিয়ার বিয়ে হয়েছে, বহুত আগে। সে যদি মুনিয়াকে আর না নিতে চায়, তা হলে কী হবে?'

কেউ কোন কথা বলল না। সোতিয়া নামে অন্ধ বৃদ্ধা বলল, 'যদি মুনিয়াকে শ্বশুরবাড়ি থেকে না নিতে আসে, তবে গ্রামের দেবী মঙ্গলার পূজা করবে মুনিয়া। মঙ্গলা দেবীর সেবা করবে, সেখানেই থাকবে সারা জীবন।'

একজন পঞ্চায়েত প্রধান বলল, 'আমরাও তাই চাই।'

আমি একবার উঠে দাঁড়ালাম। তখন অনেকেই উঠতে আরম্ভ করেছে, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। সকলের কাজকর্মও আছে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে। দেখলাম, মুনিয়ার মা এসে মুনিয়ার হাত ধরে মাটি থেকে তুলল। মুনিয়ার মুখ নিচু। চোখ জলে ভাসছে। কয়েক পলক আমি ওর দিক থেকে চোখ সরাতে পারলাম না। আমার মনে তখনো নানান প্রশ্ন ও বিস্ময়।

বিশ পঁচিশ বছর কেটে গিয়েছে। এখনো আমার মনে সেই বিস্ময় এবং প্রশ্ন সকল এক রকমই আছে। এবং মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যি কি এরকম ঘটনার আমি সাক্ষী ছিলাম? নিজেকে নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না, কারণ আমাদের বাস্তব বোধ এবং বিশ্বাসের ছকে না মিললে, অনেক কিছুই আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

নটপুত্ত

আমি ক্রীতদাস।...

নটপুত্ত বললেন ফিস্‌ফিস্ করে। তাঁর নগ্ন পরিব্রাজক শিষ্যরা চলেছে সঙ্গে। আর জনতা।

—আমি অনুভব করেছি, আমি ক্রীতদাস।...

নটপুত্ত আপন মনে বলছেন, আর নিরন্তর পথ চলছেন। সূর্য পরিক্রমার দক্ষিণায়নের শেষ কাল সমাগত। অসহ্য শীত। তুষারলেহী উত্তরে বাতাস ঝড়ের মতো বেগে বইছে। ধূলো উড়ছে। নীল আকাশকে ধূসর করছে। আবছায়ার অস্পষ্টতা দিকে দিকে। গাছেরা নিষ্পত্র, যেন রুগ্ন নগ্ন অচেলকদের মতো। ফুল সম্ভার নেই। পাখিরা চলে গেছে সমুদ্রসৈকতে, বঙ্গে, কলিঙ্গে, সিন্ধুতটে আর সুরাষ্ট্রে।

প্রবল বাতাস, শুকনো পাতা উড়ছে। বাতাসও শুকনো, নহলাদের চামড়ার লিকলিকে কশা-র মতো। সহস্র কশা-র চাপা তর্জনের শব্দ। ধূলোয় আর পোকায় প্রান্তরগুলি আচ্ছন্ন। জনপদগুলি অস্পষ্ট। মানুষেরা ছায়া ছায়া। কারণ, সকলেই আগুন জ্বালছে, তাই ধোঁয়া হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় রাজপথের ওপরেই অগ্নিকুণ্ড তৈরী করেছে গ্রামবাসীরা।

কিন্তু নটপুত্ত নির্বিকার। তাঁর বিশাল সুদীর্ঘ মূর্তি ধ্বজার মতো উন্নত। শক্ত কঠিন, আকাশস্পর্শী। তাঁর আজানুলম্বিত জটা যদিও তিনি গাছের গুঁড়িতে রেখে তীক্ষ্ম পাথর খণ্ড দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছেন, তবু এখনো কাঁধ এবং গ্রীবায় জড়িয়ে আছে। ধূলোয় রং বিবর্ণ সেই জটার, আর পাথরের মতো হয়ে গেছে। গুম্ফ শ্মশ্রু যেন ঝড়-ভীরু সাপের মতো তাঁর গাল চিবুক গলা আঁকড়ে কুঁকড়ে রয়েছে। সেগুলি ধূলোয় আচ্ছাদিত। সন্ধ্যার ধূসর মেঘের মতো তার রং। তাঁর কাঁধ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়া, ভেড়ার লোমের গোণক। বিস্রস্ত আলথাল্লার মতো তার দীর্ঘলোম মোটা গোণকটা শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠী নিজের গায়ের থেকে খুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন। চামড়ার বন্ধনী দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন গলার সঙ্গে। তাই পড়ে যায় নি কোথাও। সেটার রং ও তাঁর জটা শ্মশ্রু গুম্ফের মতোই হয়েছে। কারণ তাঁর চলা দশটি পূর্ণিমা অতিক্রম করে গেছে।

শ্রাবস্তীর ধুলো রক্তিম। কপিলাবস্তু ঘুরে এসেছেন। শাক্যরাজ্যের ধুলোও রক্তিম। বৈশালী এবং কৌশাম্বী আর ঋষিপত্তন মৃগদাব-কাশীগ্রামের ধুলো ধূসর। তারই মিশ্রিত রং তাঁর সর্বাঙ্গে। তাঁর বিশাল সিংহের মতো লোমশ বুকে। বলিষ্ঠ হাতে পায়ে।

এখন তিনি চলেছেন দক্ষিণ-পূর্বে, রাজবর্ত্মের উপর দিয়ে। শ্রেণিক তাঁর জামাতা-যৌতুক হিসেবে কোশলের কাছ থেকে কাশীগ্রাম লাভ করে এই পথ তৈরি করেছিলেন রাজগৃহ পর্যন্ত। তাঁর উজ্জ্বল বর্ণ আর সুন্দর দেহ, লোকে তাঁকে তাই বিম্বিসার বলত।

—আঃ। হে শ্রেণিক, আমি তোমাকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না। হে শ্রেণিক, আমার কথা কি তোমার মনে পড়েছিল? সেই শেষ মুহূর্তে? সেই অন্ধকার ঘোর কুটিল রাত্রে, যে মুহূর্তে তোমার পুত্রের অস্ত্র তোমাকে প্রথম আঘাত করল। আর তারপরে ভিক্ষু দেবদত্তের অনুচরদের কুঠার?

বিড়বিড় করতে করতে নটপুত্ত সহসা আর্তগলায় চীৎকার করে উঠলেন, ওহো, প্রিয় শ্রেণিক!···

অনুসরণকারী নগ্ন পরিব্রাজকেরা মুখ চাওয়াচায়ি করল। জনতার মধ্য থেকে কলরব উঠল, সেনিয় নেই।······সেনিয় মরে এতদিনে ভূত হয়ে গেছে।··· সেনিয়কে ওরা···

গলাটা যেন কেউ টিপে ধরল। বাতাস থাবাড়ি দিল মুখে। একটা ফিস্‌ফিস্ শব্দ ছড়িয়ে পড়ল জনতার মধ্যে। চুপ! চুপ!···এর মধ্যে যে কেউ গুপ্তচর হতে পারে। তার কাছে এক্ষুনি খবর চলে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছাগচমিয়া। ···কিংবা জ্যোৎমাল্! আই বাবা ভগবান্! হে বুদ্ধবাবা! হে নিগন্থবাবা! সে এখন হয়তো পাটলির গড়ে আছে। রাজগীরেও থাকতে পারে।

নটপুত্ত জানেন, ওরা অজাতশত্রুর কথা বলছে। হ্যাঁ পাটলিপুত্রে নতুন দুর্গ তৈরি করেছে সে। আর গুপ্তচর থাকলে ছাগচর্মিক শাস্তি হতে পারে। কানের কাছ থেকে গলা অবধি চামড়া ছিঁড়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে। নইলে জ্যোতিমাল। সারা গায়ে তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া।

একটা স্তব্ধতা নেমে এল। কেবল শীতার্ত নগ্ন পরিব্রাজকদের উর্ধ্বাঙ্গের রুক্ষ লোমশ পটিকা কাপড়ের খস্‌খস্ ভিক্ষাপাত্র ও জলপাত্রের ঠক্‌ঠক্ শব্দ। আর ধার্মিক জনতার হাতে খাদ্যভাণ্ডের ও জলন্ত কাঠের পট্‌পট্ শব্দ। তারা সিদ্ধপুরুষ নটপুত্তকে নিজেদের গ্রামের শেষ পর্যন্ত সেবা করতে করতে এগিয়ে

চলেছে। একটা গ্রাম শেষ হয়, আবার এক গ্রামের নরনারীরা ছুটে আসে।

কিন্তু নটপুত্ত অবিচলিত, বিকারহীন এগিয়ে চলেছেন। তিনি সেবা গ্রহণে বিরত। আশীর্বাদ উচ্চারণে নিরস্ত। তিনি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, হে শ্রেণিক, আমি ক্রীতদাস, আমি জানি। কিন্তু ভগবানেরা তোমার কাছে ছিলেন! আমি দেখলাম তোমার প্রতি উদ্যত কৃপাণের কাছে, তাঁরাও ক্রীতদাসের মতো নীরব, নতশির, অসহায়।

নটপুত্তের আকর্ণবিস্তৃত দীর্ঘপক্ষ্ম চোখ শুকনো। এক ফোঁটা জল নেই। তাঁর চোখের পাতা ধুলায় বিবর্ণ। তাঁর দৃষ্টি সামনে, দূর আকাশে নিবদ্ধ। সেখানে কোনো ব্যথার ছায়া নেই। রাগের বহ্নি নেই। আনন্দের উজ্জ্বলতা নেই। আছে আবিষ্কারের দূর অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণতা, আর বিস্ময়!

আকাশের ধূসর দিকচক্রবালে মধ্য আকাশস্পর্শী বিশাল মেঘখণ্ডের মতো তাঁকে দেখাচ্ছে। মানুষের কল্পিত রুদ্রদেবতা তাঁকে বলা যাবে না। কারণ ভেরী ও ঝাঁঝরের তীব্র শব্দ নেই। দৈত্যও বলা যাবে না। গর্জন নেই। সারা আকাশের বুকে যেন খোঁচা খোঁচা এক অতিকায় মেঘখণ্ড। স্থির বিদ্যুৎ দুই চোখ। সঙ্ঘের ধ্বজ ও পতাকা তুলতে যিনি নিষেধ করেছেন পরিব্রাজকদের। নটপুত্ত নিজেই যেন ধ্বজ ও পতাকার মতো চলেছেন আকাশে মাথা ঠেকিয়ে।

নিয়মানুযায়ী অচেলকদের মতো তিনি বিলেপন করেন নি, বিভু মাখেন নি। ধুলায় তিনি বিভূষিত। রক্তের বিলেপন তাঁর দেহে। বৈশালীর হুতাশ বাতাসে, আর এই মাগধীয় রাজবর্ত্মের হিমসাপের ছোবলে, তাঁর চোখের চারপাশের রেখাগুলি ফেটে ফেটে রক্ত পড়ছে। তাঁর উন্নত নাসা ফেটে গেছে। নাকের পাশে, গভীর রেখায় আর ঠোঁটের কষ ফেটে রক্ত পড়ছে। গুম্ফ শ্মশ্রুতে লেগেছে। স্তম্ভ সদৃশ জঙ্ঘা জীর্ণ প্রাসাদের পাথরের মতো ফাটা। অনাবৃষ্টিতে চৌচির মাটির মতো পায়ের পাতায় রক্ত জমে গেছে। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে রক্তের দাগ। রক্তের দাগ মাটিতে লাগছে না। রুক্ষ শুকনো বাতাসে রক্ত মুহূর্তে শুকিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তিনি নির্বিকার। তাঁর গন্তব্য, বেভার, পাণ্ডব, বেপল্লু, গিঞ্জকূট আর ইসিগিলি, পাঁচ পর্বত বেষ্টিত রাজগৃহ। বহু বছর পরে তিনি সেখানে প্রত্যাবর্তন করছেন। নির্গ্রন্থ দলীয়, অর্থাৎ নাতপুত্ত মহাবীরের সহধর্মী, সিদ্ধপুরুষ নগ্ন অচেলক, প্রাজ্ঞ নটপুত্ত বলে তাঁকে সারা দেশ জানে। কিন্তু

শ্রাবস্তী থেকেই তিনি প্রায় মৌন। শিষ্য পরিব্রাজকদের উপদেশ দেন নি। ধর্ম আলোচনায় একবারও রত হন নি। সাঙ্ঘিক রীতিনীতি নিয়ম রক্ষা করেন নি। পরিব্রাজকেরা তাঁকে ঈশ্বরের চোখে দেখে। তাদের নীরব বিস্মিত জিজ্ঞাসার কোনো জবাব দেন নি। তারা দুঃখিত হয়েছে। তিনি সান্ত্বনা দেন নি। কাউকে সঙ্গে থাকতে বলেন নি। চলে যেতে বলেন নি।

বসন্তকালে কোশলে একবার তিনি কেঁদে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, আমি ক্রীতদাস।...

বৈশালীর অগ্নিবৃষ্টি ঝরা রৌদ্রে দাঁড়িয়ে হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, আহ্! আমি ক্রীতদাস। আমার সংশয় দূর হয়ে যাচ্ছে।

এবং এখনো বলছেন আপন মনে রক্তাক্ত ঠোঁট নেড়ে, আমি জানতে পেরেছি, আমি ক্রীতদাস।...

আর এইভাবে চলেছেন। এইভাবেই সারা পথ তার পিছু পিছু দলে দলে নরনারী এসেছে। এক দল থেমেছে, আর এক দল এসেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গৃহপতি ধনী, শ্রেষ্ঠী আর সাধারণ জীবিকাশ্রয়ী জনতা। ধনী আর শ্রেষ্ঠী পুরুষ এবং মহিলারা সোনার বলয় আর কঙ্কণ, চন্দ্র আর মুদ্রা মস্তক ও কণ্ঠহার তাঁর দেহলগ্ন গোণকে এঁটে দিয়েছে। এবং এখনো দিচ্ছে। তিনি তাকিয়ে দেখছেন না।

নটপুত্ত যেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কল্পিত স্বর্গের এক বিশাল দেবতা। আর তাঁর পশ্চাদ্গামী পরিব্রাজক ও জনতা যেন মর্কটাকার ছায়া ছায়া দেবদূত।

তাঁকে দেখে সবাই চীৎকার করে উঠছে, ইনি গণোচারিয়া!

—আমি ক্রীতদাস!

মনে মনে বলছেন নটপুত্ত।

—ইনি মহাপরিব্রাজক নটপুত্ত।

—আমি ক্রীতদাস।...তিনি নিজেকে বলছেন।

—ইনি রক্ষিতেন্দ্রিয়! শীলসম্পন্ন!

নটপুত্ত জানেন, মানুষ অভ্যাসে বলছে। প্রতিধ্বনি করছে। যেমন, ইনি মহারাজ। হাঁ ইনি মহারাজ। উনি প্রজাপালক। উনি প্রজাপালক। ইনি-ই রক্ষাকর্তা! হ্যাঁ, ইনি রক্ষাকর্তা।

গ্রামে এই সব পুরুষ ও নারীরা, কাজে ও খেলায় রত। কোথাও গ্রামের পথে, কোথাও রাজবর্ত্মের ওপরে। কিংবা ঘরের মধ্যে। আর নগরে!

অগ্নিকুণ্ডের পাশে কোথাও মেষ কিংবা কুক্কুট যুদ্ধ লাগিয়ে মজা দেখছে। কাঠের ফলকে পঙ্‌ক্তি খেলছে। কাঠের ফলক যাদের নেই, তারা আকাশে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে ঘর কেটে কল্পনায় খেলছে। মাটিতে ঘর কেটে দৌড়ে দৌড়ে খেলছে। বঙ্কক খেলছে ছোট ছোট লাঙল দিয়ে। বাজিকরের কৌশল দেখছে। এমন কি দামামা বাজাচ্ছে। নৃত্য গীত বাদ্য প্রেক্ষা আখ্যান গান করছে।

ওরা অন্ধ খঞ্জদের অঙ্গবিকৃতি অনুকরণ করে খেলছে। আর বাজি ধরছে অপরের মনের ভাব বিষয় অনুমানের ওপর। কিংবা খেলুড়ির পিঠে কিছু এঁকে বা লিখে বাজি ধরছে।

নগরগুলিতে বাড়াবাড়ি সব থেকে বেশী। সেখানে অশ্ব-বৃষ-অজ লড়াইয়ের খেলা চলেছে। অক্ষক্রীড়া আর তালপাতার বড় বড় চক্র ঘোরাচ্ছে। নয় তো বাঁশী বানিয়ে বাজাচ্ছে। অপরাধীর কপালের হাড় তুলে গরম সাঁড়াশি দিয়ে মস্তিষ্ক টেনে বের করা দেখতে যাচ্ছে ভিড় করে। আর সেই অবস্থাতে ছুটে আসছে নটপুত্তের পিছনে পিছনে। শীতার্ত সবাই মৌরিয় আর মদ্যপান করছে। কামাসক্ত নরনারী নির্লজ্জ ব্যবহার করছে। কপি দম্পতিদের মৈথুনাসনের মতো বারবনিতারা নাগরদের কোললগ্না। অশ্লীল চিত্রপ্রদর্শন দেখছে অনেকে দল বেঁধে।

যারা অভিজাত আর ধার্মিক তারা চলেছে নিজেদের শৃঙ্খলায়। কিন্তু যে সব মাহিলরা নটপুত্তকে দর্শনের জন্যে ছুটে আসছে, সেই সব যুবতীরা, ধনী যুবকেরা, কেউ কেউ মত্ততা প্রকাশ করছে। তাদের মুখের কাছে মৌমাছিরা গুন্‌গুন্ করছে। তারা কেউ কেউ মদ্যপান করছে। এবং নগ্নপরিব্রাজকদের দেখে যুবতীরা কামাসক্ত হচ্ছে। আর ভাবছে, 'আমাদের পাপ হচ্ছে।' আর আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠছে, হে অর্হৎ! হে অন্তর্জ্ঞানী! আমাদের আশীর্বাদ করুন। আমাদের মঙ্গল্ করুন। হীনতা মার্জনা করুন।

আর কৃষককেরা, ক্ষৌরকারেরা, স্নাপকেরা, মোদক-মালাকার-রজক-নলকারেরা; গণক-মুদ্রিক, কুম্ভকারেরা; আর পশুপালকেরা, চেলক-চলক-পিণ্ডদায়কেরা, সকলেই কাজ ফেলে ছুটে আসছে। কারণ তাদের বুকের ভিতরের একটা অন্ধকার অপরিচিত জায়গা দুলে উঠছে। তারা প্রণত হচ্ছে। তারা চীৎকার করছে, ইনি তীর্থঙ্কর নটপুত্ত।

আমি ক্রীতদাস। আর সন্দেহ থাকছে না।

নটপুত্ত বলছেন, আর, মানুষের বিভিন্ন সত্তার যুগপৎ প্রকাশগুলি তাঁর অবচেতন অনুভূতিতে অনুভূত হচ্ছে।

আর যখন শববাহকেরা তাঁর সামনে পড়ছে, আত্মীয়স্বজনেরা যখন মিছিল করে প্রচলিত শোককথা বলে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে, 'তুমি এমন শত্রুতা করলে...' তখন নটপুত্তকে দেখে তারা স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে হঠাৎ চীৎকার করে উঠছে, হে ত্রিকালজ্ঞ! আপনার দর্শন পেয়ে এ মৃতের আত্মা স্বর্গলাভ করুক।

—স্বর্গ নাই! আমি ক্রীতদাস।...

নটপুত্ত বলছেন মনে মনে। শবের দিকে দৃকপাত করছেন না। দূর-নিবদ্ধ দৃষ্টি তাঁর অপলক। আর শববাহকেরা, আত্মীয়-স্বজনেরা নিবিষ্ট অনুসন্ধিৎসায় দেখছে। চুপিচুপি বলাবলি করছে নিজেরা. 'আই বাবা! দেখ উনি কী রকম দেখছেন। নরকের প্রহরীকে উনি চলে যাবার হুকুম দিচ্ছেন। আর স্বর্গের দূতকে ডাকছেন। আমি স্পষ্ট দেখেছি, ওঁর ঠোঁট নড়ছিল।

—নরক নাই। আমি ক্রীতদাস।...

নটপুত্ত নিজেকে বলছেন। কিন্তু জনতা কিংবা পরিব্রাজকেরা শুনতে পাচ্ছে না। তিনি এখনো নিজেকে বলছেন। আর তাঁর সমগ্র ধ্যান পরিব্রজন কৃচ্ছ্রতাসাধন, সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা অবচেতনে ক্রিয়া করছে।

ভবিষ্যৎ বাণী ব্যতিরেকেই বোধহয় হিমপ্রবাহ নেমেছে। সমগ্র ভূমি এবং আকাশ মেঘ ও কুজ্ঝটিকায় ছেয়ে যাচ্ছে। শিষ্য পরিব্রাজকেরা কেউ কেউ কাতরধ্বনি করছে। আর ভাবছে, 'আমার কষ্ট হচ্ছে, আমার মধ্যে পাপ আছে।' তখন তারা তীর্থঙ্কর নটপুত্তের ধ্যান করছে। কারণ তীর্থঙ্করই ঈশ্বর। আর কোনো কোনো পরিব্রাজক, যারা একটু বয়স্ক, সদ্য যাদের সিদ্ধিলাভ স্বীকার করেছে, তারা নিজেদের ইচ্ছায়, সেবাব্রতী মানুষদের অনুরোধে থেমে পড়ছে। আর ভাবছে, 'আমি পাপ করছি।' তবু সেবা গ্রহণ করছে, কারণ সে নিজেকে স্খলিত ভাবছে। আর তাই ধনী গৃহপতি যুবতী বিধবার বাড়িতে নানান প্রকার অদৃশ্যজীবী উপদ্রবকারীদের শাস্তিবিধানের জন্যে কপট নির্গ্রন্থীয় উপাসনায় রত হচ্ছে। ভাবছে, 'আমি পাপ করছি।' আর তাই কামাসক্ত হয়ে পড়ছে এবং ভয়জনিত কামনা অশক্ত। তাই যুদ্ধে পরাস্ত হচ্ছে, আর উপহাসের পাত্র হচ্ছে যুবতীর কাছে। 'এও পাপের ফল' ভাবছে, আর বিকারগ্রস্ত হয়ে অরণ্যে চলে যাচ্ছে।

নটপুত্ত অবিচলিত চলেছেন। এখন প্রাচীন পাথরের গায়ে শ্যাওলার মতো রক্ত জমাট হয়ে উঠেছে তাঁর পায়ের ফাটলে। তাঁর সুগৌর গণ্ড আগুনে পোড়া তামার পাত্রের মতো হয়েছিল। এখন সেখানে রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে। আর কালো আকাশের পটে তাঁকে কুটিল হিংস্র থাবা নিয়ে যেন ভয়ে আরো ঊর্ধ্বে চলে যাচ্ছে। অবাক হয়ে যেন সেই বিশাল মূর্তিকে দেখছে।

সকলের হাতে জ্বলন্ত পিপ্পলের ডাল। যেন একটা আগুনের মিছিল।

ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা বিদ্রূপ করছে নটপুত্তকে, ইনি দিগম্বর, তাই ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন।

আর চীৎকার করে হাসছে।

নটপুত্ত বলছেন, ঈশ্বর নাই। আমি ক্রীতদাস।···

—ইনি নাকি ঔপপাতিক।

আবার হাসি।

—এঁর বাবা ছিল না। মাও ছিল না। ইনি নাকি ঔপপাতিক।

—মানে অযোনিজ! হাঃ হাঃ হাঃ!···

নটপুত্ত নির্বিকার। তিনি মনে মনে বলছেন, আমি যোনিজ, কামজ। ঔপপাতিক সত্তা কিছু নাই। আমি ক্রীতদাস···

—তবে ইন্দ্র বরুণের দিব্যি গেলে বলছি, লোকটা খুব কষ্টসহিষ্ণু।

—আর তাই অজাতশত্রুর মন গলে যাবে।

—তারপর দেবদত্ত ভিক্ষু যেমন করে বিম্বিসারকে হত্যা করিয়েছিল এও হয়তো উদীয়কে দিয়ে তার বাপকে···

—চুপ! চুপ! গূঢ়পুরুষ সেইসব ছিনারের বাচ্চারা হয় তো আশেপাশে আছে।

—ওরে বাবা! চুপ! চুপ! শ্রাবন্তীরাজ পর্যন্ত হার মেনে গেছে। নিজের ভাগ্নে অজাতশত্রুর সঙ্গে, নিজেরই বোনের বিয়ে পর্যন্ত দিতে হয়েছে।

—হাঁ বাবা, সব চুপ। নইলে পলালপীঠ।

একটা চাপা আর্তধ্বনি করল পুরোহিতেরা পলালপীঠ! আই বাবা! হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সারা শরীর মাংস রাশিতে পরিণত করা। দোহাইবাবা নটপুত্ত, তোমার জয় হোক!

নটপুত্ত জানেন, উদীয় অজাতশত্রুর ছেলে। আর অজাতশত্রুর একমাত্র ভয়, তার ছেলে কোনদিন তাকে গুপ্তহত্যা করবে। কারণ পিতাকে সে

হত্যা করেছিল। আবার, হে শ্রেণিক, আবার তোমার কথা মনে পড়ছে। যেদিন ঘোষিত হল, আমি তীর্থংকর হয়েছি, তারপরে আমি রাজগৃহে গিয়েছিলাম। তুমি আমার কাছে ধর্মের উপদেশ শুনতে এসেছিলে। আমি তখন মহাবীরের সহধর্মী। হে শ্রেণিক! আমি তোমাকে অবাস্তব উপদেশ না করেছিলাম! তারপর তুমি গৌতমের শরণাপন্ন হয়েছিলে। হে শ্রেণিক, সেই ঘোর কুটিল রাত্রে, যে মুহূর্তে তোমার দেহে প্রিয়তম পুত্রের অস্ত্র আঘাত করল, সেই মুহূর্তে তুমি জানলে, এ সংসারে ত্রাণকর্তা কেউ নাই।

আর একবার সশব্দে ফুক্‌রে উঠলেন নটপুত্ত, ওহো, শ্রেণিক, আমরা সবাই ক্রীতদাস।...

কথা বোঝা গেল না। সবাই ভাবল, উনি কষ্টে আর্তনাদ করছেন। আগুন নিয়ে অনেকে তাঁর কাছে দৌড়ে এল। উনি একইভাবে চললেন। আর, ছদ্মবেশী তস্করেরা তাঁর দেহের কাছে ঘন হয়ে চলতে লাগল। তাঁকে স্পর্শ করে পুণ্য করার ভান করছে ওরা। গোণক থেকে সোনার অলঙ্কার আর মুদ্রাগুলি তুলে নিতে চাইছে। কিন্তু ওদের ভয় করছে। কারণ ওদের পাপের সংস্কার আছে। হয়তো হাতটা এখুনি খসে পড়বে। জ্বলে যাবে। জনতা এবং পাপের ভয়ের ঘাম-দরিয়ার স্রোতে ওরা ভেসে চলেছে।

নটপুত্তের অবচেতনে এগুলি অনুভূত হচ্ছে। আর তিনি বলছেন, ক্রীতদাস! আমি ক্রীতদাস!...

আর নালন্দার রাজবর্ত্মে হিম-প্রবাহের পর, নতুন রৌদ্র তখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। আর রাজবর্ত্মের উচ্চ চড়াইয়ের শীর্ষে, নটপুত্তকে মনে হল, তিনি আকাশ থেকে অবতরণ করলেন। পিপ্পল আর দেবদারু আর কোশাম্বী গাছের ঊর্ধ্ব আকাশে যেন তিনি ঠেকে আছেন। তিনি দাঁড়ালেন, আর সহসা চীৎকার করে বলে উঠলেন, আমি ভুজিষ্য নই!

পরিব্রাজকেরা থম্‌কে গেল। জনতা স্তব্ধ। আর নালন্দার গ্রাম থেকে নরনারী ছুটে আসছে।

নটপুত্ত আবার চীৎকার করে উঠলেন, আমি ভুজিষ্য নই। আমি মুক্তদাস নই।

পরিব্রাজকেরা সমবেত গলায় বলে উঠল, আপনি তীর্থংকর, আপনি দেবতা।

বৈশালীর পরে এই প্রথম তিনি হাসলেন। বললেন, আমি ক্রীতদাস!...

নগ্ন পরিব্রাজকেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। রৌদ্রে

তাদের আরাম লাগছিল। তারা মনে করল, তীর্থংকর গনাচার্য নটপুত্ত নিশ্চয় ভিন্ন জগতের সঙ্গে কথা বলছেন। হয়তো স্বয়ং পার্শ্বনাথ এসেছেন তাঁর কাছে। এবং তাঁর এই ধ্যানী দশা দেখে জনতা মাটিতে শুয়ে পড়ল।

• নটপুত্ত রাজগৃহের দিকে এগিয়ে চললেন। আর মনে মনে বলতে লাগলেন, এই গ্রামেরই এক বৈশ্যের ঘরে আমি ক্রীতদাস ছিলাম। বাবা মাকে আমি অস্পষ্ট চিনি। বৈশ্যকর্তা বলতেন, তাঁরা ছিলেন পরিব্রাজক ও পরিব্রাজিকা। গৃহিণী বলতেন, আমার বাবা ছিলেন নট। মা নটী। তাঁরা এই গ্রামে নাচ ও পট দেখিয়ে চলে যাবার সময়, আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কারণ, তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। তখন আমার চার বছর বয়স। নারন্দার বণিকের গরু চরাতাম আমি, তাদের পরিচর্যা করতাম। বাবা মার কথা ভাবতে আমার ভাল লাগত। আমার কান্না পেত। আমাকে সবাই নটপুত্ত বলে ডাকতেন। বাড়ির সকলেই স্নেহ করতেন। আমি কখনো জলে ছায়া দেখতাম না। সকলের মুখে শুনতাম, আমি সুন্দর। আমার মাথায় ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি, আর স্নিগ্ধ জলাশয়ের মতো আয়ত চোখ।...আমার যখন সাত বছর বয়স, তখন গোশালের জ্যেষ্ঠ দাস, গোচারণ মাঠে কামুকের মতো ব্যবহার করেছিল আমার সঙ্গে। আমি গৃহকর্ত্রীকে বলে দিয়েছিলাম। তাতে গোশালের জ্যেষ্ঠ দাসের ভীষণ শাস্তি হয়েছিল। গরম লৌহদণ্ড দিয়ে তার প্রত্যঙ্গে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছিল। সে চীৎকার করে কেঁদেছিল। আমারও কান্না পেয়েছিল।...

গৃহিণী আমাকে অন্তঃপুরের কাজে রেখেছিলেন। তবু আমাকে আগলে রাখতে হত। সেই বৃহৎ অন্তঃপুরের মহিলা এবং দাসীরা কামুকীদের মতো ব্যবহার করত। রাত্রে কে আমাকে নিয়ে শোবে, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করত। কিন্তু মায়ের মতো ব্যবহার তারা করত না। ঘৃণিত ব্যবহার করত আর রাত্রিব্যাপী বিবসনা থাকত।

গৃহিণী শুধু আমাকে ছেলের মতো রক্ষা করতেন। তারপর ষোল বছর বয়সে আমি অন্তঃপুরের বাইরে, বাড়ির কাজে বহাল হই। আমি শুনতে পেতাম, আমার যদি ভালো কুল এবং শীল হত, তবে গৃহপতির কন্যা সুগন্ধার সঙ্গে আমার বিয়ে হত। গৃহিণীই বিশেষভাবে একথা বলতেন তাঁর কন্যার সম্পর্কে। সুগন্ধা ছিল আমার বান্ধবী তুল্যা। সে ছিল কুসুমের মতো সুন্দর আর সুগন্ধযুক্তা। কিন্তু আয়েশ এবং আরাম আর মন্দ দাসীদের সঙ্গে থেকে থেকে, অল্প বয়সেই সে বিকারগ্রস্ত কামাতুরা হয়ে উঠেছিল। সে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দেবতা মনে

করত, আর তাদের কাছ থেকে মন্ত্রপড়া ফুল নিয়ে দাসীদের সঙ্গে বাজি খেলত। তার পিতার সঙ্গে গূঢ়ভাবে ক্রীড়ারতা দাসীর কাছে পিতার কাহিনী শুনত। অশ্লীল পট দেখত। মৌরিয় পান করত। তখন তার চোখ ঠোঁট গাল রক্তবর্ণ হত আর দাপাদপি করত। তখন দাসীরা আমাকে ডেকে নিয়ে যেত গৃহের নিম্নতল কুঠরিতে। প্রভুকন্যা আমাকে আদেশ করত তার সঙ্গে লিপ্ত হতে। আমি আদেশ পালন করতে পারতাম না। আমার ঘৃণা হত না, একটা আবেগ আসত। কিন্তু একটা প্রতিরোধ আপনি গড়ে উঠত। • আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকত। দাসীরা এবং অপরাপর মহিলারা হাসাহাসি করত। নিজেদের মধ্যে অঙ্গভঙ্গি করে তারা আমাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করত। সুগন্ধা আমাকে চুম্বন করত আর রাগে সারা গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিত। বিকারের যন্ত্রণায় তার কষ্ট হত। আর আমার কান্না পেত। সুগন্ধা আমাকে বিষ্ঠাভোজী বলে গালাগাল দিত। আমার কান্না পেত। কিন্তু বহির্বাটীতে এসেও শান্তি পেলাম না। কাম এবং দ্বেষ আর হিংসা এবং স্বার্থ আমাকে জড়ীভূত করে ফেলেছিল। কঠিন পরিশ্রমী এবং অনাহারী গ্রামবাসী, অসহায় গৃহপালিত পশু, যজ্ঞের বলি এবং শক্তিমানদের উল্লাসের মধ্যে আমি দেখছিলাম, কেবল দুঃখ। কেন এসব আমি দেখেছিলাম, জানি না। আমার কান্না পেত।…আর তখনো গো-বৎসের মতো কেবলি মুখ তুলে তুলে আকাশের দিকে তাকাতাম। বাবা মাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করত। আমার কান্না পেত। গৃহপতির অনুমতি নিয়ে আমি আবার গোশালার কাজে ফিরে গিয়েছিলাম। এই দুঃখের কারণ জানবার জন্যে, আমি উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম। আমি আর সব ভুলে গিয়েছিলাম। আহারে শয়নে, সর্বক্ষণ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নীতি-জ্ঞানহীন অনাচার অত্যাচার ও রাজশক্তি ও জনশক্তির ভীরুতা 'আমাকে নির্বাক করেছিল। আমি হাসতেও ভুলে গিয়েছিলাম। আমার জড়ীভূত অবস্থায় সকলে বিদ্রূপ করত এবং করুণা করত।

সেই সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা গোচারণ মাঠ থেকে ফিরে আমি বসেছিলাম গোশালের কাছেই। জানতাম না, আমার চোখে জল পড়ছিল। সহসা গৃহপতি কর্তা আমার সামনে এসে পড়লেন। কিন্তু আমি তাঁকে সম্মান করতে ভুলে গেলাম। আমি বসে রইলাম। গৃহপতি কর্তা দাঁড়ালেন আমার সামনে। জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছ কেন হে নটপুত্র।

উনি কে, কে কথা বলছেন, দেখলাম না। আমি বললাম, বড় দুঃখ।

—কিসের ?

—অসুন্দরের, অন্যায়ের, অসহায়তার, অনাহারের, অবিবেক আর অবিচারের।

—কোথায় ?

—এই বিশ্বময়।

গৃহপতি কর্তা একমুহূর্ত চুপ করে থেকে চলে গেলেন সহসা। গোশালার দাসেরা এসে আমাকে সজাগ করল। শাস্তির ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই গৃহপতি বাড়ির সকল নরনারী এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। এবং গৃহপতি কর্তা স্বয়ং। আমি দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। গৃহপতি কর্তা আবাব প্রশ্ন করলেন, নটপুত্তের কান্নার কারণ কী আমি শুনতে চাই।

আমি আবার আমার কথার পুনরুক্তি করলাম। বললাম, প্রভু, আপনার কাছে শুনেছি, আপনি বাণিজ্য করতে গিয়ে দেখেছেন, সমুদ্র অশেষ। এবং আকাশও অশেষ। দুঃখ সেইরকম দেখছি। এর হাত থেকে কি পরিত্রাণ নেই ?

সহসা গৃহপতিকর্তা হাত জোড় করে বললেন, হে নটপুত্ত, আমি সামান্য মানুষ, আমি জানি না। হে নটপুত্ত, আপনি ভুজিস্য। আপনি মুক্ত। আমি আপনার চোখে এক অপূর্ব আলো দেখছি। আমি দেখছি আপনি সামান্য নন। আমরা দেখছি, আপনি পূজ্য।

আমি বললাম, প্রভু, আমি আপনার দাস। আমাকে অমন কথা বলবেন না।

কিন্তু গৃহপতি কর্তা আমার কথাকে বিনয় মনে করলেন। বললেন, হে নটপুত্ত, আমি ভুল করি নাই। আমরা অনেকদিন লক্ষ্য করছি। আজ সব সন্দেহের নিরসন হল। আপনাকে দাস হিসাবে পালন করার সাহস আমার আর নাই। আপনি ভুজিস্য। আমরা দেখছি, আপনি পূজ্য।

আমি তাঁদের নিবারণ করতে পারলাম না। মনে হল, আমি দুঃখ মুক্তি করব। এ বিশ্বে আমার কাজ আছে। আর সে-কাজ দুঃখ মুক্তির অনুসন্ধান।

মুহূর্তে এ কথা নারন্দার গ্রামে রটে গেল। আর আমাকে গ্রামবাসীরা দেখবার জন্যে ছুটে এল। আমি লজ্জা পেলাম। সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম। সেই সময়ে সেই গ্রামে এসেছিলেন একজন পার্শ্বনাথের পরিব্রাজক শিষ্য। আমি তাঁর সঙ্গে প্রভুগৃহ ত্যাগ করেছিলাম। তারপর……

জনতা চীৎকার করে উঠল, তীর্থংকর নটপুত্ত রাজগৃহে ফিরে এসেছেন!

—আমি ক্রীতদাস।…

নটপুত্ত চীৎকার করে উঠলেন। সকলে চুপ হয়ে গেল। এর মানে কী? সকলেই নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। তাঁর শিষ্য নগ্ন পরিব্রাজকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। সন্তোষজনক জবাব কেউ দিতে পারল না।

রাজগৃহের পাঁচ পর্বতের পাঁচটি চূড়া ভেসে উঠল আকাশে। রাজবর্ত্মের ওপর দিয়ে আর একটি সুউচ্চ চূড়ার মতো চলমান নটপুত্ত এগিয়ে আসছেন। তাঁর গোণক এখন বসন্ত বাতাসে উড়ছে। এখন তাঁর জমাট রক্ত গলছে আর স্বেদ বইছে শরীরে। পথের ওপরে পায়ের দাগ পড়ছে।

পাখিরা ফিরে আসছে। গাছে গাছে ফুলেরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। অপ্রতিহত ভাবে জাগছে কিশলয়। নগরে আর উপকণ্ঠে নরনারীরা বেশভূষা করে বেরিয়েছে। বসন্তের আমেজে এমনিতেই সকলে বেশী ক্রীড়াসক্ত। নটপুত্তকে ঘিরে তাদের ভিড় বাড়তে লাগল।

অনেকে বলাবলি করতে লাগল, ইনি মণ্ডিত এবং বিভূষিত নন কেন? দণ্ড, নাড়িক, খড়্গ, ছত্র কিছুই দেখতে পাই না কেন? এঁর শাস্তা তীর্থংকরের চিত্রিত পাদুকাই বা কোথায়?

—আমি ত্যাগ করেছি।

নটপুত্ত দাঁড়ালেন। বেনুবন পার হয়ে, ইসিগিলি পর্বতের পাদদেশে, এক বৃহৎ কালো শিলাখণ্ডে হেলান দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। পিঙ্গল পাষাণের মতো বুক খুললেন। আর গোণক খুলে, কোমরে বেঁধে নগ্নতাকে আবরিত করলেন। আর চীৎকার করে বললেন, বন্ধুগণ, আমি সব ত্যাগ করেছি। একদা আমি দাস ছিলাম। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার দাসত্ব ঘোচে নাই। আমি ক্রীতদাস।

কে যেন বলে উঠল, গিজ্ঝকূটে নিগ্রন্থকে সংবাদ দাও।

আর একজন বলল, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিশ্চয় মস্তিষ্ক বিকারের বিষ খাইয়ে দিয়েছে। নইলে—

হঠাৎ একজন একটি ছোট পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে বলল, হে তীর্থংকর, আমি কৃষক সুদেব। আমি রাজগৃহেরই বাসিন্দা। আপনি আমাকে চেনেন। গভীর জঙ্গলে একদিন আপনি আমাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ক্ষুধার্ত বাঘ আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে, আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল। তীর ধনুক বর্শা তরবারি। কিছুই আপনার হাতে ছিল না। আপনি সিদ্ধপুরুষ। হে প্রভু! আপনি কিসের ক্রীতদাস?

নটপুত্ত বললেন, জন্মের হে সুদেব।

একটা স্তব্ধতা। জন্মের ক্রীতদাস? একটা গুঞ্জন চলতে লাগল। নটপুত্ত এক ধাপ উঠে দাঁড়ালেন। কালো শিলাখণ্ডের ওপরে তাঁর ছিন্নজট মাথা জেগে উঠল। তিনি উচ্চ কণ্ঠে বললেন, হাঁ, জন্মের। বন্ধুগণ, জন্ম, জরা, শোক, দুঃখ, আর শেষতম মৃত্যুর ক্রীতদাস আমরা। সমগ্র মানুষেরা। এর কোন নিবারণ নাই।

নটপুত্তের দৃঢ় গলায় কথাগুলি যেন নিষ্ঠুর দৈববাণীর মতো শোনাল। একজন চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল, ভগবান বুদ্ধের কি মৃত্যু হবে?

নটপুত্ত বললেন, আমোঘ মৃত্যু তাঁকেও গ্রাস করবে।

—আর মহাবীর নিগ্রন্থ?

—মৃত্যু তাঁকেও গ্রাস করবে।

—তারপর?

—তারপর কিছুই নাই।

—স্বর্গ?

—নাই।

—নরক?

—নাই। স্বর্গ নাই, নরক নাই, মহানির্বাণ নাই।

আবার স্তব্ধতা। কে একজন কেঁদে উঠে চীৎকার করে উঠল, আমার ভয় লাগছে নটপুত্তকে। চল আমরা সরে পড়ি।

একজন ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন, হে নটপুত্ত, তবে নিশ্চয় জন্মান্তর আছে?

নটপুত্ত হাত তুলে বললেন, নাই, জন্মান্তর নাই।

নগ্ন পরিব্রাজকেরা আর্তনাদ করে উঠল। কারা যেন হেসে উঠল। তারা বলে উঠল, ওঁর মতে কিছুই নাই।

—মিথ্যা কথা।

নটপুত্ত চীৎকার করে বললেন, ওরা মিথ্যা কথা বলছে। জন্ম জরা শোক দুঃখ মৃত্যু আছে। আর আছে মানুষ আর এই জগৎ। চারিভূত বিশিষ্ট মানুষের এই দেহ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কায়া পৃথিবীর কায়ায় প্রবেশ করে। কায়ার জল, পৃথিবীর জলে মিশে যায়। কায়ার তেজ পৃথিবীর তেজে প্রবেশ করে। কায়ার বায়ু, এই পৃথিবীর বায়ুতেই মেশে। ইন্দ্রিয়গুলি শূন্যে মিলিয়ে যায়। অস্থি ছাই হয় এবং সকল শ্রেণী, সকল বিভাগের মানুষ মৃত্যুর পর একই অবস্থা

প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর কৃতকর্মের অবশিষ্ট থাকে, ভিন্ন কোন জগতের অস্তিত্ব নাই।

যেন একটা অসহ্য শূন্যতা সবাইকে গ্রাস করল। কেউ কেউ দৌড়ে পালাতে লাগল। কেউ কেউ গিজ্ঝকুটে মহাবীরের কাছে গেল। কিন্তু কৌতূহলবশত—আরো অনেক লোক ভিড করে আসতে লাগল। নগর অভ্যন্তর থেকে নরনারী আসতে লাগল। সেখানেও খবর পৌঁছেছে।

একজন বৌদ্ধ শ্রমণ উঠে দাঁড়ালেন একটি পাথরের ওপরে। বললেন, হে তীর্থংকর নটপুত্ত, আমার কয়েকটি কথার জবাব দিন।

নটপুত্ত বললেন, হে কাষায়বস্ত্র পরিহিত মানুষ, আমি উদ্ধত নই! আপনি প্রশ্ন করুন।

এই প্রথম শ্রমণকে এমনি সম্বোধন শোনা গেল। কাষায়বস্ত্র পরিহিত মানুষ! শ্রমণ জিজ্ঞেস করলেন, যে ধ্যানের দ্বারা ভগবান বুদ্ধ কিংবা আপনার সহধর্মী মহাবীর সত্য প্রকাশ করেছেন, তা কি মিথ্যা?

নটপুত্ত দু হাত শিলাখণ্ডে বিস্তৃত করে দাঁড়ালেন। বললেন, তার আগে হে বিচিত্রবেশী নর, আপনাকে জানাই, ঋষিপত্তনমৃগদাবে আমি যৌবনে ধ্যানস্থ ছিলাম। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমি নগ্ন, সত্য ও ধর্ম সন্ধানে অবিচলিত রয়েছি। ব্রহ্মচর্য ইন্দ্রিয়জয় ইত্যাদি যা বলা হয়, আমি সে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনেছি, আর তাই আজ আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।

সকলে দেখল, নটপুত্তের চোখে জল। সবাই বলাবলি করতে লাগল উনি কাঁদছেন।

সকলেই স্তব্ধ। আরো ঘন হয়ে আসতে লাগল।

নটপুত্ত বললেন, বন্ধুগণ, সত্য নির্মম এবং মহৎ। আমি যখন তীর্থংকর, সঙ্ঘাচার্য, ত্রিভুবন ভ্রমণকারী বলে পূজ্য প্রশংসিত, তখন আমি জানলাম, ধ্যান নাই। উপাসনা নাই। তাই শ্রমণ নাই, ব্রাহ্মণ নাই, নির্গ্রন্থ নাই, তীর্থংকর নাই। দেব নাই, দেবী নাই, মারভুবনও নাই। পরলোকও নাই। এ সকলই কল্পনা।

কল্পনা? চারদিকে গুঞ্জন উঠতে লাগল। এ সবই কল্পনা? শ্রমণ ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হলেন। তাঁর এসব কথা শোনা ভিক্ষু-নিয়ম বিরুদ্ধ।

নটপুত্ত চীৎকার করে বললেন, হাঁ, কল্পনা। ভয়জনিত কল্পনা। দেশ এবং কালের সমস্যায় কল্পিত এর কোনোটাই অমোঘ নয়। ধর্মার্থে দান নাই, গ্রহণ

নাই। দান ভয়জনিত। গ্রহণ মিথ্যা অহংকার। যে ধ্যানী এবং তীর্থংকর বলেন, তিনি মাসকাল অন্ন গ্রহণ করেন নাই, শীতে ও গ্রীষ্মে নগ্ন ছিলেন, তাই তিনি অর্হত্ত লাভ করেছেন, তবে গত বৎসরে বৃজিরাজ্যের দুর্ভিক্ষের সময় সকল প্রজাই অর্হত্ত লাভ করেছিল। তারা মাসের পর মাস খায় নাই। গাছের ছালও লজ্জা নিবারণের জন্য জোটে নাই। আমি বলি, জন্ম জরা শোক দুঃখ মৃত্যুর মতোই ক্ষুধা অমোঘ। তার নিবারণ নাই।

এমন সময়ে একখণ্ড পাথর এসে নটপুত্তের কাঁধের কাছে কালো শিলাখণ্ডে আঘাত করল। ভেঙে চৌচির হল। অনেকে চীৎকার করে উঠল কে? কে ছুঁড়লে?

নটপুত্তের ব্যাঘ্র-দমন চক্ষু শান্ত ও দূরগামী হল। তিনি বললেন, বন্ধুগণ! ওদের মারতে দাও। আমি জানি শ্রমণ ব্রহ্মণ নিগ্রন্থ, কেউ আজ আমাকে এখানে রক্ষা করতে আসবেন না। জন্ম জরা শোক দুঃখ মৃত্যু ক্ষুধার মতোই সত্য আছে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করেই আমি তা বলব।

আরো কয়েকটা পাথর এসে পড়ল। নটপুত্তের দেহ রক্তাক্ত হল। অগ্নিময়, হল তাঁর পিঙ্গলদেহ। চারদিকে গোলমাল, ধস্তাধস্তি, ছুটোছুটি লেগে গেল। আর, নগ্ন পরিব্রাজকেরা সমবেত গলায় শাস্তার ধ্যান করতে লাগল।

নটপুত্ত চীৎকার করে বললেন, বন্ধুগণ, স্থির হও। আমি আরো বলছি

—উনি আরো বলছেন।

—কী বলছেন ছাই কিছুই বুঝতে পারছি না।

—কিন্তু পাথর ছুঁড়ছে কারা?

—হে নটপুত্ত, আপনি পরিষ্কার করে বলুন, কী বলতে চান?

নটপুত্ত কালো শিলাখণ্ডের আরো এক ধাপ ওপরে উঠলেন।

—উঠবেন না, ওরা পাথর ছুঁড়বে। আপনাকে হত্যা করবে।

নটপুত্ত বললেন, বেদনার নিরোধ নাই। মৃত্যুই অমোঘ। ওদের মারতে দাও। বন্ধুগণ, সংসার ত্যাগের মধ্যে মহত্ত্ব নাই, ওর আর এক নাম পলায়নপরতা। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা দর্শন যারা চিরতরে দমন করে নাই, এবং জানে, দমন করে এই বস্তু জগতে বাঁচা সম্ভব নয়, শুধু কামদমনকেই তারা ইন্দ্রিয়-জয় নাম দিয়েছে। যদি কেউ বলে, এই ভূমিখণ্ডে অলগর্দ (সাপ) নাই, কারণ তা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না, ইন্দ্রিয়জয় সেইরূপই মিথ্যা। ইন্দ্রিয় জয় হয় না, দমন হয় না, নিয়ন্ত্রিত হয়।

একজন হিহি করে হেসে উঠে বলল, এই আমাদেরই মতো তা হলে?

কে একজন বজ্রকঠিন গলায় চীৎকার করে উঠল, চুপ! ওকে বলতে দাও।

সবাই অবাক হয়ে দেখল, ইনি মহারাজ বিম্বিসারের কালের অপরাজেয় যোদ্ধা, মাগধ ক্ষত্রিয় বিম্বাধর। বর্তমানে যুদ্ধ-ব্যবসা ত্যাগী।

নটপুত্ত বললেন, হাঁ, মানুষের মতো।

বিম্বাধর পাথরের ওপরে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নায়ক নটপুত্ত, তবে কি কোনো ধর্ম নাই।

—আছে।

নটপুত্তের কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছিল। আর পিঙ্গল বুক ভেদ করে রক্ত পড়ছিল। হাত দিয়ে রক্ত নির্ঝর মুছে বললেন তিনি, আছে হে ক্ষাত্রবীর বিম্বাধর। এক ধর্ম, মনুষ্য ধর্ম।

—কিন্তু হে নটপুত্ত, আপনি বলছেন, আমরা ক্রীতদাস।

—হাঁ, আমরা ক্রীতদাস। ক্রীতদাস জন্মের, জরার, শোকের, দুঃখের, বেদনার, মৃত্যুর। এর নিরোধ নাই, নিবৃত্তি নাই, জয় নাই। তাই এগুলির কাছে আমরা বিশ্বস্ত থাকব, মানব।

এমন সময়ে অশ্বসওয়ার উগ্রপুরুষ (রাজপুরুষ) কয়েকজন জনতার মধ্যে প্রবেশ করলেন। এবং দুইটি হাতী, উগ্রপুরুষদের নিয়ে দুদিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল। জনতা ছত্রভঙ্গ হতে লাগল। চীৎকার করতে লাগল, ছুটোছুটি করতে লাগল।

আর সেই মুহূর্তেই বসন্তের অকালবর্ষা চুপিচুপি উঠে এল আকাশে। মেঘ ডেকে উঠল। চিকুরহানা বাজ গর্জন করল। পঞ্চপর্বতে মহীরুহকুল সঘন স্বননে বিলুলিত হল।

বিম্বাধর চীৎকার করে বললেন, কী উপায়ে?

নটপুত্ত বললেন, মনুষ্যধর্মের দ্বারা।

—তার স্বরূপ কী?

নটপুত্তের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ চীৎকারে চাপা পড়ে যেতে লাগল। তিনি চীৎকার করে বললেন, সাহস এবং সততা, প্রত্যক্ষ কর্ম, প্রেম, মৈত্রেয় ও ঐক্য।

একটা সমবেত চীৎকার শোনা গেল, আবার বলুন। আবার বলুন। আমরা কিছু বুঝতে পারছি না।...

—তার আগেই উগ্রপুরুষের কণ্ঠ ধ্বনিত হল, হে তীর্থংকর নটপুত্ত, আপনি

যা নাই বলেছেন, তা কল্পিত, এবং যা আছে বলেছেন, তা অমোঘ। কিন্তু আপনি রাজার বিষয় কিছুই বলেন নাই।

নটপুত্ত তাঁর রক্তাক্ত হাত তুলে বললেন, আমি তাও বলব, হে উগ্রপুরুষ, আমি বলব। যিনি জ্ঞানী, তিনি সকল কিছুই দর্শন করেন। তিনি যাকে নাই বলেন, তা পৃথিবীর বারংবার পরিবর্তনশীল রূপ দেখেই বলেন। যা আছে বলেন, তা অমোঘ প্রত্যক্ষেই বলেন। আমি বলি হে উগ্রপুরুষ, বৃজি, লিচ্ছবী, শাক্য গণতন্ত্রের প্রধানগণ যেমন অমোঘ নন,রূপান্তর আছে, রাজা তেমনি অমোঘ নন।...

—নন?

—না। তাঁর রূপান্তর আছে। এই বস্তুজগতের নিরন্তর পরিবর্তনশীলতা রাজা-প্রজা সকলের নিয়তির মতো।

উগ্রপুরুষগণ একযোগে চীৎকার করে বললেন, এবার আপনি স্তব্ধ হোন। বেদ এবং সঙ্ঘ এবং জিন আর রাজার নির্দেশে আমরা বলছি, আপনি দেশত্যাগ করুন।...

নটপুত্ত চলেছেন। আর সেই নগ্ন পরিব্রাজকেরা তাঁর সঙ্গে চলেছে। তাদের তিনি বারণ করেছিলেন সঙ্গে আসতে। তারা শোনে নি। তারা নটপুত্তকে ছাড়বে না।

নটপুত্ত দক্ষিণে, চোল রাজ্যের দিকে নেমে চলেছেন। ক্ষতদেহে তাঁকে শান্ত প্রশান্ত দেখাচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী যেন বর্ষা বিদ্যুৎ এবং বজ্রপাত হচ্ছে।

পরিব্রাজকেরা মাঝে মাঝে ধর্মালোচনার মতোই জিজ্ঞাসা করছে, আমরা কী করব?

—লোহারের কাছে গিয়ে বংকক গ্রহণ কর, কৃষি ক্ষেত্রে যাও। কিংবা যে কোনো জীবিকাশ্রয়ী হও।

—আমরা কী করব?

—তোমরা স্ত্রী গ্রহণ কর, সঙ্গীত কর, নৃত্য কর, উৎপাদন কর।

—আমরা কী করব?

—তোমরা সাহসের দ্বারা, সততার দ্বারা, প্রত্যক্ষ কর্মের দ্বারা, মানুষের সঙ্গে প্রেম-মৈত্রেয় ও ঐক্যের দ্বারা, জন্ম জরা শোক দুঃখ বেদনা মৃত্যুর সঙ্গে বিশ্বস্ততা স্থাপন কর। এগুলিকে স্বীকার কর, মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর।

এই অবস্থায় অজাতশত্রুর রাজ্য ছেড়ে, চলে যেতে যেতে, এক সায়াহ্নে

জঙ্গলের পাশে নটপুত্ত দেখলেন, একটি অচৈতন্য দেহ পড়ে আছে। দেহটি নারীর এবং তিনি ভিক্ষুণী। মুণ্ডিতকেশিনী, কিন্তু নির্যাতিতা, অনাবরিতা। চীর ধূল্যাবলুণ্ঠিত, ভিক্ষাপাত্র কাছে নেই। তিনি অটুট দেহ, সুগৌরী।

নটপুত্ত তাঁকে চীবর পরালেন। দীর্ঘ সময় শুশ্রূষা করে, তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। ভিক্ষুণী জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমে ভীতা হলেন। পরে বিস্মিত হলেন। তারপরে অধোবদনে রইলেন। একটু পরে সহসা মুখ তুলে বললেন, আপনি তীর্থঙ্কর নটপুত্ত, আমি চিনেছি।

নটপুত্ত বললেন, আপনার পরিচয় আমার অজানা।

ভিক্ষুণী বললেন, আমি ছিলাম উক্কাচেলা বিদেহের শ্রেষ্ঠীকন্যা। এখন ভিক্ষুণী সুবিনীতা। আমি এই নির্জন বনে ধ্যানস্থা ছিলাম। এমন সময়ে একজন দুর্বৃত্ত—

সুবিনীতা চুপ করে গেলেন নটপুত্ত বললেন, আপনি ধর্ষিতা। আপনি দুঃখিত নারী।

নারী? সুবিনীতা ভিক্ষুণী। স্রোতাপত্তি ফল থেকে, তিনি আলয়বিহীনা। অর্হত্ত লাভে ধ্যানস্থা। কিন্তু নটপুত্তকে তিনি সে কথা বললেন না। বললেন, হ্যাঁ আমি ধর্ষিতা।

নটপুত্ত বললেন, আপনি গৌতমের কাছে যান।

—যেতে পারছি না।

—কেন? আপনার তো কোনো অপরাধ নাই।

—জানি। কিন্তু—

সুবিনীতা লজ্জায় এবং ব্যথায় পাংশু হলেন। বললেন, আপনাকে বলতে আমার দ্বিধা নেই, আপনি আমার সেবা করেছেন। সেই দুর্বৃত্তকে আমি ঘৃণা করেছি, কিন্তু আমার ইন্দ্রিয় আমার অনিচ্ছায় সুখপ্রাপ্ত হয়ে, আমাকে কলংকিত করেছে। হে ধার্মিক নটপুত্ত, দুর্বৃত্তের আক্রমণে আমার জ্ঞান লোপ পায় নাই, তজ্জনিত ইন্দ্রিয়ের অপ্রতিরোধ্য হর্ষোৎপাদনের লজ্জায় ও আতঙ্কে আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

বলে সুবিনীতা কাঁদতে লাগলেন। নটপুত্ত বললেন, আপনি বৃথা লজ্জিত এবং আতঙ্কিত। মানুষ, সে যেই হোক, সকলের পক্ষেই তা অপ্রতিরোধ্য।

সুবিনীতা অবাক হয়ে তাকালেন। নটপুত্ত তাঁর সমগ্র কথা সুবিনীতার কাছে পুনরুক্তি করলেন।

বৃষ্টি বিদ্যুৎ মেঘগর্জনের মধ্যে নটপুত্ত কথা বললেন। কথা শেষ করে, তিনি উঠলেন। বিদায় চাইলেন।

সুবিনীতা বললেন, আমি আপনার সঙ্গে যাব ?

—আপনার অভিরুচি।

—তবে আপনি দয়া করে আমাকে আপনার বিশাল বুকে নিন। আমি ক্লান্ত অসুস্থ।

নটপুত্ত সুবিনীতাকে বুকে তুলে বৃষ্টি বিদ্যুৎ এবং বজ্র মাথায় করে এগিয়ে চললেন।

অশরীরিণী

গ্রাম্য স্টেশনটা দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল শুভেন্দুর। মেজাজ খারাপ ছিলই নানান কারণে। শুভেন্দু সেই ধরনের সস্তা আবেগ বাহুল্যবর্জিত ছেলে, ভিতরে বাইরে পুরো নাগরিক জীবন কাটাতে গিয়ে, গ্রামের নামে যাদের প্রাণ উথলে ওঠে না। গ্রাম-পুকুর-দীঘি বাগান-পাখি-আকাশ এসব তাকে কোনোদিনই বিস্মিত করে নি। তাক লাগায় নি। গ্রামের আকাশ দেখে, রবিঠাকুরের দু'লাইন কবিতা আবৃত্তি করে ওঠা, ওসব মধ্যবিত্তসুলভ ভাঁড়ামি বলে সে জানে। আর সে রকম অনেক ভাঁড়কেও সে দেখেছে। শহরের যে যতো সেরা পোকা, পাড়াগাঁয়ের নামে লালা ঝরে তাদেরই বেশী।

গ্রাম থাকুক গ্রামকে নিয়ে। শুভেন্দু শহরকে নিয়ে থাকতে চেয়েছিল। বালিগঞ্জের দীঘিই তার সেরা দীঘি। চৌরঙ্গির ময়দান আর পার্ক এবং গঙ্গার ধারের আকাশ-মুক্তি-সবুজই যথেষ্ট। কংক্রীটের ফুটপাতে যে দু'চারটে শুকনো পাতা উড়ে আসে, আর ধূলি রক্তিম আকাশে যেটুকু দখিন হাওয়া বহে, আর বসন্ত উথলে ওঠে তাইতেই সে খুশী। তাইতেই মনে হয়, আজ একটু ডাকি বনশ্রীকে। গিয়ে বসি ময়দানের মাঝখানে। কী আর। ও একটু কাজল মাখবে চোখে। আমি যাব চলে একটু বেশী ঢেউ তুলে। ও বলবে বিয়ের চেষ্টা কিন্তু চলছে। আমি বলব, চাকরি জুটছে না কিছুতেই।

কলেজের বন্ধুত্ব ওর বেশী আর কত দূরে গড়ায়। কিংবা, কলকাতার ইমারতমোড়া আকাশে যেটুকু বর্ষা নামে, মেঘ গর্জায় আর বিদ্যুৎ চমকায়, তাই-তেই শুভেন্দুর প্রাণে দাদুরী ডাহুকীরা হেঁকে ডেকে ওঠে। তাইতেই মনে হয়, জল ছপছপিয়ে, স্যাণ্ডেল আর কাপড় ভিজিয়ে, যাই গিয়ে ডাকি রেখাকে। বসি গিয়ে কফি হাউসে। রেখা যদি ভেজে একটু ভালোই। স্বাস্থ্যটা তো নিটুট। গঠনটিও নিখুঁত। ওর সঙ্গে সুবিধে এই, প্রেমের ছেলেমানুষিটা রেখার একেবারেই নেই। আমার মতো, দাদাদের অন্নে পালিত আর দাদাদের রুপোয় চকচকে গ্র্যাজুয়েটকে অতটা বিশ্বাস ওর নেই। একটু আস্কারা দেয় অবিশ্যি। বর্ষায় কফি হাউসে সেটুকু ভাঙিয়ে খেতে একটা অনুগ্র ইচ্ছে হয়ই।

আর বনশ্রী রেখাদের ছাড়াও, কলকাতার ছক কাটা আকাশে, আঁকাজোকা মেঘ-রৌদ্রও সার্বজনীন বারোয়ারীতলার ঢাকের শব্দে যথেষ্ট ঝলকায়। শারদশ্রীর ভাগ যে তাতে কম পড়ে, মনে তো হয় না। কিংবা শীতের ধূসর কলকাতার নানান নাচ-গান-জাদু আর জনবহুলতা কিংবা বিদেশীদের ভিড় কম রোমান্টিক নয়।

কলকাতা, কলকাতাই। তার ধূলি জল যাই হোক, জন্ম থেকে শুভেন্দু তাই মেখে খেয়ে মানুষ। আর সেই শহরের মানুষেরাই তার চিরকালের চেনা। সেখানে তার পঁচিশ বছর কেটেছে। কোনোদিন মনে হয় নি যে বাংলাদেশের পাড়াগাঁ আবিষ্কার না করলে, জীবনটা বুঝি ব্যর্থ। বরং পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যেই একটি অত্যন্ত সাধারণ জীবনের স্বপ্ন সে দেখেছিল। মোটামুটি একটি ভদ্রগোছের চাকরি। একটি বিয়ে। বান্ধবীদের মধ্যেই কেউ একজন হলেই হত। একলা একটি বাসা। ছেলেমেয়ে হলেও চলে না হলেও ক্ষতি নেই। নিরুপদ্রবে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যাওয়া। কিন্তু এই শহরেই। এই শহরেরই কেওড়াতলা অথবা নিমতলায় শেষদিনে গিয়ে পৌঁছুনো।

উনিশ থেকে পঁচিশ, ছ'টা বছর, নানান অভিজ্ঞতা এক ধরনের প্রাজ্ঞ করে তুলেছে তাকে। আর সে অভিজ্ঞতাও এ শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলা যায়। ওর বুদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিনা, জানা নেই, কিন্তু আত্মচিন্তায় ও ধরাবদ্ধ উদ্বুদ্ধ হয়ে এসেছে। আর সেইতেই হয়তো স্কুল কলেজের বিদ্যার্জনে ওর যে-মেধা বেশ সাফ ছিল, সেই বুদ্ধির দৌলতেই, জীবনের একটা আনুপূর্বিক ছবি ওর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে।

ও ভেবে দেখেছে, গ্যারিবল্ডি বা বিদ্যাসাগর হতে পারলে একটা লাভ ছিল। কিন্তু ও নিশ্চিন্ত যে, তা হতে পারবে না। এবং একটা তত্ত্বও প্রায় আবিষ্কার করেছে, এ যুগে আর তা নাকি সম্ভব নয়। এবং এ যুগের আর একটা সুলভ প্রবণতা নিজের মধ্যে লক্ষ্য করেছে। ভেবেছে, ইয়োরোপে যেতে হবে। যে জন্যে, কোনো বন্ধু ইউরোপে যাবে, কিংবা ঘুরে এসেছে, শুনলেই, ও তাদের কাছে অবিনীত আর দুর্মুখ হয়ে উঠত। খুব সম্প্রতি সে কম্‌প্লেকসও কেটে গিয়েছে। এখন মনে মনে বলে, 'আমি যদি ইয়োরোপে যাই, তা হলে, সকাল থেকে রাত্রি অবধি আমি কী করব। তার একটা নিখুঁত রোটিন এক্ষুনি করে ফেলতে পারি। সবটাই আমার চোখের সামনে ভাসছে।'

কল্পনা ওর সুদূর। ঘরের কোণে বসেই এক সময়ে সহসা চিন্তাযুক্ত মনে

আবিষ্কার করে, আর ওর কোনো কৌতুহল নেই। সব মিটে গিয়েছে। তাই সঙ্গতির প্রশ্নের আগে, ইচ্ছেরই মৃত্যু ঘটেছে।

কৌতূহল ছাড়াও, জীবনের লাভের অংশে যেটুকু পড়ে, সেটাও দেখল, সেই একই পৌনঃপুনিকতার মধ্যে পড়ে।

অর্থাৎ শুভেন্দুর এই যে উচ্ছ্বাসহীন, উৎসাহহীন, প্রায় সব দায় সারা গোছের জীবন, তার মূলে এর সেই আবিষ্কার যে, জীবনটা হল পৌনঃপুনিকতায় আবর্তিত। এ চিন্তাই এক ধরনের প্রবীণতা ও বিজ্ঞতা ওর মধ্যে এনে দিয়েছে। বন্ধুদের কিংবা বান্ধবীদের প্রতি ওর অনেক ভবিষ্যৎ বাণী, অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে, এই জীবনের বৃত্তটা ও অনেক দূর অবধি দেখতে পায়। আর সেই মোহহীন চিন্তাটা ওর নিজেকে ঘিরেও। এটা আত্মচিন্তা থেকেই উদ্ভূত।

কিন্তু নিছক নিরুচ্ছ্বাস নয়, এজন্যে একটি আশ্চর্য বিষণ্ণতা, ঘোর সন্ধ্যার অন্ধকারে চেয়ে থাকা একটা পাখির মতোই ওর বুকে বিরাজ করে। তবে, সে বিষণ্ণতাকে ও প্রকাশ করে না। বরং একটা নিঃশব্দ শ্লেষের হাসি দিয়ে ঢেকে রাখে।

আর এই তত্ত্বের মধ্যে আশু প্রয়োজনীয় ছিল চাকরি।

কিন্তু এ যুগটা চোরা, যে না শোনে ধর্মের কাহিনী। নইলে, শুভেন্দুর কপালে কেন শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জরীপ বিভাগের কেরানীগিরি জুটবে। মনের মতো নয় বলে, বেসরকারি ছোটখাটো অনেক চাকরি সে এড়িয়ে গিয়েছিল। আর যেটা সব থেকে অমনোমতো, সেটার বেলায় জেদ ধরে বসেছিলেন দাদারা। বিধবা মা তাকিয়েছিলেন অসহায়ভাবে। অতএব শেষ পর্যন্ত হুগলি জেলার এক মহকুমা শহরের অফিসে।

সেখানে প্রবাসী কর্মচারীদের একটা মেস জাতীয় আস্তানা ছিল। সেখানে মানুষ কেমন করে থাকে, সেটা শুভেন্দু ধীরে ধীরে জেনেছিল। পুরানো সেকালের অন্ধকার ঘর, কিংবা ডাইনীবুড়ির মতো সেই ব্রাহ্মণীর রান্নাতেও আপত্তি ছিল না ওর। লোকগুলি যা খায়, সব সময়ে প্রায় তারই ঢেকুর তোলে। শুধু অফিস, বড়বাবু, সার্ভেয়ার, ওভারসিয়ার এই তাদের প্রসঙ্গ। মাঝে মধ্যে তাস দাবা বসে। তার ফাঁকেও ওই এক কথা। 'তা বলে ওভারসিয়ারবাবু যে রকম করে উঠলেন। আরে বাবা সাত নম্বর ফাইল কি আর আমরা···ওঃ, এই যে বাবা, তুমি বাবা বড় ঘুঘু হে পাইন, এইবার কিস্তিমাৎ বোড়েটা বুঝি দেখতে পাওনি?'

জানা না থাকলেই কথাগুলি ঘুলিয়ে যাবার ভয়। কিংবা ইস্‌কাবনের রাজা বিবির লড়াইয়ে যখন ডায়মণ্ডের টেক্কার আলো ছড়িয়ে, বাতাস গরম করে তুলত, তখনো হয়তো শোনা যেত, 'ভাগ্যিস্ সার্ভেয়ার সাহেবের কানে যায় নি কথাটা যে কালির বোতলসুদ্ধ উপুড় হয়ে পড়েছে সেই পরচাটার ওপরে।'…

দু' একজন অবশ্য সন্ধ্যার পরেই বেরিয়ে যেত। গোপন করার তাগিদও তেমন ছিল না। শহরেরই কোন্ এক এঁদো নোংরা গলিতে তারা যেত। সেখানে দেহপণ্যারা ছিল।

অধিকাংশক্ষেত্রে এ সব জীবেরা কারুর সঙ্গে মেলামেশা করে না। অনেক পরিহার করে চলে বলেই বোধ হয়, আপনা থেকেই অসামাজিক হয়ে ওঠে। তবু একজন ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল। শুভেন্দু এগোতে দেয় নি। কারণ ও বিষয়ে তার কৌতূহল আকর্ষণ, কিছুই ছিল না।

তবে এ লোকগুলোকে ততো অশ্লীল মনে হতো না, যতো মনে হত, সপ্তাহান্তে যে-সব বিবাহিতেরা ছুটির রাত কাটিয়ে আসত বাড়িতে। শনি-রবির রাতের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হত, আর বুড়ো ছোকরা সবাই উপভোগ করত। বেশ্যার গল্প অসামাজিক। বউয়ের গল্প নয়। তা সে যতো অশ্লীলই হোক।

এদের কাহিনীরও কোনো আকর্ষণ ছিল না শুভেন্দুর। ফলে সে ছিল একলা।

শনিবারের দুপুর থেকেই প্রায় মেস ফাঁকা। সবাই যে যার বাড়ি চলে যেত। শুভেন্দু যেত কলকাতায়। ছুটি পাওয়া মাত্রই ছুটত। সপ্তাহে তবু দেড়দিন কলকাতাকে পাওয়া যেত, সেটাই যা ভরসা। সোমবার ভোরবেলাই বেরিয়ে পড়ত আবার। আর সেটা একরকম অভ্যাস হয়ে আসছিল। তারপরেই হুকুম এল জরীপের কাজে যেতে হবে মফস্বলে।

এই তো মফস্বল। আবার মফস্বল কিসের?

শুভেন্দু শুনল, এটা তো সদর। মফস্বল শহর। এবার কাজের জন্য বাইরে যেতে হবে। মানে গ্রামে যেতে হবে এবার। স্বয়ং জেলা সার্ভেয়ার ওভারসিয়ারের সঙ্গে বসে একটা পার্টির লিস্ট করে ফেললেন। আর লিস্টের প্রথম দু' তিনজনের মধ্যেই শুভেন্দু।

শুভেন্দু একবার, শেষবারের জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে ভেবেছিল, রিজাইন দেবে কি না। তবু তার আগে একবার সার্ভেয়ারের কাছে আর্জি নিয়ে গিয়েছিল। সার্ভেয়ার চ্যাটার্জি শুভেন্দুর কাঁধে দুটি স্নেহের চাপড় মেরে বলেছিলেন, আরে

ইয়ংম্যান, তুমি এসব কী বলছ। কোনো ভয় নেই। আচ্ছা, অল রাইট, তুমি একেবারে শেষ লটে, আমার সঙ্গে যাবে। বুঝতে পারছি, তোমার অসুবিধে। কথনো গ্রামে যাও-টাওনি। তোমাকে আমি আমার হেফাজতে রেখে দেব। তোমাদের মতো দু-চারজন না হলে আমরাই বা থাকব কেমন করে ?

প্রৌঢ় চ্যাটার্জি সরল না চালাক, কিছু বুঝতে পারেনি শুভেন্দু। কিন্তু আপত্তি সে করতে পারেনি। শুধু তাই নয়। ওঁর দুটি ছোট ছোট চাপড়ের যে অনেক দাম, সেটা বোঝা গিয়েছিল কর্মচারীদের হাসি আর বিদ্রূপে।

কিন্তু স্টেশনে নেমেই শুভেন্দুর মন ভেঙে গেল। একটিমাত্র প্ল্যাটফরম। অবশ্য, আপ এবং ডাউনের একটি-ই লাইন। প্ল্যাটফরম আর কটা থাকবে। কিন্তু তাও ইঁট পাতা। ফাঁকে ফাঁকে ঘাস গজিয়েছে প্রচুর। ইঁটগুলিতে শ্যাওলা পড়েছে। ছোটখাটো গর্তও হয়েছে এখানে সেখানে। একটা কুকুর আর গুটি দুই গরু শুয়ে রয়েছে। শেড একটি আছে। তার তলায় গুটি তিন চার কালো কালো নেংটিপরা মানুষ রয়েছে শুয়ে বসে। যেন ওরা যাত্রী নয়। ওটাই থাকবার আস্তানা।

আজ স্বয়ং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তাঁর কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসেছেন সার্ভেয়ারের রিসেপশনে। এর আগে, গোটা একটা অফিস এসে গেছে। আর সঙ্গে পুরোপুরি একটা মেস। ঠাকুর চাকর, হাঁড়িকুড়ি ডেয়ো-ঢাকনা। শেষ দলে শুভেন্দুকে নিয়ে দু'জন কেরানী, ওভারসিয়ার আর সার্ভেয়ার।

জনাকয়েক কৃষকশ্রেণীর লোক এসে শুভেন্দুদের ব্যাগ বিছানাপত্র নিয়ে চলে গেল। অভ্যর্থনায় যারা এসেছে, তাদের কাউকে দেখে শুভেন্দুর মনে হল না যে, দুটি কথা বলা যাবে। ভাবভঙ্গিও অদ্ভুত। আদবকায়দা মোটেই ভাল লাগল না। যেন সরকারি কেরানী কর্মচারী কেউ কোনোদিন দেখেনি। হাতজোড় করে, হেসে বিগলিত হয়ে, আসুন আসুন করছে। যেমন জামা-কাপড, তেমনি হাত পায়ের ছিরি।

হাত কাটা ফতুয়া পরা, ঢ্যাঙা রোগা মধ্যবয়স্ক লোকটাই লাফালাফি করছে বেশী। ফতুয়ার বোতাম নেই। তেলচিটে পৈতা দেখা যাচ্ছে। কপালে মাটি না কি চন্দনেরই ফোঁটা একটি। টিকিতে একটি ফুল বাঁধা। মোটা ভাঙা গলায় লোকটা অনবরত যেন বরপক্ষের অভ্যর্থনা করে চলেছে, আসুন আসুন। আহা, কী কষ্ট! এই পাড়াগাঁয়ে না থাকবার সুখ, না খাবার সুখ, আর আপনার··· আহা, আসুন আসুন।

প্রেসিডেণ্ট তু'বার ধমকালেন, আঃ! গাঙ্গুলি, একটু থামো না বাপু।

লোকটা আবার গাঙ্গুলি। শুভেন্দুরই পদবী। কী বিচ্ছিরি! কিন্তু লোকটাকে কিছুতেই নিরস্ত করা যাচ্ছে না। ধমক খেয়ে একটু থামে, আবার শুরু করে।

স্টেশনের বাইরে এসে পচা ঘাস পাতার গন্ধ নাকে ঢুকল। আর তারই সঙ্গে একটা পেঁকো গন্ধ। আকাশ থেকে মেঘ বিদায় নিয়েছে। রীতিমতো হেমন্তের রোদে তুপুর ঝকমক করছে। কিন্তু রাস্তায় এখনো কাদা। চারদিক নিঝুম। দিনের বেলাতেই স্টেশনের ধারে, ঝিঁঝির চীৎকার! অথচ তিনটে চালাঘর রয়েছে রাস্তার ধারে। ওগুলি চায়ের দোকান বলা যায়। তার সঙ্গে তেলেভাজা। নোংরা চুপড়ি আর কাঠের বারকোশে কালো কালো খাবারগুলি সাজানো। মাছি ভ্যানভ্যান করছে তার ওপরে। যে তু একজন করে লোক বসে আছে দোকানে, তারাই নিশ্চয় খায় ওসব। সকলেই চুপচাপ, হলদে হলদে চোখে, নিরীহ কিন্তু কৌতূহলী দৃষ্টিতে শুভেন্দুদের দেখছে।

তিনটি গরুর গাড়ি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। শুভেন্দুদের নাকি যেতে হবে ওতেই। চ্যাটার্জি কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে একটা গাড়িতে উঠে ডাকলেন, কই হে শুভেন্দু, ইউ কাম উইথ মী।

ওরকম খাঁটি বাংলা আর, ইংরেজী মিশিয়ে কথা বলেন উনি। কয়েকদিনের মধ্যে ওঁর সঙ্গে সম্পর্কের আড়ষ্টতা একটু ভেঙে গেছে। কিন্তু ওই গরুর গাড়িতে যাবার কথা ভাবতেই পারল না শুভেন্দু। বলল, স্যার, ওতে আমি উঠতে পারব না। আমি বরং হেঁটেই যাচ্ছি।

গাঙ্গুলি হাউমাউ করে উঠল, না না না দাদা, কিছুতেই যেতে পারবেন না। এক ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে হবে। আপনি উঠে পড়ুন।

চ্যাটার্জি বললেন, অবিশ্যি হেঁটে আসতে পারলেই ভাল। কারণ গা হাত পায়ের আর কিছু থাকবে না। কিন্তু এ রোদ মাথায় করে—

—তা হোক স্যার, আমি হেঁটেই যাব।

শুভেন্দু স্থির হয়ে রইল। চ্যাটার্জি বললেন, তবে তাই এস। তোমার সঙ্গে তা হলে—

—আমি। সার, আমি যাব ওনার সঙ্গে, কোনো ভয় নেই।

এও সেই গাঙ্গুলিই তাড়াতাড়ি হেসে হেঁকে উঠল। শুভেন্দু একটু থমকে গেল শুনে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট এবং তার দলবল তখন গরুর গাড়িতে চড়ে চলতে

আরম্ভ করেছে। শুভেন্দু দেখল, সে আর গাঙ্গুলি দাঁড়িয়ে আছে। গাঙ্গুলি মাথায় একটি গামছা জড়িয়ে বলল, চলুন দাদা। আমরা সট্‌কাট্ মারব।

বলে চলতে আরম্ভ করল। শোভা দেখবার কিছু নেই। তা' ছাড়া নিচের দিকে না তাকিয়ে চললেই আছাড় খেতে হবে। আর গাঙ্গুলির শর্টকাট-এর রাস্তাও খুব সুবিধের নয় মনে হল। বনগাঁদা আর বনশিউলীর ঘন ঝোপের, অন্ধকার সুঁড়িপথ দিয়ে লোকটা প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে চলেছে। এ পথে সারা বছরেও কাদা শুকোয় কি না, কে জানে। শুভেন্দুর পা চুলকোতে আরম্ভ করেছে। বিছুটি হয়তো আছে। তবে চলন্ত মশারাও যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গেই গাঙ্গুলি চীৎকার করে এই গ্রামের পরিচয় দিয়ে চলেছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ, পণ্ডিত, বড়লোক, জমিদার, দেব-দেউল, রথ দোল, এই রকম টুকরো টুকরো শব্দ কানে যাচ্ছিল শুভেন্দুর। আর ভাবছিল চ্যাটার্জির সঙ্গে গরুর গাড়িই বোধহয় ভাল ছিল।

এক সময়ে একটু ফাঁকা জায়গায় আসা গেল। গ্রামেরই অভ্যন্তর বোধহয়। জঙ্গল আর বড় বড় ভাঙা পোড়ো বাড়ি, জীর্ণ মন্দিরগুলি দেখে, শুভেন্দুর এক সময়ে মনে হল, অতীত ইতিহাসের কোনো একটা পরিত্যক্ত নগরে যেন সে এসেছে। যেন ভয়াবহ কোনো দুর্যোগে, একদিনেই এই নগরের চলমান মুখর জীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভূমিকম্পে কিংবা দুর্ধর্ষ কোনো শত্রুদের আক্রমণে যেন সব ধ্বংস করে, লুপ্ত করে দিয়েছিল। এবং তারপর থেকে, জঙ্গল গজিয়েছে। মানুষ নেই। পাখিরাও যেন আচমকা ভীত স্বরে কিছু একটা জিজ্ঞাসায় ডেকে উঠছে। শুভেন্দু ভয়ে ভয়ে আশেপাশে তাকাল। নিশ্চয়ই আশেপাশে—।

গাঙ্গুলির গ্রাম-গৌরব গাথায় বাধা দিয়ে বলেই ফেলল শুভেন্দু, এখানে সাপটাপ—

—তা আছে। খুব আছে। তবে ভয় নেই।

—ও! তেমন বিষাক্ত—

—তা হাঁ, খুব বিষাক্ত সাপই আছে। গ্রাম তো নয় দাদা, ইঁটের পাঁজা। কত বড় বড় বাড়ি আর মন্দির ছিল সব। আর ইঁটের পাঁজায় যাঁরা থাকতে পারেন, তাঁরাই আছেন। গোখরোই বেশী। বোড়া চিতিও বেশ আছে। তবে ভয়ের কিছু নেই।

—সে রকম উপদ্রব বুঝি—

—বিশেষ কিছু নয়। তবে এই সেদিনে তো পাঁচটা বেড়ালছানা খেয়ে

ফেলেছিল একটা কালী গোখরোতে। তা হজম করতে পারলে তো। নড়তেই পারেনি। ধরে নিয়ে গেল ওঝা এসে। ভয় কিছু নেই।

যাক্, তবু বেড়ালছানার ওপর দিয়ে গেছে। শুভেন্দু বলল, যাই হোক মানুষকে তো আর—

—তা, সেও এই তো মাসখানেক আগে একটা মানুষ খেল।

মানে? লোকটা কি তার সঙ্গে ইয়ারকি করছে নাকি? গাঙ্গুলির মুখের দিকে তাকাল সে। কিন্তু গাঙ্গুলি নির্বিকার। আপন মনে বলেই চলেছে। শুভেন্দু রুষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল মানুষকেও কামড়ায় তা হলে?

—তা দাদা প্রতি বছরেই এক আধটা খায়। সে আর কী করা যাবে। তবে—

—ভয়ের কিছু নেই বলছেন, না?

শুভেন্দু প্রায় রেগে উঠেই বলল, কেন বলছেন?

গাঙ্গুলি ফাঁক ফাঁক রোগা দাঁতে হেসে বলল, এই নিজেদের দেখে বলছি, বুঝলেন না? এই গাঁয়েই দাদা বেঁচে তো আছি। ভয়ের কী আছে। ওনারা কোথায় নেই, বলুন!

শুভেন্দু বলল, কলকাতায় নেই।

নিশ্চিত হয়ে বলল গাঙ্গুলি, অ! কলকাতায় তো শুনেছি, মাটির তলায় খালি ময়লা যাবার নল আছে। কোথায় থাকবে বলুন। থাকবার একখানি আশ্রয় চাই তো। বাসস্থান বলে কথা।

এর পরে আর লোকটাকে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রবৃত্তি হল না শুভেন্দুর। কেন সে মুখ খুলেছিল, সেটাই আশ্চর্য? সে চুপচাপ চলতে লাগল।

শেষ অবধি, একটি মস্ত বড় পুরনো বাড়ির কাছাকাছি এসে গাঙ্গুলির গতি মন্থর হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সামনের ঝোপটা কেঁপে উঠল। যেন দুলে উঠল জোরে। তারপরেই যেন কিছু সড়সড় করে চলে গেল ভিতর দিয়ে।

শুভেন্দুর বুকটা ধক্ করে উঠল। সে দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে। গাঙ্গুলি হেঁকে উঠল, কে রে?

বলে সে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল বুক সমান ঝোপের মধ্যে! বলল, অ!

শুভেন্দুর দিকে ফিরে নিস্পৃহ গলায় বলল, মানুষ। আসুন, এই বাড়ি।

কিন্তু বুকের থরথরানিটা তখনো পুরো থামেনি। মানুষ শুনেও হঠাৎ চমকানির তরঙ্গটা সহসা থামল না। আর মানুষই বা ওখানে করছিল কী? ওই বনশিউলীর রাক্ষুসী বনে।

শুভেন্দু ভাঙা নোনা ইটের পাঁজার ওপর দিয়ে এগোচ্ছিল। গাঙ্গুলি ডেকে বলল উঁহু ওদিকে নয়। ওটা অন্দরমহল। এদিক দিয়ে আসুন। আপনাদের ব্যবস্থা বারমহলের দোতলায় হয়েছে।

কি রকম অন্দরমহল, কিছু বুঝল না শুভেন্দু। প্রায় ভেঙে পড়া বাঁড়ি। দরজা জানলা একটিও আস্ত নেই। তবু ভিতরের অন্ধকার ঘোচেনি। গজানো অশ্বত্থের ডাল জড়িয়ে জংলি লতা অন্দর-মহলে গিয়ে ঢুকেছে। মস্ত বড় একটা পিটুলী গাছের তলা দিয়ে বাড়িটাকে প্রায় প্রদক্ষিণ করে বাঁক নিল গাঙ্গুলি। শুভেন্দু না জিজ্ঞেস করে পারল না, কার বাড়ি এটা?

—আমার ভগ্নীপতির। মানে উনি মারা গেছেন। একলা মেয়েছেলে, আমিই দেখাশোনা করি। কিন্তু দেখুন, হুই যে আসছে আমীনবাবুদের গরুর গাড়ি। আমরা কত আগে চলে এসেছি।

শুভেন্দু দেখল, সত্যি সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, গরুর গাড়িগুলি এখনো অনেক দূরে। আধমাইল তো বটেই। এখন গাঙ্গুলির 'শর্টকাট' কিংবা গরুর চেয়ে তাদের পায়ের জোর বেশী, সেটা বিচার্য।

দোতলা থেকে কয়েকজন হাঁক ডাক করে উঠল।—আরে শুভেন্দুবাবু যে, এসে পড়েছেন? সার্ভেয়ার সাহেব কোথায়?

গাঙ্গুলিই জবাব দিলেন, অই আসছেন গরুর গাড়িতে করে।

দোতলার চেহারা দেখে শুভেন্দুর ভয় বাড়ল বৈ কমল না। গোটা বাড়িটা যেভাবে ফেটেছে, বেঁকেছে, তাতে সাপের ছোবল না হোক, যে কোন মুহূর্তেই হুড়মুড় করে পড়ে যেতে পারে। অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে দেখল, তার মধ্যেই অফিস সাজানো হয়েছে। ঘরে ঘরে সারি সারি বিছানা পাতা হয়ে গেছে। দড়ি টাঙিয়ে জামা কাপড় লুঙ্গি গামছা মেলা হয়ে গেছে।

ঘরগুলির পলেস্তারা খসেছে অনেকদিন। উইয়ে খাওয়া কড়ি বরগাগুলিতে নিদেন আলকাতরার পোঁচড়া পড়েনি বহুকাল। ঘরের মধ্যেই ঝিঁঝি ডাকছে গলা ফাটিয়ে। আশেপাশে দু'তিনটে পিটুলি আম গাছ দাঁড়িয়ে আছে ঘর অন্ধকার করে। নোনা ইট আর বুনো জঙ্গলের একটা তীব্র গন্ধ সবখানে।

কিছু না হোক, মাস দুয়েক অন্তত থাকতে হবে এখানে। এর নাম চাকরি। এই শ্মশানের নিস্তব্ধতা, আর এই পোড়ো বাড়িকেই অস্থায়ী বাসস্থান বলে মেনে নিতে হবে। চারদিক খাঁ-খাঁ করা একটা আসল রূপ এতদিনে দেখল শুভেন্দু।

সত্যি, যেন চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। আকাশ গাছ রোদ, সবই যেন আড়ষ্ট, স্থবির আর শ্বাসরুদ্ধ।

অবিশ্যি, চ্যাটার্জি সাহেবের ঘরের পাশে, পূর্ব-দক্ষিণ খোলা ছোট একটি ঘরে, ওভারসিয়ার মৈত্রবাবুর সঙ্গেই তার থাকবার জায়গা দেওয়া হয়েছে। আর তার জন্যে অনেকেই টিপ্পনীও কাটল, দলের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে ছেলেমানুষ। একটু আগলে রাখার ব্যবস্থা না করলে কখন ভয়-টয় পাবেন।

জানা গেল, স্নান খাওয়ার ব্যবস্থা নিচেই। পুকুরের জলই ভরসা। টিউবওয়েলের সান্ত্বনা যদিও আছে।

কাজ আরম্ভ হল পরদিন থেকেই। যে দুজন কেরানীর সব সময় অফিসে থাকবার ব্যবস্থা হল, তার মধ্যে এক প্রৌঢ় যতীনবাবু আর শুভেন্দু। বাকী সকলেই সকালবেলা বেরিয়ে যান জরিপ করতে। বেলা একটা নাগাদ আসেন। তারপরে খাওয়া-দাওয়া সেরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলে। তখনই যত গ্রামের লোকের আনাগোনা। কেউ প্রয়োজনে কেউ অপ্রয়োজনে। কেউ সার্ভেয়ারের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে। কেউ ওভারসিয়ারের সঙ্গে ফিসফিস করে। কেরানীদের কাছেও ঘুর ঘুর করে অনেকে। আর জরিপ নিয়ে তর্কবিতর্ক, ঝগড়া বিবাদ অন্যায় অবিচারের গোলমাল তো আছেই।

সে আর কতটুকু সময়। সময় যেন এখানে তরঙ্গহীন শুদ্ধ অশেষ সমুদ্রের মতো চুপ করে পড়ে থাকে। ক্বচিৎ কখনো অস্পষ্ট, বিচ্ছিন্ন মানুষ কিংবা গরু ছাগলের প্রায় বিস্ময়কর শব্দের মতো স্বর শোনা যায়। এখানকার মৌনতায় তাতে বিশেষ তরঙ্গ তোলে না।

দুপুর পর্যন্ত কোনো কাজই থাকে না। শুভেন্দু পা টিপে টিপে বেরিয়ে একটু ওদিকে এদিকে ঘোরে। প্রায় নির্বাসিত। কোথায় বা যাবে। বনশিউলী বাঁশঝাড় আর আসশেওড়া বাবলা জঙ্গলে ঘেরা জেলখানার মতো। তা ছাড়া ঝোপ দুলে ওঠা সেই প্রথম কাঁপুনিটা যেন এখনো তার বুকের সীমায় রিনরিন করে।

কলকাতার জন্য মনটা টাটায়। তেমন একটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে না। কারণ, ঢালুতে নেমে যাওয়া একটা অপ্রতিরোধ্য অনিচ্ছাকৃত গতিই জীবন। আর সে গতিপথও পরিচিত, সীমাবদ্ধ। তবু, এই অবসরটুকুই যদি, কফি হাউসে, কোনো চেনা রেস্তোরাঁয়, পার্কে, ফুটপাতে, কোনো একটা অন্ধকার গলিতে বন্ধুর ছোট্ট

ঘরেও কাটানো যেত, দিনের চলাটাও অনুভব করা যেত। এখানে সেটাও বদ্ধ জলাশয়ের মতো।

কিন্তু আবার সেই কাঁপুনিটা লাগল তার।

বেলা দশটা নাগাদ পায়ে পায়ে এগিয়ে দক্ষিণের বাঁশঝাড় পেরিয়ে, প্রায় একটা নতুন জায়গাই আবিষ্কার করেছিল শুভেন্দু। চারদিকে পুরনো ইঁটের পাঁজা, আর মাঝখানে বেশ খানিকটা খোলা চত্বর। কতগুলি বড বড চৌবাচ্চার মতো কী যেন রয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে সেই লতাপাতা ঢাকা চৌবাচ্চাগুলি কিসের সে জানে না। গাঁথনিগুলি বেশ চওড়া। এখনো মোটামুটি শক্ত মনে হয়। আস্তে লতাপাতা সরিয়ে, সবে সে উঁকি দিয়েছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পিছনে ধুপ করে একটা শব্দ হল।

শুভেন্দু চমকে উঠে পিছন ফিরতেই সবচেয়ে কাছের ঝোপটা দুলে উঠেই থমকে রইল। প্রায় এক মিনিট শুভেন্দু স্তব্ধ নিশ্চল। মনে হল, সে যেন একটা কী দেখল। গরু মানুষ না বাঘ, কিছু ঠাহর হল না। কালো, না ডোরাকাটা কিছু কিংবা ছায়া, কিছুই বুঝতে পারল না। সাপ কী? মস্ত বড় সাপ হতে পারে। কিন্তু শব্দটা?

আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলে শুভেন্দু ঝোপটার দিকে আর একবার তাকাল। মনে হল, ঝোপটা এখনো একটু একটু নড়ছে। গাঙ্গুলি তো মানুষ দেখেছিল। শুভেন্দু পায়ে পায়ে ঝোপটার কাছে গেল। আস্তে আস্তে হাত দিয়ে একটু ফাঁক করে, উঁকি দিল। অন্ধকার। বুনো লতার তীব্র গন্ধ। মশারা গর্জাচ্ছে যেন অসময়ে ঘুম ভেঙে।

সরে আসবার আগেই শুকনো পাতার ওপরে পায়ের শব্দ শুনতে পেল পিছনে। ফিরল শুভেন্দু। কেউ নেই। উত্তর দিকের আসশেওড়া জঙ্গল দিয়ে কেউ যাচ্ছে হয়তো। তবু মানুষ তো। আর শুভেন্দুকে ওদিকেই যেতে হবে। সে তাড়াতাড়ি চৌবাচ্চাগুলি পার হয়ে আসতে না আসতেই শব্দটা মিলিয়ে গেল। আসশেওড়া বনে কেউ নেই। রোদে চিকচিক করছে জঙ্গল। আর ফড়িং উড়ছে।

কিন্তু আবার পায়ের শব্দ। এই জমির কয়েক ধাপ নিচেই, বাঁশঝাড়তলায়, এবার পায়ের শব্দ দ্রুত। শুভেন্দুও পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। শব্দ মিলিয়ে গেল। বাঁশঝাড় একটু দুলে উঠে যেন চাপা কর্‌কর্‌ শব্দে আড়মোড়া ভাঙল।

ভুল শুনল নাকি? শুভেন্দুর বুকের ধক্‌ধকানিটা থামল না। সে দ্রুত পায়ে

একেবারে অফিস বাড়ির সামনে এসে পড়ল। এসেও থমকে দাঁড়াতে হল। দেখল, ভাঙা পাঁচিলের পাশে, যগ্যিডুমুরের ছায়ায় গাঙ্গুলি হাত নেড়ে চুপিচুপি গলায় কী যেন বলছে যতীনবাবুকে। বিপত্নীক ভদ্রলোক যতীন রায় বারোমাস মেসেই থাকেন।

শুভেন্দুকে দেখা মাত্র গাঙ্গুলি থেমে গেল। যতীনবাবু তার ঘোলা ঘোলা চোখে দেখলেন শুভেন্দুকে। খালি গায়ে লুঙ্গী পরে আছেন ভদ্রলোক। নতুন-চালের থকথকে মাড়ের মতো গদগদে শিথিল শরীর। পুষ্ট ভুঁড়ি বেষ্টন করে পৈতেটি ঝোলে। মেসেরই বাসিন্দা এবং সেখানেও এভাবেই থাকেন প্রায়। বিপত্নীক লোক। বাড়িতে বিশেষ যান না। একটু এদিক ওদিক করার ঝোঁক আছে। খুব নয়। মোদকপ্রিয় মানুষ। মোদকের একটি বড় গুলি রোজ চাই।

এদের সম্পর্কে শুভেন্দুর কোনো কৌতূহলই হল না। তার বুকের মধ্যে তখনো সেই চমকের তরঙ্গ। একটি বিস্মিত অস্বস্তি।

গাঙ্গুলি বলল, বেড়াচ্ছেন? বেড়ান। পূর্বদিকে যদি যান, তাহলে শ্যাম রায়ের মন্দিরটাও দেখে আসবেন।

শুভেন্দু বলল, তাই নাকি? যাব এক সময়ে। আচ্ছা, ওদিকে বাঁশমোড় পেরিয়ে একজায়গায় চৌবাচ্চার মতো দেখলাম, ওগুলো কী?

গাঙ্গুলি বলল, অ, নীলকুটির পোড়োতে গেছলেন বুঝি? ওখেনে নীলকুটি ছিল। ও হচ্ছে নীল পচাবার চৌবাচ্চা।

শুভেন্দু বলল, ও।

কিন্তু সে তার ভয় ভয় অস্বস্তির কথাটা বলল না। হাসাহাসি করবে সবাই। আর তাই তো স্বাভাবিক। নইলে, এ বয়সে এখন ভূতে বিশ্বাস করতে হয়। দোতলায় এসে নিজের টেবিলে বসে হাসি পেল শুভেন্দুর। কলকাতার বন্ধু-বান্ধবীরা শুনলে খুব একচোট হাসবে। আর কলকাতার কথা মনে পড়তেই সে একেবারে বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

কিন্তু পরদিনের ব্যাপারটা রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল। যতীনবাবুরা অফিস ঘরেই বসেছিলেন। বেলা প্রায় এগারোটা। শুভেন্দু শোবার ঘরে বসে কলকাতায় একটা চিঠি লিখছিল। সহসা পিছনে একটা শব্দ শুনে সে ফিরে তাকাল। একটা ছায়া যেন সরে গেল চকিতে। শুভেন্দু উঠে দ্রুত দরজার কাছে এল। মনে হল, দালানের একটা দরজার পাশে ছায়াটা সরে গেল।

ঠিক দেখল, না কি ? শুভেন্দু দালান দিয়ে প্রায় ছুটে সেই দরজার কাছে গেল। দেখল সিঁড়ি। ছাদে ওঠার সিঁড়ি। পুরনো ভাঙা কাঠের আসবাবের অবশিষ্ট একদিকে জড়ো করা রয়েছে। শুভেন্দু উঠে গেল। দেখল, ছাদের দরজাটা খোলাই। ছাদে উঠে দেখল, একটি পাখিও নেই সেখানে। বোধ হয় বিঘে প্রমাণ ছাদ। শ্যাওলায় কালো। ফাটাফুটির সর্পিল দাগ। বোধহয় বিশ বছরের মধ্যেও কেউ পা দেয়নি। এই সিঁড়ি দরজার ঠিক উল্টোদিকে আর একটি দরজা। দরজাটি বন্ধ।

সত্যি কি কোনো ছায়া দেখল শুভেন্দু। না কি তার মন এ দেখতে আর শুনতে আরম্ভ করেছে। হয়তো এই গ্রাম্য নিঝুমতা আর পুরনো বাড়ি তার অবচেতনে একটা খেলা জুড়েছে।

শুভেন্দু আস্তে আস্তে ছাদে একটু পায়চারি করল। বুক সমান আলসের ধারে গিয়ে উঁকি দিল। দেখল বাড়ির সামনের দিকটা। কিন্তু আবার সেই গাঙ্গুলি আর যতীনবাবু। একটু দূরেই, একটা পিটুলী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে, গাঙ্গুলি তর্জনী দিয়ে আশেপাশে দেখাচ্ছে। আর ফিসফিস করে কী যেন বলছে। আর যতীনবাবু ঘাড় নাড়ছেন আস্তে আস্তে। কিন্তু ঘোলা ঘোলা চোখে তাকিয়ে আছেন গাঙ্গুলির দিকে।

হয়তো গাঙ্গুলি এ বাড়ির কোনো কাহিনী জুড়েছে, আর অতীতের গৌরব দেখাচ্ছে। কিন্তু শুভেন্দুর কী হচ্ছে এটা ? আবার মনে মনে হাসল শুভেন্দু। তার অন্তঃস্রোতের একমুখীনতায় কোথাও কোনো আবেগ উচ্ছ্বাস উত্তেজনা কৌতূহল আর প্রশ্ন ছিল না। যারা মিথ্যা আশার ব্যাধিতে ভোগে, তাদের মতো কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে রেস খেলার উত্তেজনা তার নেই। বন্ধুরা তাই বলেছে, অকালবৃদ্ধ। আর বান্ধবীরা বলেছে, মন বলে পদার্থটা নাকি নেই। তাতে আক্ষেপ ছিল না। ওসব বাড়তি বস্তুগুলি যতো কম থাকে ততই ভালো। নিস্তরঙ্গতাই বাস্তব।

কিন্তু এ বাতাসের উপদ্রব কোথা থেকে এল। যে-বাতাস তার নিস্তরঙ্গতাকে অস্থির করছে। আর এই নিস্তরঙ্গতারই দেশে। শহরের জীবনে মেকী তরঙ্গ তোলার কোনো উপকরণ বা ঘটনা যেখানে নেই।

যা অদৃশ্য এবং যতক্ষণ অজানা। ততক্ষণ হয়তো মুখোশের কৌতূহল থাকে এই জীবনের মতোই। শ্মশানের মুখোশ খোলাই সব ধরা পড়ে যায়।

তবে ছাদটা তার খারাপ লাগল না। আর একটু ঘুরে সে নেমে এল।

চিঠিটা শেষ করে, দক্ষিণের জানলায় দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই সরে এল আবার। মনে থাকে না, ওখানে একটা পুকুর আছে। ভাঙা ঘাটে অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে একটি মেয়ে। কিংবা বউ। ঘোমটা নেই। আদুড় গা। বসে বসে বিনুনী খুলছে মনে হল। আর এদিকেই যেন তাকিয়েছিল। শুভেন্দুকে দেখা মাত্র মুখ ফিরিয়ে নিল। গ্রামের মানুষের একটা স্বভাব-কৌতূহল নিশ্চয়ই। জরিপের বিদেশী লোকদের বাসস্থান দেখছে।

দিন দুয়েক পরে, গ্রামবাসীদের নানান ঝগড়ার গোলমালে কাজ বন্ধ করে দিলেন চ্যাটার্জি। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য, প্রত্যহ কথা কাটাকাটি, মারামারি হওয়ার উপক্রম। জরিপের অফিস যেন বাদ-প্রতিবাদের সালিশীর দপ্তর হয়ে উঠেছে। জানালেন, অভিযোগ থাকলে আপনারা লিখিতভাবে পেশ করুন। এভাবে অফিস চালানো যায় না।

সত্যি সত্যি কাজ বন্ধ হওয়ায়, বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে, শোবার ঘরে একবার থমকে দাঁড়াল শুভেন্দু। ভাবল, তার চেয়ে একটু ছাদে যাওয়া যাক। ফিরতে তা নইলে সন্ধে হয়ে যাবে।

সে ছাদে এল। ঈষৎ শীতার্ত বাতাস বইছে। বাতাসটা মন্দ লাগল না। চারপাশে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগল সে। বেলা বেশ ছোট হয়ে এসেছে। রোদ পড়ন্ত। গ্রামের পশ্চিমাংশ কালো দেখাচ্ছে। পূর্বাংশে রোদ চিকচিক করছে।

হঠাৎ দরজার শব্দ শুনে ফিরে তাকাল শুভেন্দু। এবং আবার চকিত ছায়ার অন্তর্ধান। আর এবার ছাদের সেই বন্ধ দরজাটাতে সে দেখল যেন। দেখল, সেদিনের বন্ধ দরজাটার একটা পাল্লা খোলা সেখানেই ছায়াটা দেখা গেল।

এক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রহিল শুভেন্দু। এবারও কী ভুল? কিন্তু কী হতে পারে? শেষটায় কী একটা উৎকট ভয় তাকে গ্রাস করল?

শুভেন্দু আস্তে আস্তে দরজাটার কাছে এল। আস্তে আস্তে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, আর একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গিয়েছে। ছাদের দিকে একবার দেখে দরজা খুলে নতুন সিঁড়িতে পা দিল শুভেন্দু। সিঁড়ি দেখলেই বোঝা যায় একেবারে অব্যবহৃত নয়। ওপাশের সিঁড়ির মতো অব্যবহার্য, ধুলো আর মাকড়সার জালে জড়ানো নয়। নীচের দিকে আলোও দেখা যাচ্ছে। যদিও মানুষের সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

পা টিপে টিপে একটা একটা করে সিঁড়ি নামল সে। প্রায় যেন ঘোরানো সিঁড়ি। কয়েক ধাপ পরেই বেঁকে গেছে।

একটা ধাপে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শুভেন্দু। চমকে গিয়েছিল, তাই ধাপটায় পা দিয়ে, সে নিজেই শব্দ করে ফেলল। আর সেই মুহূর্তেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এলি ? আয়, শোন।

শুভেন্দুর পা দুটি যেন ফাঁদের বাঁধনে আটকা পড়ে গেল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার। আর বিমূঢ়, প্রায় ভীত চোখে দেখল, দু হাত দূরেই দরজা খোলা একটি ঘর। ঘরের সামনেই মান্ধাতা আমলের একটি পুরনো খাট। ময়লা ছেঁড়া বিছানা। দেখলেই মনে হয় ছারপোকারা বংশপরম্পরা ওখানে সাম্রাজ্য বিস্তার করে আছে। আর সেই বিছানার ওপর একজন মহিলা কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন এইদিকে ফিরে। তাঁর শীর্ণ শরীর কোমর অবধি খোলা। পোড়া তামার মতো শরীর। রুক্ষ জট পাকানো কাঁচা পাকা চুল। আর চোখের দৃষ্টি শুভেন্দুর দিকেই স্থির নিবদ্ধ যেন।

তিনি আবার বলে উঠলেন, আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

শুভেন্দুকে ডাকছেন উনি ? সে তার নিজের ডাইনে বাঁয়ে দেখল। কেউ নেই। থাকা সম্ভবও নয়। কারণ দোতলার এই শেষ ধাপ।

তারপরে এক তলায় নেমে গিয়েছে সিঁড়ি। কিন্তু পোড়া তামার মতো ওই বিধবা মহিলা কি শুভেন্দুকে ডাকছেন !

মহিলা এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলেন, ওরে, আর রাগ করে থাকিসনে বাবা, আর আমাকে জ্বালাসনে। আয়, কাছে আয়।

শুভেন্দুর ঠোঁট নড়ল। কিন্তু কথা বলতে সাহস হল না। সে আস্তে আস্তে পিছন ফিরবে কিনা, চিন্তা করল। মহিলা বালিশের তলায় হাত দিলেন। বললেন, কই, চশমাটা কোথায়। এগিয়ে এসে দেখে দে একটু। কানা মাকে একটু দয়া কর মদন। ও মদন !

মদন ! শুভেন্দুকে নয়। আর মহিলা চোখে দেখতে পান না ? একটু যেন স্বস্তি পেল শুভেন্দু। তবু তার মনে হল, আরো যেন জোড়া জোড়া উদ্দীপ্ত কৌতূহলী চোখ তাকে নিরীক্ষণ করছে অদৃশ্য থেকে। মনে হল, অনেক অশরীরীরা তাকে ঘিরে আছে চারদিক থেকে। আস্তে আস্তে পিছন ফেরাই সাব্যস্ত করল সে।

সেই মুহূর্তেই মহিলা আবার বললেন, হাঁ রে মদন, সেই গন্ধ তেলটা মেখেছিস বুঝি ? গন্ধ পাচ্ছি যেন ?

শুভেন্দুর নাকে তার নিজের চুলের গন্ধ লাগল। এটা ওর বিলাসিতা নয়, প্রয়োজনীয়। তীব্র গন্ধ সে ভালোবাসে। উনি কি শুভেন্দুর চুলেরই গন্ধ পাচ্ছেন? সে তাকিয়ে দেখল ওঁকে। অপলক চোখে ওঁর দৃষ্টি নেই, তবু জিজ্ঞাসা ফুটে বেরুচ্ছে। দরজার দিকে অনড় নিশ্চল দুটি তারা। কালো নয় অথচ ছানি পড়া ঘষাও নয় যেন। কিন্তু জবাব দেবার সাহস হল না শুভেন্দুর।

এবার উনি হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন। জল পড়তে লাগল ওঁর চোখে। বললেন, আমার সঙ্গে তোর কিসের ঝগড়া মদন, আমি তোর কী করেছি? আমি তোর মা, আমি অন্ধ, ব্যামোয় পড়ে আছি। উপায় থাকলে কি এতবড় সর্বনাশ দেখে চুপ করে থাকতাম?······তা' আমার কাছে না আসিস, না-ই এলি। তুই একবার চক্কোত্তি ঠাকুরপোকে ডেকে নিয়ে আয় আমার কাছে। তাকে আমি সব বলব। আমার ভাই হয়ে যে তোর সম্পত্তি ফাঁকি দিতে চায়, তাকে আমি তোর মামা বলব না। নিজের ভাই বলেও তাকে আমি খাতির করব না। আমার কাছে আবার ও আসুক কোনো কাগজপত্তর নিয়ে। সই দেয়া দূরের কথা, আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব। অমনি করে ও আমার অনেক সর্বনাশ করেছে।

বলে উনি শব্দ করে হাঁপাতে লাগলেন। ভয়ের থেকে কৌতূহলই বেশী জেগে উঠেছে তখন শুভেন্দুর। যদিও তার শহুরে রুচিশীল মন এসব কথা লুকিয়ে, আর একজনের হয়ে শুনতে দ্বিধা এবং পীড়া বোধ করছে। কিন্তু সে সরে যেতে পারল না।

মহিলা আবার বললেন, যা, চক্কোত্তি ঠাকুরপোকে ডেকে নিয়ে আয়, তাকে আমি সব বলি। আর ওই লোকটার নাম কী বলছিলি। ওই জরিপের বাবু? বউ-মরা বুড়োটা? যার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চায় তোর মামা?

যতীনবাবু? যতীন রায় নাকি? কী আশ্চর্য! কিন্তু নাম বলছেন মদন। তার সঙ্গে আবার বউ-মরা বুড়োর বিয়ে কিসের? মদন নিশ্চয় পুরুষ!

উনি তখনো বলে চলেছেন, ও বুড়োটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোকে পার করতে চায়। তারপরে একদিন আমার গলা টিপে মেরে ও সব ভোগ দখল করে বসবে! ওই বুড়ো জরিপবাবুটার সঙ্গে তাই ওর দিনরাত ফুসুর ফুসুর গুজুর গুজুর চলেছে। জরিপ ফাঁকি দেবে। আরো বাস্তু জমি ওর সীমানায় ঢোকাবে। তোর বাবাকে তখনি বারণ করেছিলাম। হোক আমার ভাই, বাস্তুর কাছে ওকে তুমি কিছু দান করো না। তখন তাঁর ভাবনা হল, কে আমাদের দেখাশোনা করবে। তাই নিজের শালাকে জমি-জিরেৎ দিয়ে রেখে গেলেন। আঁটকুড়ো বউটাকে খেয়ে

নিবংশটা এখন আমাদের খাবে। শত্তুর! মায়ের পেটের ভাই হয়ে এতবড় শত্তুর। তার চেয়ে আমার প্রতিবেশী ভাল। যা, তুই ডেকে নিয়ে আয়।

ওঁর কথা শেষ হবার আগেই, নিম্নগামী সিঁড়ির বাঁকে আবার একটা ছায়া নড়ে উঠল। এবং সেই সঙ্গেই হাল্কা পায়ের শব্দ শুনতে পেল শুভেন্দু। আবার! শুভেন্দু নড়ে উঠতেই হাতের ধাক্কায় দরজায় শব্দ হল। মহিলা বলে উঠলেন, যাচ্ছিস? যা। তাড়াতাড়ি আসিস।

শুভেন্দু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু এবার তার পক্ষে কৌতূহল দমন করা অসম্ভব হয়ে উঠল। সে পা টিপে নীচের দিকে অগ্রসর হল। ছায়া নয়, মানুষ তার আশেপাশে ঘুরছে। এবং এ কোনো ভৌতিক ব্যাপার নয়। প্রথম দিন গাঙ্গুলি ঝোপে মুখ বাড়িয়ে মানুষ বলেছিল। এও সেই মানুষ।

কিন্তু কে? আর শুভেন্দুকে নিয়েই বা কেন? ভয় দেখিয়ে তাড়াবার মতলব? গোয়েন্দা কাহিনীতে এ ধরনের ঘটনা ঘটে বটে। আর একটানাও প্রায় সে পর্যায়ে এসেই দাঁড়িয়েছে।

নীচে আসতে আসতেই সব শূন্য। একটি সুদীর্ঘ দালান। ভাঙা ফাটা গর্ত তার চারদিকের মেঝের ওপরে। এবং সামনে তাকিয়ে দেখল, এ সেই অংশ যেটাকে দেখিয়ে গাঙ্গুলি বলেছিল, অন্দরমহল। বাসকের ঝাড় গরাদহীন জানালা দিয়ে ঢুকেছে। আপনি গজানো কৃষ্ণকলির জঙ্গল উঁকি দিয়েছে ঘরে। অপ্রস্ফুটিত ফুলেরা এখনো সঙ্কুচিত। সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় আছে কুঁড়িরা। ঠাণ্ডা ভেজা ভেজা, অস্পষ্ট আঁধারে একটা ভীরু চমকের অনুভূতি সর্বত্র।

কিন্তু কোথায় গেল ছায়াটা?

হঠাৎ ফিসফিস শব্দ শুনতে পেল শুভেন্দু। যেন কেউ চুপি চুপি কথা বলছে। শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল সে। তারপরে একটি ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াল। গাঙ্গুলি আর যতীনবাবু। প্রকাণ্ড একটা জরিপের নকশা মাটিতে বিছানো। গুটি-কয় পুরনো দলিল তার ওপরেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। গাঙ্গুলি কী যেন বলছে চুপি-চুপি। যতীনবাবু শুনছেন ঘোলা অপলক চোখে তাকিয়ে।

শুভেন্দুকে দেখেই গাঙ্গুলি লাফিয়ে উঠল, আরে, শুভেন্দুবাবু যে! এদিকে কোথায়?

সব যেন স্পষ্ট হয়ে গেল শুভেন্দুর কাছে। আবার সেই মুহূর্তেই সব জট্ পাকিয়ে যেতে লাগল মাথার মধ্যে। সে বলল, এই আপনাদের এদিকটা একটু দেখছিলুম।

—তা দেখুন, তা দেখুন। কী আর দেখবেন। সব ভাঙাচোরা ধসা। আর এটা বুঝলেন তো, এটা সেই অন্দরমহল।

গাঙ্গুলি হাসতে হাসতে বলল। ইঙ্গিতটা স্পষ্টই। যতীনবাবু তাকিয়েছিলেন শুভেন্দুর দিকেই। তেমনি অপলক চোখে।

গাঙ্গুলি আবার বলে উঠল, আমাদের জমি-জমার সীমানাটা একটু বুঝে নিচ্ছি যতীনবাবুর কাছ থেকে। জরিপের সময় যাতে কেউ এসে গোলমাল না করতে পারে, বুঝলেন না?

শুভেন্দু বলল, বুঝলুম।

বলেই সে দরজা দিয়ে বাইরে চলে এল। আর ভ্রূ কুঁচকে ভাবল, তবে বউ-মরা বুড়ো কি সত্যি যতীনবাবু? আর মামা ওই গাঙ্গুলি। কিন্তু মদন কে? সেই ছায়া কি? এবং সত্যি ছায়া নাকি? অবিনাশী সেই আত্মার মতো, যে এই পোড়ো ভিটার আশ্রয় ছেড়ে যেতে পারেনি। এই মাটির তৃষ্ণায় যে এখনো ঘুরে মরছে এবং সেই অতীন্দ্রিয় রোমান্টিক কাহিনীর নায়কের মতো শুভেন্দুকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঘুরিয়ে মারছে।

শুভেন্দু আবার আপন মনে একা একা হেসে উঠল। যেন তার নিস্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে অদৃশ্য বাতাস বাজী ধরে বসেছে। কিন্তু শুভেন্দু হাত বাড়াবে না। যতীনবাবু এবং গাঙ্গুলি যা খুশি তাই করতে পারে। লোকে মদ খায়, একটা বাহ্যিক উত্তেজনার জন্যে। মৃত্যুর ভয়ে বেঁচে থাকাটাকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। তারপরে একদিন সবই মিথ্যে হয়ে যাবে।

শুভেন্দু সে ছায়াটার কথা ভাবছে। সেটা কোথায় গেল? কোথায় মিলালো? কিন্তু অগ্রহায়ণের ছোট বেলা তখন মাথামুড়ি দিতে শুরু করেছে। অন্ধকার নেমে এল দ্রুত। শুভেন্দু ঘরে ফিরে গেল।

ঘরে ফিরে গেল, কিন্তু তার সমগ্র অনুভূতি জুড়ে, মস্তিষ্কের সীমা অবধি এক অভূতপূর্ব কৌতূহল ও উত্তেজনা দপদপ করছে। মধ্যরাত্রির বিছানায় সে আবিষ্কার করল, ঘুম নেই তার চোখে। দৃষ্টিহীন দুটি অপলক চোখ তার সামনে। আর একটা অস্পষ্ট ছায়া দরজার কোনের অন্ধকারে মিশে রয়েছে। আর গাঙ্গুলি··· আর যতীনবাবু···আর···।

অ্যাটেস্টেশনের কাজ শুরু হল। সকাল থেকে সন্ধে অবধি এখন অফিসে অসম্ভব ভিড়। শুভেন্দুর কাজ বেড়েছে। কিন্তু সে ভীষণ অন্যমনস্ক। তাকে একটা ছায়া নিশিদিন টানছে। সেই ছায়াটা যেন স্পষ্ট হতে হতেও হচ্ছে

না। আর এ বাড়ির জরিপের পর থেকে, জমা দেওয়া দলিলগুলি যতোই দেখছে শুভেন্দু, যতোই এদের অ্যাটেস্‌টেশনের দিন আসন্ন হয়ে উঠছে, ততোই গাঙ্গুলি আর যতীন রায়ের গুপ্ত-সভা বেড়ে চলেছে। কখনো বাঁদাড়ে, কখনো পুকুর ঘাটে। শুভেন্দু লক্ষ্য করেছে, যতীনবাবুর খেতে মন নেই। সব সময়েই একটা উত্তেজিত নিশ্চুপ অন্যমনস্কতা।

কাজের মধ্যেই অস্থিরভাবে উঠে এল শুভেন্দু। তখন বেলা পড়ন্ত। অফিসের বাইরে এসে, বাড়িটার পিছনে এল। হাঁ, শেষ পর্যন্ত একটা অ-স্থির অন্যমনস্কতায় তাকেও পেয়ে বসল। নৈঃশব্দের মধ্যে যেমন ঝিল্লিস্বর জেগে থাকে, তেমনি তার নিস্তরঙ্গতার গভীরে একটা তীব্র স্রোত যেন পাক খাচ্ছে। এও সে আবিষ্কার করল, তার ভিতরে একটা সাধারণ মানুষ জেগে উঠছে, যারা প্রত্যহের দোলায় দোলে। তাও কিনা এই স্তব্ধ স্থবির মৃত এক গ্রামের নির্বাসনে। অপ্রত্যক্ষ অস্পষ্ট একটি ছায়া, সামান্য একটি সূক্ষ্মাগ্র ছুঁচের মতো যেন বৃহৎ শরীরকে আন্দোলিত করে তুলছে।

সে অদূরের দালানের দিকে চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। অথচ এমন অনুসন্ধিৎসা শুভেন্দুর ছিল না। সে চোখ নামিয়ে আনবার আগেই, ঠিক সেই মুহূর্তেই তার বাঁ পাশে, প্রথমদিনের ঝোপটা নড়ে উঠল। শুভেন্দু এগিয়ে গেল। আরো জোরে আন্দোলিত হয়ে উঠল ঝোপ। শুভেন্দু ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। সে কিছু দেখবার আগেই, ঝোপের শেষ সীমায় পায়ের শব্দ শুনতে পেল। প্রায় মরিয়া হয়ে শুভেন্দু ছুটল সেদিকে। ঝোপের শেষ সীমায় এসে দেখল পুকুর। সেই দক্ষিণের ভাঙাঘাট পুকুরটা জানালা দিয়ে দেখা যায়। কিন্তু কেউ নেই।

শুভেন্দু উত্তেজিত অসহায়তায় চারদিকে দেখতে লাগল। এবং চকিতে চোখে পড়ল, ঘাটের পশ্চিম দিকের ঝোপ দিয়ে যেন কেউ চলে যাচ্ছে। শুভেন্দু সব কিছু ভুলে দৌড় দিল। ঝোপটার শেষেই একটা মন্দির এবং সেটাও জঙ্গলে ঘেরা। হুড়মুড় করে যেন কেউ সেই জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। শুভেন্দুও ঢুকে পড়ল। এবার পথ রুদ্ধ! সহসা একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ছায়া দাঁড়িয়ে পড়ল। আর একটু হলে শুভেন্দু তার ঘাড়ের ওপর পড়ত।

ছায়াটা এবার পুরোপুরি মানুষের মূর্তিতে দু' হাত বুকের কাছে নিয়ে নত-মুখে দাঁড়িয়ে। মানুষটি মেয়ে। এক পিঠ খোলা চুল তার বিস্রস্ত। নীল

ডোরাকাটা শাড়িটা এলোমেলো। সস্তা ছিটের জামাটার রং উঠে গেছে। হাতে গুটিকয় কাঁচের চুড়ি। ফর্সা রং। দীর্ঘদেহিনী মেয়েটির স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই মনে হল। সে হাঁপাচ্ছে। হয়তো কাঁপছেও একটু।

শুভেন্দুর মনে হল, একে সে দেখেছে এর আগে। দক্ষিণের ঘাটে চান করতে দেখেছে এক আধ-বার! কলসী কাঁখে জল আনতে দেখেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া ভাবতে চেষ্টা করল শুভেন্দু। এবং সমস্ত ঘটনা ও পরিবেশটা অদ্ভুত মনে হল তার। এখানে এভাবে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়। তবু সে না জিজ্ঞেস করে পারল না, আপনি কে?

নতমুখেই জবাব দিল মেয়েটি, আমি মদন।

মদন! মেয়ের নাম? কিন্তু সরু গলায় একটি ভয়ার্ত কান্নার আভাস পাওয়া গেল। শুভেন্দু বলল, মদন আপনার নাম?

—হাঁ, মদনমঞ্জরী দেবী—বন্দ্যোপাধ্যায়!

শুভেন্দু প্রায় হুকুম করল, হু! মুখ তুলুন, তুলুন মুখ।

মদন ভয়ে ভয়ে মুখ তুলল। কিন্তু শুভেন্দুর দিকে চোখ তুলল না। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। শুভেন্দু দেখল, কালো দুটি বড় বড় চোখ মদনের। আর সেই চোখের কোলে এখন জল বেয়ে পড়ছে। যেন অবেলায় ছায়া পড়ে মুখের দীপ্তি একটু শুষে নিয়েছে। কিন্তু স্নিগ্ধতায় ঢলঢল।

শুভেন্দু বলল, আপনি আমাকে ভয় দেখান কেন?

মদন দুটি অবাক চোখ তুলে বলল, কই, না তো!

—তবে কী করেন? আজই আপনি ঝোপে দাঁড়িয়ে কী করছিলেন?

—আমি তো দেখছিলাম।

—কী?

মদন চুপ। চোখ নামিয়ে নিল।

—কী দেখছিলেন, বলুন।

মদন কোনরকমে একবার চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল। আর শুভেন্দুর মনে হল, একে আপনি বলা প্রায় অসম্ভব। তবু সে বলল, আমাকে দেখছিলেন?

মদন অকুণ্ঠ সারল্যে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

—কেন?

—এমনি।

—এমনি ?

মদন থতমত খেয়ে বলল, না, জানি না।

শুভেন্দু এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, গম্ভীর গলায় বলল, যান বাড়ি যান।

মদন পরিপূর্ণ চোখে একবার চকিতে দেখল শুভেন্দুকে। তারপর নিমেষে জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিজেকে আবিষ্কারের কথাটা আর মনে রইল না শুভেন্দুর। কৌতূহল আর একটি অপরিচিত অনুভূতি তাকে যেন কেমন আচ্ছন্ন করে দিল। তার শহুরে জীবনের পথে ঘটনাটিতে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য হয়তো আছে। ভাবিয়ে তোলার মতো কিছু নেই। কিন্তু তার ভিতরে একটা অতৃপ্ত আবর্ত পাক খেতে লাগল।

কাউকে সে কিছু বলতে পারল না। কিন্তু তার নিস্পৃহ নীরবতা নিজেরই সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে তুলল। মুখর হয়ে উঠতে চাইল।

পরদিন কাজে বসেও, একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল শুভেন্দু। কাচের জানালা দিয়ে সে বারে বারে বাইরে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। স্তব্ধ দুপুর। নিশ্চুপ গাছ। অনড় ঝোপ। নিশ্চল ছায়া। প্রজাপতিরা উড়ছে। তবু বড় বড় কালো দুটি চোখের দৃষ্টি, যেন তার ওপরে নিবদ্ধ।

কাজ ফেলে উঠল শুভেন্দু। বেরিয়ে বাড়িটাকে প্রায় প্রদক্ষিণ করে, পিছনের পিটুলিতলায় আসতেই আবার সেই গাঙ্গুলি আর যতীনবাবু। আর এই বোধহয় প্রথম একটা বিক্ষুব্ধ প্রশ্নে ভ্রূ কুঁচকে উঠল শুভেন্দুর। কিন্তু সে কিছু বলল না।

পিছন ফিরে সে পুকুরের দিকে পা বাড়াল। ভাঙা মাঠ শূন্য। দূর থেকে জঙ্গলে আবৃত ভাঙা মন্দিরের দিকে তাকাল সে। স্তব্ধ নিবিড় অরণ্য শুধু। তবু পায়ে পায়ে সেদিকেই অগ্রসর হল। মন্দির পার হয়ে গেল। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

একটু হতাশ হয়ে, শুভেন্দু ফিরল। আর তন্মুহূর্তেই যেটাকে সে জঙ্গল মনে করেছিল, সেই কালো ডোবায় একটা তরঙ্গ উঠল। দেখল, বন ঘেঁষে মদন-মঞ্জরী দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখ তার তেমনি নত। কিন্তু গতকালের মতো, ভয়-চকিত ত্রস্ত নয়। আজ তার চোখে জল নেই। আজ সে তেমন বিস্রস্ত নয়। কিন্তু বিন্যস্ত হতে সে মোটেই জানে কি না সন্দেহ।

শুভেন্দুর মনে হল, পরিচয়টা যেন অনেক দিনের। সে জিজ্ঞেস করল, কখন এলে এখানে ?

মদনমঞ্জরী বলল, এখুনি।

—আমি দেখতে পেলুম না তো।

—চুপি-চুপি এসেছি।

সারল্য যেন বিস্ময়কর। শুভেন্দু বলল, কেন ?

এবার চুপ। শুভেন্দু বলল, আমি এলাম বলে ?

ঘাড় নেড়ে সায় দিল মদনমঞ্জরী। তারপরে বলল, দেখতে পেলাম।

—কোথা থেকে।

—বাড়ির ভিতর থেকে। কাজ করতে করতে—

শুভেন্দুর যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। বলল, আমি কাজ করতে করতে উঠে এসেছি, তুমি দেখেছ ?

মদনমঞ্জরী ঘাড় কাৎ করে জানাল, হাঁ।

—কেন ? তুমি আমাকে দেখ কেন ?

মদনমঞ্জরী নীরব। শুভেন্দু বলল, সবাইকে দেখ বুঝি ?

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

—শুধু আমাকে ? কেন ?

মদনমঞ্জরী কিছু বলবে বলে মুখ তুলে আবার চুপ হয়ে গেল। শুভেন্দু বলল, আমাকে তুমি কিছু বলতে চাও ? কোনো দরকারী কথা ?

আবার ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

—তবে ?

মদনমঞ্জরী যেন নিশ্বাস ফেলতে পারছে না। কোনো রকমে বলে ফেলল, আপনি সেই প্রথম দিন ভয় পেয়েছিলেন।

—সেই জন্যে ?

তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল আবার মদনমঞ্জরী। বলল, না।

—তবে ?

প্রশ্নের চাপে পড়ে যেন কেঁদে ফেলবে মদনমঞ্জরী। কোনো রকমে বলে উঠল, ভাল লাগে।

কথা দুটি কেমন যেন তীরের মতো এসে বিঁধল শুভেন্দুর বুকে। সহজ স্বচ্ছন্দ একটা সত্যের মতো। অথচ ব্রীড়াবনত লজ্জায় কোনো হাসি উছলে পড়ছে না মদনমঞ্জরীর ঠোঁটে। একটি বিষণ্ণ মাধুর্যের হাসির আভাস মাত্র ফুটে রয়েছে।

শুভেন্দু বলল, কেন ?

মদনমঞ্জরী একবার চোখ তুলল। কালো চোখে তার, কপালে লুটনো চুলের ছায়া পড়েছে। দৃষ্টিতে একটা মুগ্ধ স্নিগ্ধ দ্যুতি। বলল আমি জানি না।

এবং শুভেন্দু নিজে কি জানে, কেন একটা ব্যথিত আনন্দের বিচিত্র অনুভূতি অনুরণিত হচ্ছে তার বুকে। সবাই কি সব জানে। এই মৌন স্তব্ধতায়, এই ঝংকারে তার স্খলিত হাতের মরা একতারাটা বাজবে, এ কথা সে জানত না।

এ বিষয়ে আর কিছু বলল না শুভেন্দু। কারণ, এ বিষয়ে না বলাটাই যেন নিয়ত বলায় মুখর হয়ে উঠল। সে হঠাৎ বলল, তোমার মাকে দেখেছি।

—জানি।

—কথাও সব শুনেছি।

—মায়ের মাথা খারাপ।

—কেন ?

—মামা সব ঠকিয়ে নেবে বলে ভয় পায়।

—নেয় যদি ?

—নেবে।

—আর তুমি ?

—আমার কী দরকার। কী করব আমি এসব নিয়ে। মা মরে যাবে। মামাও মরে যাবে। আমিও একদিন মরে যাব।

—আর তোমাকে যদি যতীনবাবু বিয়ে করেন।

—উনি তো আমার আগে মরে যাবেন।

হাসতে গিয়েও একটা আশ্চর্য অসহ্য কষ্টে ব্যথিত হয়ে উঠল শুভেন্দু। মদনমঞ্জরীও মৃত্যুকে স্থির জেনে বসে আছে, তাই সে সবকিছুরই সহজে মুখোমুখী। তবু একটা তরঙ্গে ও স্রোতে সে ছুটোছুটি লুকোচুরি করে মরে। আর ভাল লাগে, মুগ্ধ হয়, কিন্তু এই সমগ্র পরিবেশ তার কারণ অনুসন্ধানে আর কৌতূহলিত করে না! তবু ঝংকার ওঠে। আর অপরিচিত অঙ্গুলি সংকেতে সুর বাজে।

গভীর রাত্রে সার্ভেয়ার মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা শেষ করে উঠল শুভেন্দু। কথা হচ্ছিল চ্যাটার্জির ঘরেই বন্ধ দরজার ভিতরে। টেবিলের ওপরে ছিল স্বর্গত নিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা চিন্তামণি দেবীর দলিলাদি আর সমগ্র গ্রামের নকশা।

চ্যাটার্জি শুভেন্দুর পিঠে হাত রেখে বললেন, আই ব্লেস্ ইউ মাই বয়।

শুধু একটি বিধবার উপকার করেছ বলে নয়। এমন কি মদনমঞ্জরীকে আবিষ্কারের জন্যও নয়। তোমার কাছ থেকেই জানলাম, ঘরের কোণে শ্মশান করেছি, সংসারের খেলায় ফাঁকি দেব বলে নয়।

শুভেন্দু ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। নিজের ঘরে এসে দক্ষিণের জানালায় দাঁড়িয়ে ভাবল, এই ভাল। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যে নিরন্তরতার একটি আকর্ষণ ও কম্পন সে হারিয়ে ফেলেছিল অল্প বয়সেই, নির্বিকার মুগ্ধতাহীন ও অবিশ্বাস নিয়ে, অকৌতূহলী নির্বিরোধে শুধু কোনোরকমে মৃত্যুর দরজায় চেয়েছিল পৌঁছতে, তার সেই স্তব্ধতায় যেন চিড় খেয়ে গেল। এই স্তব্ধ পরিত্যক্ত পোড়ো ভিটা আকাশের মধ্যে কোথায় যেন একটি দুরন্ত তরঙ্গ আছে। মদনমঞ্জরী নামে মেয়েটির জীবনের উত্তাপ এবং স্রোত তাকে যেন বিশ্বাসে, মুগ্ধতায়, কৌতূহলে এবং নিরন্তর বিরোধের মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল।

অথচ সে ছিল শুভেন্দুর সচল, সঘন নিস্বন নন্দিত নানান মুন্সীয়ানায় বিচক্ষণ, মৃত সভ্যতার অনেক দূরে। অচেনা এক রাক্ষসীপুরীর মায়ায় নিদ্রিতা।

সুবর্ণা

প্রায় মাস চারেক পরে শিল্পী বন্ধু ভুবনের একটি দীর্ঘ পত্র পেলাম। লিখেছে: ভাই নীরেশ, নিশ্চয় এতদিনের নীরবতায় রাগ করেছিস। কিন্তু বিশ্বাস কর, এতদিন বন্ধ দরজার অন্ধকার কোণেই পড়েছিলুম। কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল না। মা আমাকে এত বেশী চেনেন যে কখনো ডেকে জিজ্ঞেস করেননি, ঘরের কোণে কেন আমার এ নির্বাসন। কাজের মধ্যে হাঁক-ডাক ছুটোছুটি করা আমার অভ্যেস, যে জন্য বন্ধুদের ধারণা, ষোলো আনা প্রতিভার সিকিখানেক আমার বাকী রয়ে গেল, আমি বারো আনার কারবারী রয়ে গেলুম।

সেই আমি এতদিন রং তুলি ছুঁইনি, বন্ধুহীন একলা ঘরে একটা অসহ্য কষ্ট, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাময় একটি বিশাল অন্ধকার জিজ্ঞাসার গ্রাসে চাপা পড়েছিলাম।

অথচ আমি জানি, কারণটা শুনলে তোমরা সবাই খুব তুচ্ছ মনে করবে। হাসতেও পার। না হয় তুচ্ছ মনে করা গেল, না হয় হাসাই গেল, কিন্তু তুচ্ছও যে ক্ষেত্রবিশেষে বড় উচ্চ হয়ে বাজে, বহুদূর গভীরে পৌঁছয় তার প্রতিধ্বনি, তা মানবে আশা করি। আমার বেলায় তাই হল। একটি তুচ্ছতাই আমার চিরদিনের দরজা খোলা-বন্ধের কৌতূহল ও আগ্রহ হয়ে রইল।

দিল্লীতে, ফ্রেঞ্চ এম্‌ব্যাসি থেকে যখন প্যারিস প্রদর্শনীর কথাবার্তা বলে বেরিয়ে এলুম, মনটা তখন আনন্দে ভরপুর। ভাবলুম, কলকাতায় ফেরার আগে, কোথাও একটু বেড়িয়ে যাই। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল আগ্রার কথা। আগ্রার সঙ্গেই একটা অপরিচিত কৌতূহল, একটি মেয়ের মূর্তি ধরে আমাকে ডাক দিল। যার নাম জানি, অনেক সংবাদ জানি, কিন্তু কখনো চোখে দেখিনি, মূর্তিটি সেই সুবর্ণা রায়ের। সুবর্ণার দু'একটি পত্র তুমিও দেখে নিয়েছ আমার কাছে। একটু আধটু ঠাট্টাও করেছ। কারণ, তোমরা যাদের Fan বল, এমন অনেকের সঙ্গে আমাকে পত্রালাপ করতে দেখেছ, কিন্তু দু'বছর ধরে পত্রে যোগাযোগ রাখতে কখনো দেখনি। আর তা রাখিও নি কারুর সঙ্গে, কারণ সম্ভব নয়। কিন্তু সুবর্ণার সঙ্গে যে কেন রেখেছিলুম, আমি নিজেও তা খুব ভালো জানি নে। বোধহয় ওর পত্রের মধ্যে একটি বিশেষ মেয়ে, একটি বিশেষ মনকে ঝলকে উঠতে দেখেছিলুম। যার অনায়াস গতির মধ্যেও একটি আশ্চর্য ব্রীড়া লীলায়িত হয়ে উঠেছিল।

অপরিচয়ের মধ্যেও, চোখে একটি ধরাপড়া পরিচয়ের হাসি ছিল লুকিয়ে। আমার ভাল লেগেছিল। তাই, সুবর্ণার প্রথম অনুরোধেই ওকে 'তুমি' সম্বোধন করেছিলুম। পত্রে কথা দিয়েছিলুম, আগ্রায় যদি কখনো যাই, ওকে নিশ্চয় সংবাদ দেব, দেখা করব।

আমার খেয়াল ছিল, সুবর্ণা এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দিল্লী থেকে দিলুম চিঠি লিখে। তারিখ দিয়ে জানালুম, তিনদিন পরে, সকালবেলার ট্রেনে আগ্রা পৌছুচ্ছি। এবং কোন্ হোটেলে উঠব সেটাও লিখে দিলুম।

ঠিক তারিখ মতোই সকালবেলা আগ্রা গিয়ে পৌছলাম। যাত্রীর তেমন ভিড় ছিল না গাড়িতে।

টিকেট কালেক্টরকে টিকেট দেবার মুহূর্তেই, গেটের বাইরে লক্ষ্য পড়ল একটি মেয়েকে, যে আমার দিকেই তাকিয়েছিল। আমি বাইরে এলুম। মেয়েটির মুখে যেন একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। সে আমার সামনে এগিয়ে এল আরো। প্রায় অপরিচিতার মতো।

আমি জিজ্ঞেস না করে পারলুম না, আপনি কি সুবর্ণা—

কথার আগেই সিল্ক শাড়ির আঁচল এবং আবাঁধা এলোচুল প্রায় লুটিয়ে পডল আমার পায়ের কাছে। ও যে সুবর্ণা, এতে যেন সেটাই প্রমাণ করে দিলে। এসবে আমি ভীষণ অনভ্যস্ত। লজ্জায় তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, এ কি করছেন।

ততক্ষণে সুবর্ণা উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'আপনি' করে বলছেন যে?

সেটা নিশ্চয় আমার প্রথম দর্শনের আড়ষ্টতা। কিন্তু সুবর্ণা শাস্ত্রসম্মতভাবেই সুবর্ণা। এবং বিম্বোষ্ঠা, এবং আয়ত কালো চোখ এবং—

থাক্। সুবর্ণার বর্ণনা আমার পক্ষে লিখে দেওয়া সম্ভব নয়। ওটা তোমাদের এক্তিয়ারে। শুধু পত্র-লেখায় যাকে দেখেছিলুম, এ সুবর্ণা তার চেয়ে কিছু বেশী। কিংবা পত্রে যা ঢাকা ছিল, শারীরিক আবির্ভাবে ঘুচে গেল তা। ওর চোখের গভীর থেকে যেন একটি স্বপ্নে পাওয়া খুশি উপচে পড়ল। যেন বাতাসের ঘায়ে একটি বেপথু ফুল। দেখলুম ওর চোখের ওপর এসে পড়েছে সাপের মতো চুলের গুছি। মিথ্যে বলব না, স্বপ্ন ভর করল আমারই চোখে।

জিজ্ঞেস করলুম, আমাকে চিনলে কেমন করে?

অনেকদিনের পরিচিতার মতোই একটু লজ্জা মিশিয়ে বললে, যেমন করে সবাই চেনে। কাগজে ফটো দেখেছি।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও চোখ নামাল। কিন্তু মাথায় মালপত্র নিয়ে কুলি দাঁড়িয়ে। বললুম, সুবর্ণা, আমি এখন হোটেলে যাব।

সুবর্ণা বললে, ওবেলা কিন্তু আমি আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাব। আর, এখন আপনার সঙ্গে একটু হোটেলে যাব ?

ওর অনুমতি চাওয়া দেখে, ওকে যেন আরো বেশী করে চেনা গেল। মনে মনে খুশি হয়ে বললুম, তোমার অসুবিধে না হলে—

সুবর্ণা যেন ওর উচ্ছ্বাসকে চাপা দিয়ে বললে, এখন আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না একটুও। আপনার অসুবিধে হবে না তো ?

বললুম, একটুও না।

মনে মনে অবাক হলুম। দেখা মাত্র এতখানি মুগ্ধতা, প্রায় যেন মোহের সঞ্চার করল আমার মধ্যে। থরে বিথরে সাজানো আমার ত্রিশোর্ধ্বের বুকের একটি নিশ্চিন্ত জায়গা সহসা এমন এলোমেলো হয়ে উঠছে কেন ? সুবর্ণাকে দেখে সব থেকে আগে আমার অাঁকার কথা মনে পড়ল। এবং এই প্রথম আমার মনে হল, আমার সব রং জড়ো করলেও বুঝি ওকে কুলোবে না। আমার সব গতি দিয়েও ওকে হয়তো ধরা যাবে না।

ওকে সঙ্গে করে যেন নিমেষে হোটেলে এলুম। দোতলায় আমার ঘর ঠিক করাই ছিল। ঘরে ঢুকে, সুবর্ণাকে বসতে বললুম। বেয়ারাকে বললুম চা খাবার দিতে।

কিন্তু সুবর্ণাকে দেখলুম, মাথা নত করে টেবিলে আঙুল খুঁটছে এবং হাসছে। জিজ্ঞেস করলুম কী হল ?

সুবর্ণা প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ভীষণ লজ্জা করছে।

দেখলুম, সত্যি ও আরক্তপ্রায়।

জিজ্ঞেস করলুম, কেন ?

বললে, চিঠিগুলোর কথা মনে করে। আমার চিঠি পড়ে আপনি নিশ্চয় খুব হাসতেন ?

বললুম, কাঁদিনি তো বটেই।

সুবর্ণা হেসে উঠল। আবার চোখ নামিয়ে বললে, কিন্তু নিশ্চয় ভেবেছেন, মেয়েটা ভারি বেহায়া।

বললুম, না। ভেবেছি, মেয়েটি ভুবন চৌধুরীকেই বেহায়া করে তুলল। তাই ছুটে এলুম।

সুবর্ণার হাসি যেন চুড়ির নিক্কণে বেজে উঠল। বললে, ইস্!

আমিও হেসে উঠলুম।

কিন্তু সুবর্ণার মুখে একটি করুণ ছায়া পড়ল সহসা। আমি যদিও বয়স এবং মান, দুই-ই বজায় রাখার চেষ্টা করছিলুম, তবু জিজ্ঞেস করলুম, কী সুবর্ণা?

সুবর্ণা চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। এবং অসঙ্কোচে বলল, আপনি এত দেরী করে চিঠি দেন, আমার কষ্ট হয়।

সুবর্ণার গলায় তার কষ্ট এমন সহজ ও অনাড়ম্বরে ব্যক্ত হল যে, আমি স্তব্ধ হয়ে গেলুম।

সহসা কিছু বলতে পারলুম না। সুবর্ণাই আবার বলে উঠল, কিন্তু আমি ভাবতাম, আপনি আপন মনে ছবি আঁকছেন, আমার কথা আপনার মনে নেই। মনে যখন পড়বে, তখন ঠিক চিঠি দেবেন।

তখন আমার নিজের মুখ আড়াল করতে হয়েছে। ওর অসহায় ব্যথাটা যেন আমাকেই চেপে ধরল।

আমি কিছু বলার আগেই, বেয়ারা এসে চা জলখাবার দিয়ে গেল। ফিরে দেখলুম সুবর্ণার পলকহীন চোখের দ্যুতিতে বিস্ময় ও আনন্দ রৌদ্রচকিত দীঘির মতো অনায়াস। বললে, আপনাকে দেখার জন্যে কতদিন ধরে বসেছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখলে?

বললে, বলতে পারব না।

সুবর্ণার ঠোঁটে একটি বিচিত্র হাসি ফুটল। তাকাল আমার দিকে। আবার চোখ নামাল হেসে।

বলল, আমার একদম যেতে ইচ্ছে করছে না এখন। কিন্তু এবার যেতে হবে।

যাওয়ার কথা শুনে আমি বিমর্ষ হয়ে উঠলুম। বললুম, যেও, চা খাও আগে। চা খেতে খেতে বারে বারে ওর চোখে সেই ধরা-পড়া লুকোনো হাসি আমি দেখতে পেলুম।

সুবর্ণা বললে, আমি এবার যাই?

বললুম, বিকেলে আসছ তো?

ও বললে, নিশ্চয়!

কিন্তু আবার বললে, যাচ্ছি, অ্যাঁ?

বারে বারে জিজ্ঞাসার ভিতরে ভিতরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। মনে হল সুবর্ণা যেন, রং-এর শেষ প্রলেপের পর, ঘাম-তেল মাখা এক অলৌকিক উজ্জ্বল

প্রতিমা। আমার হাত ওর হাতের কাছেই। আমার সব রক্ত যেন আমার হাতেই তখন আবর্তিত। কেন, স্থবর্ণা এমন বারে বারে যাবার অনুমতি চাইছে কেন ?

তারপরে স্থবর্ণা যাবার আগে হঠাৎ নীচু স্বরে বললে, আমি বোধ হয় সম্মান করতে শিখিনি। কিন্তু ভাল লাগা আর মনের খুশিকে একটুও চাপতে শিখিনি। তাই আমার বুকের মধ্যে কতদিন কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

—কেন স্থবর্ণা ?

স্থবর্ণা বললে, যাঁর ছবি দেখে আমার মন ভরেছিল, সেই মানুষের অন্তরঙ্গ হবার আশায় সব যেন আমার শূন্য ঠেকছিল।

একথা শুনে আমার বুকের রক্ত যেমন চলকে উঠল, তেমনি দিশেহারা হলুম, স্থবর্ণাকে ঠোঁটে ঠোঁট টিপতে দেখে। দেখলুম, ওর চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। এবার আমি নিঃসঙ্কোচে ওর একটি হাত ধরে প্রায় স্খলিত গলায় ডাকলুম, স্থবর্ণা ?

স্থবর্ণা যেন স্বপ্নের লজ্জা থেকে সহসা জেগে উঠল। যেন নিশ্চিন্ত হল আর ওর মুখে চকিত হাসির আলো উঠল ঝলমলিয়ে। বললে, এবার তাহলে যাই ?

আমি ভুবন চৌধুরী, এত দেখার পরেও সেই মুহূর্তে কোনো কথা বলতে পারলুম না। হাত ছেড়ে দিলুম ওর। বারান্দা দিয়ে নীচে নেমে গেল ও। আমি দোতলার বারান্দা থেকে দেখলুম। ও একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে হাসল তারপর হারিয়ে গেল।

আমার ঘরের সমস্ত নৈঃশব্দের মধ্যে একটি লুকানো-প্রাণের হাসি-কান্নার আনন্দধ্বনি আমাকে ব্যাকুল করে তুলল। আমার ভিতরের রং ও গতি যেন পেল আর এক নতুন মুক্তির সন্ধান।

রাত জাগার ক্লান্তি আমার গেল। কোনোরকমে স্নান খাওয়া সেরে, বিশ্রামের ছদ্মবেশে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

প্রায় বেলা তিনটের সময় বেয়ারা দরজায় ঘা দিল। বললে, এক মেমসাহেব দর্শনপ্রার্থী। আমার বুকের স্পন্দন বাড়ল। মনে মনে বললুম, মেমসাহেব নয় রে, ও যে মহারাণী। নিয়ে আসতে বললুম।

কিন্তু পর্দা সরিয়ে যে ঢুকল, সে অন্য একটি মেয়ে। যার রূপ আছে, সজ্জা আছে কেশে বেশে নিপুণ। আশাহত বিস্ময়ে বললুম, আমার নাম ভুবন চৌধুরী। আপনি ?

বললে, আমার নাম স্বর্ণা রায়। আমি চমকে, প্রতিবাদের স্বরে বললুম, না না।
মেয়েটি অবাক হয়ে বললে, আমাকে কিছু বলছেন? আমি স্বর্ণা, আপনি যে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন আজ পৌঁছুবেন বলে? পাছে ভুল হয়, তাই আপনার চিঠিটাও নিয়ে এসেছি।

চিঠিটাও ওর হাতে দেখা গেল।

তাড়াতাড়ি বললুম, ও!

কিন্তু আমার বুকের ভিতরে ঝড়ের দোলা। বিশ্বাস অবিশ্বাসের এক ব্যথা ধরা সংঘাত। এও কি এখনো সম্ভব? কেন? তা কেন হবে? তবু, বলতে গিয়ে আমি থমকে গেলুম। যাক্ এখন নয়। হয়তো পরে কিছু জানা যাবে। কিন্তু এক অনিবার্য অসহায় আচ্ছন্নতা আমাকে ঘিরে রইল।

এই স্বর্ণা বললে, দেখি।

বলে নমস্কার করল পায়ে। আমি প্রাণহীনভাবে বাধা দিলুম। আর সকালবেলার স্বর্ণার নমস্কার আমার মনে পড়ে গেল।

এই স্বর্ণা বললে, আমাদের বাড়ি যাবার সম্মতি দিয়েছিলেন পত্রে। যাবেন তো?

মনে পড়ল, সকালবেলার স্বর্ণার কথা, আমি কিন্তু বিকেলবেলা আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাব।

সে স্বর্ণা নয়? সে তবে কে? সে কে? আমাকে নিয়ে এমন খেলা তবে কে খেলেছে? সে যদি স্বর্ণা নয়, না-ই বা হল। সহস্র ছদ্মবেশ তার থাকুক। তবু সে কি আসবে না আর? আমি তো শুধু তার কথাই শুনিনি। আমি যে তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। আমার হাতে যে এখনো তার স্পর্শের অনুভূতি তীব্র হয়ে আছে!

এই স্বর্ণা উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে বললে, আপনার শরীর খারাপ নাকি?

থতমত খেয়ে বললুম, অ্যাঁ? উঁ, হ্যাঁ।

এই স্বর্ণা বললে, তাহলে আপনি আজ বিশ্রাম করুন। কাল সকালে কিন্তু নিয়ে যাব।

আমি হেসে সম্মতি দিলাম, কিন্তু ওকে চলে যেতে বাধা দিলুম না।

তারপর শেষ ফাল্গুনের বাতাসে ভর করে কখন রাত এসে পড়ল, জানতে পারিনি। কিন্তু সকালবেলার স্বর্ণা এল না। সন্দেহ গেল, কিন্তু আমার বিনিদ্র রাত শুধু একটি প্রশ্নে মথিত হতে লাগল, সে কে? সে তবে কে?

আর কোনো দিনই তার জবাব পেলুম না। তারপরেও চারদিন আগ্রায় ছিলুম। বিকেলবেলায় স্বর্ণাদের বাড়ি গিয়েছি, আলাপ করেছি সকলের সঙ্গে, খেয়েছি, তাজে এবং দুর্গে আর ফতেপুরসিক্রীতে বেড়িয়েছি। পথে পথে যত মেয়ে দেখেছি, চমকে চমকে তাকিয়েছি সকলের দিকে। আর কেবলি মনে হয়েছে, সকালবেলার স্বর্ণা যেন অদৃশ্যে আমারই আশেপাশে ফিরছে আর মুখে আঁচল চেপে হাসছে।

কিন্তু কেন? কেন এই নিষ্ঠুর খেলা? সে কে? তার কাছে আমি কী অপরাধ করেছি? যত ভেবেছি, ততই সেই সকালবেলার কয়েকটি মুহূর্ত আরো স্পষ্ট তীব্র হয়ে উঠেছে। চার মাস ধরে বন্ধ ঘরে শুধু এই ভেবেছি। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা!

মনে মনে অনেক রাগ করেছি, ঘৃণা করেছি সকালবেলার স্বর্ণাকে। কিন্তু মিথ্যে বলব না, তারপরেও কান পেতে আমি আমার কান্না শুনতে পেয়েছি।

ভাই, এ যাত্রা আর তোর সঙ্গে দেখা হল না। পরশু ফ্রান্সে রওনা হচ্ছি। হয়তো যেতে পারতুম না। কিন্তু চার মাসের বন্ধ ঘরের অন্ধকার আমাকে একটি সত্যের আলোর বাইরে এনেছে। তা হল, আমাদের জীবনে দুজনের আগমন এমনি ঘটে। যারা আসবার পূর্ব মুহূর্তেও কোনো জানান দেয় না। ছায়া যদি বা ফেলে, আমরা টের পাইনে। একজন আসে জীবনে একবার। আর একজন হয়তো নানান বেশে একাধিকবার।

একজন মৃত্যু, আর একজন আমাদের মহাপ্রাণের চিরপ্রার্থিত স্পর্শমণি, মনের মানুষ। তারা আমাদের সীমানায় থাকে কিন্তু প্রত্যহের কুলায় ওরা কুলোয় না। আজ এই এখানেই ইতি করলুম।

—তোর ভুবন

ভুবনের চিঠি পড়া হল, কিন্তু সকালবেলার স্বর্ণা ভাসতে লাগল আমার মানসপটে।

ও এখন সাজছে। ও একটু সিনেমায় যাবে। যদিও আজ রবিবার এবং সকালবেলা থেকেই সবাই রোজগারের ফিকিরে ঘুরতে যাবে! তবু, তারপরেও সারাদিন হাতে থাকবে। বেলা দশটার এ শো'টা ও দেখে আসবে। কারণ রাত্রে ওর অসুবিধা হয়। নানান্ রকমের অসুবিধা। শোবার জায়গায় এসে অন্য কেউ হয়ত শুয়ে থাকবে। জায়গা দখলের চেয়েও, ওর সঙ্গে শোবার মতলবেই আগে এসে শুয়ে পড়ে থাকার ভান করে। তা' ছাড়া যতই বেলা গড়িয়ে সন্ধেয় যায়, ততই রাস্তার মানুষ গাড়ি ঘোড়া, সব যেন কেমন বেসামাল হয়ে পড়তে থাকে। ওকে লক্ষ্য করে না। প্রায় চাপা দিতে আসে। লোকেরা মাড়িয়ে দেয়!

আর তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। অন্ধকারে ওকে চোখে না পড়ারই কথা। আর অন্ধকারেও যাদের অব্যর্থ নজর ওর দিকে পড়ে, তারা ওর গায়ে হাত দেয়। বেড়ালের মতো, চোখ পিট্‌পিট, কান নাড়ানো সেই সব মানুষেরা, পাতের থেকে মাছ ছোঁ মেরে তুলে নেওয়ার ভঙ্গিতে মুহূর্তে নখ শাণিত ক'রে ওর বুকে থাবার ঝাপটা মেরে যায়।

যদিও ওর বুক মাছ নয়। তার চেয়ে অনেক সুন্দর, মহৎ, কারণ ওর বুক মানুষের মা হবার মতো নিখুঁত লক্ষণ ও সৌন্দর্য নিয়ে বর্ধিত এবং উন্নত হয়েছে। সেই সঙ্গেই ওর দুই হাত। যে-সব শক্ত বলিষ্ঠ হাত সন্তানকে পালন করতে পারে। আঁকড়ে ধরতে পারে বুকে, সেই রকম দুটি হাত আছে ওর। আর সেই রকমই দুটি চোখ এবং দুটি ঠোঁট। যে চোখে সন্তান রক্ষার বাঘিনী সতর্কতা। যে ঠোঁটে স্নেহের উত্তপ্ত অমৃতধারা।

আর এই সব উপচারগুলি এখন কামনায় এবং প্রার্থনায় ধ্যানমগ্ন। কারণ ও এখন ওর সন্তানকে খুঁজছে। ওর ভিতরের প্রবাহে সেই গর্জিত ধারাকে ও আমন্ত্রণ করছে। যে গর্জিত ধারা বীজবাহী।

আর তাই, এই প্রার্থনা এবং আমন্ত্রণের সাজ নিয়ে ওর গজচোখ মদিরেক্ষণা হয়েছে। ও তাতে টেনে কাজল না দিয়ে পারে না। ওর ক্ষত-বিক্ষত মুখে স্নো

পাউডার না মেখে পারে না। উকুনের বাসা ঘেঁটি ঘেঁটি চুলগুলি তেল জল দিয়ে আঁচড়ে, ছাগলের ল্যাজের মত ঘাড়ের দু'পাশে ঝুলিয়ে দিতে হয় বেণীর মত। হাত ভরে কাচের চুড়ি আর গায়ে লাল সালুর জামা ওর নৈবেদ্যের সাজ। আর, সেই লাল জামার উপর দিয়ে, ডোরা কাটা শাড়ির আঁচল ওকে টেনে দিতে হয়।

শুধু কোমরের নিচে থেকে ওর শাড়ি যেন ছোট একটি পুঁটুলির মত গুটিয়ে থাকে। কারণ ওর উরু বা জঙ্ঘা নেই। যদিও ওগ্ন ছেলেরা কেউ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মত অমানবিকভাবে জন্মাবে না। কিংবা সীতার মত অগর্ভজাতা মেয়ে।

মানুষের মা হবার মানবী শপথ ওর দৃঢ়, পরিণত, নিশ্চিত। আর তাই, ওর ভাঙা ভাঙা প্রায় অমানুষিক গলা, ওর অবচেতন ধ্যানেরই দৌলতে এক আশ্চর্য সুর সৃষ্টি করে বলে, অ বাবু, বাবু, এই দেখেন, আমার দুটো পা নাই, দুটি পয়সা দেন।

ওর বাস এই জংশন স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফরর্মের শেষে, সেই পরিত্যক্ত বাতিঘরের বারান্দায়। যেখানে ছাড়া গরু, রাস্তার কুকুর, আর ভারতীয় জনসংখ্যা গণনার বাইরে প'ড়ে থাকা আরও কিছু মেয়ে পুরুষ আসে। চারটে ছোট ছোট বারান্দা নিয়ে যেখানে প্রায় রোজই রাজ্য এবং রাজা কিংবা রাণীর উত্থান-পতন হয়।

এই রবিবারে সকালে ও সিনেমায় যাবে, তাই ও এখন সাজছে। আর জনা তিনেক এলোমেলো ছড়িয়ে বসে তাই দেখছে। ওরা তিনজনও এই জংশন স্টেশনের সঙ্গমে এসে ভিড়েছে ভাসতে ভাসতে। কেউই অন্ধ, কানা, খোঁড়া নয়। একজন গায়ক। তাই সে আলখাল্লা পরে। আর একজন প্রায়-অভিনেতা। যতখানি রোগা, তার চেয়ে বেশি রোগা হ'য়ে থাকতে চায়। কারণ ল্যাপটিয়ে চলে অস্ফুট উচ্চারণেই তার আয়। বাকীটা রগুড়ে। লোক হাসানো তার কাজ।

এই তিনজন-ই শুধু নয়। আরো অনেক আছে। যারা এখানে এসে এখন বসে থাকতে পারত। কিন্তু বোধহয় বসে থাকতে পারে নি পেটের তাগিদে।

ও বলল, এই ঠাকুর, তোর মাথাটা সরা, দেখতে পাচ্ছি না কপালটা। অন্ধকার পড়েছে ওর মুখে। আয়নায় দেখতে পাচ্ছে না ঠিক। টিপ্‌টা বেঁকে যেতে পারে। একটি দু'তিন ইঞ্চি পারা লাগানো কাচের টুকরো আয়নার কাজ করে। পুরো মুখটি যেখানে ছায়া ফেলতে পারে না। এমন কি দুটি চোখও এক সঙ্গে দেখা যায় না। তাই সাবধানে কাজ করতে হয়।

ঠাকুর অর্থাৎ গায়ক তার মাথাটা সরাল। মাথাটা সরিয়ে বলল, এই বেঙি এখন কেন যাচ্ছিস বাইস্কোপে। মাগ্‌তে চল্‌।

বেঙি ওর নাম। জন্ম বিকলাঙ্গ বলে, জন্মানো মাত্রই বোধহয় ওর নাম হয়েছিল ব্যাং। এবং সেটাই পরে বেঙিতে দাঁড়িয়েছে।

বেঙি কোন জবাব দিল না।

রোগা ল্যাপেটা লোকটার হাত তার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে। সেই হাতটা বার ক'রে পয়সা বাজাবার মত ক'রে বলল, কাল কিছু বেশি রোজগার হয়েছে। এখন তাই গরম.।

রগুড়েটা বলল, আর গরম হলেই বিবি সাজতে ইচ্ছে করে।

বেঙি টিপ্‌টা মনের শান্তিতে, মনের মত ক'রে দিতে পারল না। কোন রকমে টিপ্‌টা কেটেই খেঁকিয়ে উঠল, আমি মাগতে যাই না যাই, আমার গরম হোক বা নাই হোক, আর বিবি সাজি কি মেম-সাহেব সাজি, তোদের গায় কেন জ্বালা? তোরা মরতে যা না এখান থেকে।

কেউ কোন কথা বলল না। বেঙি আয়নার টুকরোটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ভাল ক'রে। প্রসাধনের শেষ বিন্দু হিসেবে, টিপটুকুই বাকী ছিল। আর সবই শেষ হয়েছে।

তারপরে সে খুঁজে খুঁজে বার করল ক্ষয়াটে দুটি স্যাণ্ডেল। পায়ে নয়, ওই দুটি সে হাতে গলিয়ে নিল। কারণ, হাতের ভর দিয়েই সে চলে হেঁচড়ে হেঁচড়ে। প্রস্তুত সে, প্রায় মহারাণীর মত বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে দেখল তিন-জনকে। আবার বলল, আ ম'লো, এ মুখপোড়া তিনটে সরে না কেন? সরবি তোরা, বেরুতে দিবি আমাকে একটু?

গায়ক বলল, আর তা' পরে দুফুরে যখন তোর খিদে পাবে, খেতে দেবে কে শুনি?

ল্যাটপেটে বলল, কটা ভাতার আছে তোর, শুনি? রগুড়ে বলল, ওটি কম না বাবা। হাজার হাজার আছে। তা সে খেতে দিকে আর না দিক।

বেঙি এবার আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, মরারা নিজের ভাবনা ভাবগে যা। আমার ভাতারের চিন্তা তোদের করতে হবে না। কপালে জোটে খাব। না হয় না খাব। তোদের কাছে হাত পাততে যাব না। ব'লে সে তিনজনকে ধাক্কা দিয়েই প্রায় বেরিয়ে এল। তারপর বলল, এই বেড়াটা কেউ ঢেকে দিস তো। নইলে আবার গরু, কুকুর এসে ঢুকবে। সেটাও প্রায় হুকুমের মত শোনাল। এবং হাতের কাচের চুড়ি ঝনঝনিয়ে হেঁচড়ে সে চলে গেল প্ল্যাটফরমের ওপর দিয়ে।

লোকের চাউনি তাকে তার অনাগত মাতৃত্বের অনুভূতিকে বাড়িয়ে দেয়। স্টেশনের বাইরে রিক্‌শাওয়ালারা তার পিছনে লাগে। চীৎকার শোনা যায়, এই বেঙি আয় বিনাপয়সায় চাপাব তোকে।

বেঙি কোন দিকে ফিরে তাকায় না। হেঁচড়ে হেঁচড়ে সিনেমা হলের সামনে চলে যায়। মেয়েদের কাউণ্টারের কাছে গিয়ে, পয়সা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ একে তাকে খোশামোদ করতে হয়। কারণ কাউণ্টারে ওর হাত যায় না।—অ' বাবু, আমাকে একটা পাঁচ আনার টিকেট দেন না।

বাবুর কিছুই যায় আসে না। মেয়েদের একেবারে যায় আসে না। তারা বেঙির দিকে তাকিয়ে আরও বিতৃষ্ণা বোধ করে। পায়ে ধরলেও টিকেট দেয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকেট কাটা হয়-ই। এবং কোনো পুরুষই সেটা কেটে দেয়।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে পারে না। তাই মেয়েদের সঙ্গে বসা হয় না ওর। গেটকিপার ওকে ফার্স্টক্লাসের মেঝেতে বসতে অনুমতি দেয়। বেঙি খুব মনোযোগ দিয়ে সিনেমা দেখে। দেখে, ও হাসে কাঁদে এবং রাগও করে। বেরিয়ে এসে কথাগুলি বলবার জন্য লোক খোঁজে। লোক মানে, ওর সঙ্গীদেরই খুঁজে বেড়ায়। যে সব সঙ্গীরা ওকে সব সময় ঘিরে থাকে। যারা ওকে ঘিরে পেখম খোলে, নাচে, রাগ করে, তোষামোদ করে, যারা খেতে দেবে না বলেও শেষ পর্যন্ত খেতে দেয়।

কারণ স্টেশনের মৌচাকটা এখন ওকে ঘিরেই। যত মধু সঞ্চিত হচ্ছে ওর জন্যেই। ওরই জঠরে এখন শতশত আগন্তুক সন্তানেরা। নানান দেহে অপেক্ষা ক'রে আছে। রাজারা সব মহারানীর চক্রে নতমুখে অপেক্ষমাণ।

আর এই মহারানীত্ব রক্ষা করবার, ওর অবচেতনের, ওর এই প্রায় অর্ধেক দেহের মাতৃত্বের প্রার্থনা ও ধ্যানমগ্নতা রক্ষা করবার জন্য সারারাত ওকে প্রত্যাখ্যানের লাঠি নিয়ে বসে থাকতে হয়।

—এই, দ্যাখ্‌ কুত্তা, গায়ে হাত দিবিতো খুন করব। যা, যা বলছি। ডাকব রেল পুলিসকে?

কুকুরের মতই তখন ছায়া হয়ে সরে যায় ওর পাশ থেকে। ও দেখে হাঁস-মুরগীর খোঁয়াড়ের আশে-পাশে শেয়ালেরা দল বেঁধে ঘুরছে। ওকে সারারাত তাড়া দিতে হয়। বসে থাকতে হয় লাঠি নিয়ে। আচমকা একটা ছায়াকে গায়ের ওপর এসে পড়তে দেখে, চীৎকার ক'রে উঠতে হয়। সেই চীৎকার শুনে প্রহরী আসে। এবং সে আসে কিন্তু পালায় না। অধিকার বোধেই সে মা হবার লক্ষণগুলিকে পীড়ন করে, কিন্তু বেঙিকে মাতৃত্ব দিতে তার ঘৃণা হয়।

পীড়নের ব্যথায় বেঙি নীরবে অভিশাপ দেয়। প্রতিবাদ করতে সাহস করে না।

তবু একদিন সেই গর্জিত ধারা বর্ষায়। যেদিন বেঙিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল বাতিঘরের পিছনে। কিন্তু ও মরে নি, রক্তটা ওর মাতৃসংবর্ধনার। প্রায় মৃত্যুর মত একটা উল্লাস! ও মানুষ চিনতে পারে নি। তার চেহারা দেখতে পায় নি। শুধু একটা কঠিন থাবায় তুলে নিয়ে গিয়ে একজন ওকে নিষ্ঠুরের মত একটা আজন্ম অনাস্বাদিত, তীব্র আনন্দদায়ক ব্যথা দিয়ে গেছে। আর সেই আনন্দের পুষ্টি ও ব্যথার শুষ্কতা, যুগপৎ ওর দেহে দ্রুত কাজ করতে লাগল। এইবার ও বাঘিনীর মত সতর্ক হল। এইবার ও মানুষের দিকে আরো তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। মানুষের মা হ'তে চলেছে ও। তাই ওকে পৃথিবীটার মত পাগল মনে হতে লাগল। ও খেঁকী হ'য়ে উঠল, কারণ নিজেকে ও আরো বেশী ভালবাসতে লাগল।

বেঙি সকলের কাছে হাত পেতে বলে এখন, বাবু পেটে আমার ছেলে, দুটি পয়সা দেন বাবু।

তারপরে মানুষটা ক্রমেই অনুভূতির জগতের দিকে ধাবিত হল। এই অনুভূতির ডাকটা, পিতার আহ্বানের মত। ধাওয়া করে আসাটা পরশুরামের কুঠারের মত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা দেখা গেলো, বাতিঘরের বারান্দায় উথালি পাথালি করে মরছে বেঙি। মাঝে মাঝে চীৎকার করছে। মানুষের মা'টা তার গা' থেকে মা হব'র আগের সব জড়-সাজগুলি খুলে ফেলেছে। বেঙির মনে হল, তার ভেতরে কে কাঁদছে। মাথা কুটছে। নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে।

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে আলো খুঁজল। আলো খুঁজতে খুঁজতে সে প্ল্যাটফরমের ওপরে চলে এলো। আলো আর মানুষ দেখে তার যন্ত্রণা যেন একটু স্তিমিত হল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই মানুষটা আবার এই মরজগতে আসবার জন্যে বেঙির নাড়ি ছিঁড়তে লাগল। মরজগতে তখন বাতাস বইছে। আকাশে তারা। আর রাত্রির নিস্তব্ধতা নেমেছে। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে গয়া প্যাসেঞ্জারটা এলো।

মিছে ঝামেলা থেকে আইন রক্ষার জন্য, গয়া-প্যাসেঞ্জারের একটি ফার্স্ট্‌ক্লাসের কামরা খোলা হল। ফ্যান খুলে, বাতি জ্বালিয়ে, তার মধ্যে তুলে দেওয়া হল বেঙিকে। দিয়ে, লক্ করে দেওয়া হল দু'দিক থেকে।

বেড়ি চীৎকার করে উঠল মাটির স্পর্শের জন্য, একটা কিছু ধরতে চাইল প্রাণ-পণে। তার মনে হল একটা অসহ্য যন্ত্রণা তাকে শূন্যে তুলে নিচ্ছে। কিন্তু বিরাট একটা ভার তাকে আঁকড়ে রয়েছে। তারপরেই সহসা সে মরণোন্মুখ সাপের মত কুঁকড়ে উঠল। কারণ একটি কুঠার তাকে যে কোপাচ্ছে। তাকে বিদীর্ণ করছে। পরমুহূর্তেই ছুটি সুন্দর হাত তাকে জড়িয়ে ধরল। যেন বলল,—'লক্ষ্মী মা আমার বেড়ি, একটু শান্ত হ'। একটু ধৈর্য ধর। তুই মানুষের মা' হচ্ছিস।'

বেড়ি একটা চীৎকার শুনতে পেলো কচি গলার। মানুষের প্রথম সাড়া। বেড়ি জোর করে চোখ মেলে তাকালো। দেখল, ছুটি লাল মাংসল ছোট ছোট পা, শূন্যে লাফিয়ে উঠছে।

চোখ থেকে সহসা রক্ত পড়ল বেড়ির। বেড়ি মারা গেলো।

ভবিষ্যতে হয়তো গয়ার পথে পথে ঘোরা কোন ভিখিরী, একদিন ঘুরতে ঘুরতে গয়ার প্রেতলোকে যাবে। গিয়ে তার নিজের মা হবার কথা ভাববে। ভাববে আমারও মা বাবা ছিল। আমার পিণ্ডদানের জন্য হয়তো তারা আজো এখানে আছে। মা! তুমি কি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ! বাবা! তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

আমি এক সময়ে, আমার কোনো রচনায় রজককে 'ধোপা' লেখায়, অনেকগুলো প্রতিবাদ-পত্র পেয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, ত্রিবেণী অঞ্চল নিয়ে লিখতে গিয়ে 'ধোপানীর পাট' লিখেছিলাম, কারণ সেখানে ঘাটে একটি বিশেষ চিহ্নিত স্থানকে উক্ত নামেই সকলে উল্লেখ করে থাকে, কথাটা আমার নিজের সৃষ্ট ছিল না।

ছেলেবেলায় আমি যে পাঠশালায় পড়তাম, সেই পাঠশালায় হেমন্ত নামে একটি ছেলে আমার থেকে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত, তথাপি ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল, অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যদের ছেলেদের থেকে অনেক বেশী। হেমন্ত ছিল রজক পরিবারের ছেলে, এবং ওর বাবা বংশগত বৃত্তির জীবিকাতেই জীবনযাপন করতেন। আমি অনেকবার ওদের বাড়ি গিয়েছি। আমার কখনো খারাপ লাগে নি, বরং আমি সেখানে একটি নতুন পরিবেশের স্বাদ ভোগ করতাম। হেমন্তের মা-ভগ্নীরা ঘাটে, পাটে কাপড় কাচতে যেতেন না, বাড়িতে ভাঁজ করা, ইস্তিরি করার কাজ করতেন, এবং হেমন্তর এক দিদি উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তেন, তাঁকে আমিও দিদি বলে ডাকতাম। এ-সব আমার শৈশবের, অধুনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের কথা।

এ সবের দ্বারা, আমি কোনো বৃত্তিগত শ্রেণীর বিষয়ে, কিছু আলোচনা করতে বসি নি। আমি জানি, বর্ণাশ্রম ভিত্তিক বিশ্বাসগুলো, আমরা দ্রুত কাটিয়ে উঠছি। শিক্ষা কর্মরুচি ইত্যাদির বিষয় বাদ দিলেও, বর্ণাশ্রমের যুগে, অর্থনীতির যে কাঠামো ছিল, আজ আর তা নেই, এবং তার ফলে, আমাদের বহুবর্ণ এখন আধুনিক চিত্রকরের চিত্রের মধ্যে যেন মিলে মিশে যাচ্ছে, আর শ্রেণী বলতে, অত্যন্ত তীব্র ভাবে দুটি শ্রেণীর রূপ নিচ্ছে। একটি গোটিক ধনী, আর একটি কোটিক গরীব। সেখানে বর্ণাশ্রম এখন কিছু কিছু বৃদ্ধ বর্ণশ্রেষ্ঠদের মধ্যে টিকে থাকতে পারে। তাও, যাঁরা বিজ্ঞানচর্চা করেন, তাঁদের মধ্যে না, দু'একজন সাহিত্যিক এবং কিছু গ্রাম্যদের মধ্যে।

থাক, শিবের গীত থাক, আমি বরং ধান ভানি, মূলে যা করতে বসেছি।

কলকাতা শহর থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে, ঘটনার স্থান। আমি জায়গাটার নাম বলতে চাই না। জায়গাটা শহর, শিল্পাঞ্চলের মফস্বল শহর যে রকম হয়ে

থাকে। আমার পাড়া থেকে অন্য পাড়ায়, একটু দূরে, একটি পরিবারে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। অবসর সময়ে প্রায়ই যাই। যাবার একটি ছোটখাটো আকর্ষণ আমাদের ঘিঞ্জি পাড়া থেকে, সেই পাড়াটা এখনো বেশ খোলামেলা। খোলা মাঠ, গাছপালা, আশেপাশে কয়েকটা পুকুর। সকালে সন্ধেয় গাছতলায় বসেও গল্পগুজব করা যায়।

অনেক দিনই দেখেছি, একটি পুকুরে, চার-পাঁচটি পাট, এবং একটি রজক পরিবার সেই পুকুরে কাপড় কাচে। একটিই পরিবার, বুঝতে পারি, মহিলা পুরুষদের সকলের মেলা-মেশা দেখে। যদি পুরোপুরি একটি পরিবার নাও হয়, তারা যে একই গোষ্ঠীভুক্ত পরিবার, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কাপড় কাচার ব্যাপারে, পুরুষ আর একটু বেশি বয়স্কা মহিলাদেরই দেখেছি। অন্যান্য মেয়েরা, যারা তরুণী বা কিশোরী, তাদের কাজ কাপড মেলে দেওয়া, শুকানো, তোলা, নানান ফাইফরমায়েশ খাটা, বাড়ি বা দোকান থেকে এটা-সেটা নিয়ে আসা।

এরা অবাঙালী, কিন্তু অবাঙালীত্বের আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। বাংলায় কথা বলে, বাঙালীদের মতোই বেশভূষা, আচার-আচরণ। আবার অনেক অবাঙালী রজক পরিবার দেখেছি, তারা কিন্তু অন্যরকম। পেশা এক-হলেও, তাদের আচার-আচরণ জীবনযাপন ভিন্ন রকম। কিছুটা স্থূল, অমার্জিত। আমি যাদের কথা বলছি, তারা নিঃসন্দেহে, তথাকথিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' বাঙালীদের মতো না, কিছুটা গ্রাম্যতা অবিশ্যিই আছে, এবং তাদের এক বৃদ্ধাকে দেখি, গাছতলায় বসে বসে, শিশুদের সামলায় আর ফুক ফুক করে বিড়ি টানে। এই বৃদ্ধার সম্পর্কে, প্রায়ই কিংবদন্তীর মত একটি কাহিনী সকলেই শুনেছে। কাছেই মুখুজ্যেপাড়া। মুখুজ্যেরা এককালে সম্পন্ন জমিদার ছিল। এখনো মুখুজ্যেদের পোড়ো ভিটার ছড়াছড়ি, ধ্বসে পড়া ভূতুড়ে জনমানবহীন ইমারত জড়িয়ে অশ্বত্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মুখুজ্যেপাড়া বললে, এখনো মুখুজ্যেদেরই বোঝায়। অনেকে কালের প্রবাহে অন্যত্র ভেগে গেলেও, অধস্তন বংশধরদের অনেকেই এখন নতুন বাড়ি করেছে। ব্যবসা চাকরি সবই করে। কারোর অবস্থা খারাপ, কারোর ভাল।

বৃদ্ধা রজকিনীর নাম উত্তমা। শোনা যায়, মুখুজ্যে পরিবারের এক পুরুষ রতন মুখুজ্যে। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রতি-পত্তিও ছিল বিস্তৃত। ব্রিটিশ সরকারের জেলা অফিসার আমলা পুলিস, মিল

কলকারখানার সাহেব সকলের সঙ্গেই তাঁর ওঠা-বসা ছিল। মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন একাধিকবার।

রতন মুখুজ্যের বয়স যখন চল্লিশ উর্ধ্বে, তখন উত্তমা ষোল-সতেরো। স্বামীর নাম গোবিন্। এ অঞ্চলের বাইরে, রেললাইন ঘেঁষে, রতন মুখুজ্যের হিস্যায় একটি পুকুর ছিল। উত্তমার শ্বশুর রতন মুখুজ্যের কাছে, সেই পুকুরে কাপড় কাচার অনুমতি চেয়েছিলেন। শ্বশুরের সঙ্গে, পুত্র আর পুত্রবধূ ছিল। উত্তমাকে দেখে, রতন মুখুজ্যের মনে হয়েছিল, উত্তমা না, তিলোত্তমা। উত্তমা তাঁর সামনে ঘোমটা টেনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ায় নি। বাঙালী ছাঁদে সস্তা ডুরে শাড়ি পরা বউটি, সমীহ দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। রতন মুখুজ্যে মদ্যপ ছিলেন, স্ত্রীলোক সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতার কথা কখন শোনা যায় নি, যদিও মুখুজ্যেদের অনেক পুরুষেরই সে দুর্বলতা বিলক্ষণ ছিল, যে কারণে, মুখুজ্যেপাড়ার কাছেই, একটি পারিবারিক বেশ্যালয়ই তৈরি হয়ে গিয়েছিল, এবং এখনও তা আছে। অবিশ্যি তা আর পারিবারিক বলা চলে না, মুখুজ্যেদের বর্তমান বংশধররা সেদিকে তাকিয়েও দেখেন না।

রতন মুখুজ্যে দিনক্ষণ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী কোন লগ্নে উত্তমা রজকিনীকে দেখেছিলেন, সে কথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু উত্তমাকে দেখা মাত্রই, তাঁর সমস্ত জীবনের রং বদলিয়ে গিয়েছিল। রজকের কাপড় কাচা পুকুরে, মাছ রক্ষা করা কঠিন। জলও নষ্ট হয়ে যায়। রতন মুখুজ্যে তথাপি উত্তমাদের কাপড় কাচার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু রেললাইনের সেই পুকুরে না, কারণ সেটা অনেক দূরে। তিনি তাঁর পাড়ার কাছেই, এই বর্তমান পুকুরে, কাপড় কাচার অনুমতি দিয়েছিলেন। তার জন্য কোন কর বা মূল্য ধার্য ছিল না।

কিছুকালের মধ্যেই, রতন মুখুজ্যে আর উত্তমার ব্যাপার আর শোনার পর্যায়ে ছিল না, ঘটনা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। রতন মুখুজ্যে উত্তমাকে মুখুজ্যে পাড়ার সীমানার মধ্যেই, জমি দিয়েছিলেন, পাকা দেওয়ালের ওপর টালির ঘর তুলে দিয়েছিলেন। এবং বর্তমান এই পুকুরটি ছাড়াও, অন্য আর একটি পুকুরেও কাপড় কাচার লিখিত অনুমতি দিয়েছিলেন। বর্তমান পুকুরটি উত্তমাকেই দানপত্র করে লিখে দেওয়া আছে।

উত্তমার স্বামী-শ্বশুর ব্যাপারটাকে কীভাবে নিয়েছিল, জানা নেই, কিন্তু কোন গোলযোগের সংবাদ ছিল না। রতন মুখুজ্যে নিজেই যেতেন উত্তমার গৃহে, নিজের গৃহে বা অন্য কোথাও আলাদা রাখেন নি। উত্তমা কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি-

স্বামীর সঙ্গে বরাবর কাপড় কেচেছে, পেশা কখনই ত্যাগ করে নি। ঢাকাই শাড়ির সঙ্গে, সামান্য কিছু অলঙ্কারে, উত্তমাকে তিলোত্তমাই দেখাত। সে ঘাটে এসে দাঁড়ালে, বয়স্ক পুরুষ বা ছেলে-ছোকরাদের ঘোরাঘুরি একটু বেড়ে যেত। তিলোত্তমার তাতে কিছু আসত-যেত না। সে বছরের পর বছর কাপড় কেচেছে, সন্তানদের জন্ম দিয়েছে। তার সন্তানদের মধ্যে কোন্‌টি কার, সে প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু তাকে কখনো রক্ষিতা বা স্বৈরিণী বলে মনে হত না। লোকে বলত, 'রতন মুখুজ্যের ধোপানী (রজকিনী মাফ করবেন) বিবি।'

পরবর্তীকালে, রতন মুখুজ্যের ছেলেরা, পুকুরের অধিকার নিয়ে, কোর্ট-কাছারিও করেছিলেন। কিছুই করতে পারেন নি। রতন মুখুজ্যে ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবেই করে গিয়েছিলেন, এবং মৃত্যুর আগে, সজ্ঞানে একবার উত্তমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। ছেলেরা রাজী ছিলেন না, কিন্তু রতন মুখুজ্যের স্ত্রী রাজী ছিলেন। তিনি স্বামীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। দীর্ঘজীবী রতন মুখুজ্যে পঁচাশি বছর বয়সে মারা যান, উত্তমা তখন আটান্ন-উনষাট, ঠাকুমা-দিদিমা হয়ে গিয়েছে।

বৃদ্ধা উত্তমা এখন সত্তরের ঊর্ধ্বে, বিধবা। বিড়ির নেশাটা সে কবে থেকে ধরেছে, কে জানে। তবে শুনেছি, কখনো, কেউ তার বেচাল দেখে নি, বাচালতা দেখে নি, বরং শরীরে রূপ আর যৌবনের ঢল নিয়েও, তার পরিশ্রমী জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিল। তার আচার-আচরণের মধ্যে ছিল একটা সম্ভ্রান্ত ভাব। আড়ালে যে যাই বলুক, সামনে দাঁড়িয়ে কোনদিন কেউ একটিও বাজে কথা বলতে পারে নি। এখন আমরা দেখলে, বুঝতে পারি, কর্তব্যরত এইসব রজক পরিবারের মহিলা-পুরুষদের, সে-ই সর্বময়ী কর্ত্রী।

প্রায়ই দেখি, আশেপাশের সমস্ত বাড়ির মহিলাদের সঙ্গেই, এরা কাজের ফাঁকে কথা বলে, গল্প করে, বাড়ির ভিতরেও যাতায়াত আছে। এখনকার চেহারা আলাদা। তরুণী মেয়েরা, যারা পুকুরে নানান কাজে আসে, তারা বেণী দুলিয়ে, কুঁচিয়ে শাড়ি পরে। দু-একজনের হাতে ঘড়িও দেখি। অবসর সময়ে, গাছতলায় বসে, পত্র-পত্রিকাও পড়ে। আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়েকে, একদিন, অতি আধুনিক লেখকের বইও পড়তে দেখেছি, এবং অবাক হয়েছি। পরে শুনেছি, ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ ইস্কুল-কলেজেও পড়ে।

আমার বিস্ময়টা সেখানে। ইস্কুল-কলেজে পড়াটা আশ্চর্যের না। কিন্তু বংশগত এই জীবিকার সঙ্গে, পাশাপাশি লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া রীতিমত

বিস্ময়কর। ছেলেবেলায়, হেমন্তর দিদিকে ইস্কুলে যেতে দেখেছি, কিন্তু, কর্মক্ষেত্র, পুকুরপাড়ের গাছতলায়। কাজের ফাঁকে, বেণী ঝুলিয়ে পা ছড়িয়ে বসে, রঙীন ম্যাগাজিন পড়তে দেখি নি। সমস্ত ছবিটা কি মনের মধ্যে একটা রোমান্টিক ভাবনা এনে দেয় না ?

প্রশ্নটা নিতান্তই বাহুল্য হয়ে গেল। আমার মূল গানটা সেখানেই। কালক্রমে এই পুকুরের নাম হয়ে গিয়েছে উত্তমা পুকুর, এবং উত্তমা পুকুরের ধারে যেসব দিনে উত্তমা পরিবার ভাটিতে আসে, সে সব দিন, অনেক ভোমরা আশে-পাশে গুনগুন করে। সেই সব ভোমরাদের মধ্যে, মুখুজ্যে-বাড়ির ছেলেরাও আছে এবং ভোমরার ডানা কাঁপানো গুনগুনানি, নিঃসন্দেহে রোমান্সেরই সন্ধানে।

রোমান্সের সর্ববিধ ধারালো অস্ত্রে যে সজ্জিত, সে হল উত্তমার বড়ছেলের ছোট কন্যাটি। শরীরের গঠনে, রূপে, সব দিক থেকেই সে তার পিতামহীকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। উত্তমার নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যা, এখন যার বয়স চল্লিশের মত, সে-ও কৈশোরে রীতিমত আলোড়ন তুলেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত তার বিয়ে হয়, শহরের বিখ্যাত সেন পরিবারের একটি ছেলের সঙ্গে। স্বাভাবিকভাবে বিয়ে হতে পারে নি, কলকাতায় গিয়ে বিয়ে করতে হয়েছিল, এবং সেনবাড়ির সেই ছেলে আর কখনো নিজের পরিবারে ফিরে আসে নি, চিরদিনের জন্য কলকাতাবাসীই হয়ে গিয়েছে। সেই জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম পূর্ণিমা। রতন মুখুজ্যের ছাপ ছিল তার চেহারায় স্পষ্ট।

উত্তমা পরিবারকে ঘিরে, গুনগুনানি কখনোই একবারে স্তব্ধ হয় নি। কিন্তু উত্তমা আর পূর্ণিমার পরে, সেরকম আলোড়ন তোলার মত ঘটনা ঘটে নি। ইদানীং মনে হচ্ছে, সেরকম ঘটনা আবার আসন্ন হয়ে উঠেছে। এবারকার মধুচক্র গড়ে উঠছে যাকে নিয়ে, ওর নাম সন্ধ্যা—সন্ধ্যামণি। নামটা সন্ধ্যামণি বটে, হয়তো সন্ধ্যালগ্নে জন্ম হয়েছিল, এবং কৃষ্ণকলি ফুলকে কেউ কেউ সন্ধ্যামণিও বলে, কারণ কৃষ্ণকলি সন্ধ্যাকালেই ফোটে। কিন্তু সন্ধ্যামণির গায়ের রংকে দুপুরের রং বলা যায়, যা উত্তমার ছিল, কিন্তু উত্তমার তুলনায় সন্ধ্যার আয়ত চোখের টান, উন্নত নাসা, দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট, কিছু কিছু রতন মুখুজ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। সন্ধ্যা সম্প্রতি ইস্কুল ফাইনাল পাস করে, এই শহরেরই কলেজে, প্রি-উনিভারসিটি শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। অতএব, কেবল মাত্র উত্তমা-পুকুরের ধারে না, সন্ধ্যা এখন গোটা শহরের ভোমরাদের পাখার ঝাপটায় বিলুলিত।

না, সন্ধ্যাকে ঠিক বিলুলিত বলা যাবে না। ওর কোন চাঞ্চল্য দেখা যায়

না। ওর চোখের দৃষ্টি অনেকটা দ্য ভিঞ্চির লুক্রেসিয়ার মত, ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিটা মোনালিসার ছবি মনে জাগিয়ে তোলে। মনের ছাপটা অস্পষ্ট হাসিতে তা প্রতিবিম্বিত হয় না। বাঁশের সঙ্গে টাঙানো দড়িতে ও যখন জামা-কাপড় মেলে দেয়, বাতাসে ওর আঁচল আর চুল ওড়ে, তখন ঘাটের ঊর্ধ্বে সুদখোর রসিক মিত্তির সেই দিকে তাকিয়ে, উত্তমাকে বলে, 'কেমন আছ গো উত্তমা ঠাকরুণ ?'

উত্তমা বলে, 'ওই আছি আর কি ঘাটের পথে পা বাড়িয়ে।'

বুড়ো রসিক মিত্তিরই যদি এমন রসস্থ হয়ে উঠতে পারে, তাহলে আর জামরুল গাছের তলা থেকে জোয়ান ছেলের ভরাট গলায় কেন গান শোনা যাবে না, 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে সে কি আমারি তরে'···

কিন্তু সন্ধ্যামণির ঠোঁটের কোণের হাসি যতই অর্থপূর্ণ অথচ অস্পষ্ট হোক, একদিন ঘোর দুপুরে আমি ওকে দেখলাম, উত্তমাপুকুর থেকে একটু দূরে, হরির পোড়ো নামক জঙ্গলের দিকে যেতে। যাওয়ার ভঙ্গীতে ছিল একটা ভয়-ত্রস্ত ভাব, এবং দ্রুত-গতি। চোখে মুখেও ত্রস্ত ভাবটা লক্ষণীয়। কেমন যেন সন্দেহ-জনক। ওকে আমার অনুসরণ করার কিছু ছিল না। কিন্তু যা চোখে পড়বার, ঠিকই পড়েছিল। হরির পোড়োর জঙ্গলের, ঝাড়ালো ছাতিম গাছের নিচে, নায়কটিকে দেখতে পেয়েছিলাম। নায়কটি আর কেউ না, রতন মুখুজ্যের চতুর্থ পুত্রের কনিষ্ঠতম সন্তান শ্যামল।

শ্যামলকে চিনি। কলেজে পড়ে, স্কুটারে করে ঘোরে, শহরের নানান অনুষ্ঠানে গীটার বাজায়। গালপাট্টা জুল্‌ফি আর চুলে ও গোঁফে এবং পোশাকে-আশাকে যাকে বলে পুরোপুরি মড ছোকরা। রজকিনী সন্ধ্যামণি তাহলে পিতামহী উত্তমার উত্তরসূরী হতে চলেছে! তিন পুরুষের ফেরতায়, আবার সেই মুখুজ্যে বংশেই আবর্ত ?

ব্যাপারটা জানাজানি হতে বেশি বিলম্ব হল না। কিন্তু যেটা আশা করিনি, এক্ষেত্রে ঘটল সেটাই। স্বয়ং উত্তমা এই প্রেমের ঘোর বিরোধী। মুখুজ্যে পরিবারের তো কোন প্রশ্নই নেই। উত্তমা তার পুকুরধারের ঘাটে স্পষ্টই বলে দিল, 'নাতনী কেটে গঙ্গায় ভাসাব, তবু এমন পাপ ঘটতে দেব না।'

পাপ কিসের ? তাও উত্তমা জানিয়ে দিল, 'মুখুজ্যেবাড়ির কোন ছেলে-মেয়ের সঙ্গে, আমার কোন ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীর বিয়ে হতে পারে না। রক্তে আমি পাপ ঢোকাতে পারব না।'

অতঃপর পুকুরধারের ভাটিতে, সন্ধ্যার আসা বন্ধ হয়ে গেল। অতএব ঘটনা চলে গেল নেপথ্যে, আমাদের চোখের আড়ালে। লোকমুখে শোনা গেল, শ্যামল বাড়িতে বিদ্রোহ করেছে। ও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, সন্ধ্যাকে বিয়ে করবেই। বাড়ির পরোয়া ও করে না। উত্তমা বেশি বাড়াবাড়ি করলে, তাকে নাকি উত্তমা-পুকুরেই ডুবিয়ে মারবে।

তার জবাবে উত্তমা পুকুরধারেই দাঁড়িয়ে বলেছে, 'অমন ছেলেকে আমি পাটে আছড়ে মারব। ও যেন ভুলে না যায়, আমি কে।

ব্যাপার যখন এই রকম চূড়ান্ত পর্যায়ে, এবং উত্তেজনা চরমে, তখনই নাটকের শেষ অঙ্ক নেপথ্যেই শেষ হয়ে গেল। অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে সন্ধ্যামণি আত্মনাশ করেছে, এবং একটি চিঠি সে লিখে রেখে গিয়েছে, 'মরা ছাড়া আমার উপায় নেই। ঠাকমা বলে, শ্যামলের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া পাপ। আমি পাপ-পুণ্য বুঝি না। শ্যামল ছাড়া কারোকেই আমি চাই না। তবে আর আমি কেন বেঁচে থাকব। আমি মরলাম, তার জন্য কেউ দায়ী না।'…

পুলিস তথাপি মৃতদেহ ময়না-তদন্তের জন্য মর্গে পাঠাল, এবং আত্মহত্যা প্রমাণিত হল। শহরে বাবরি চুল উড়িয়ে, কানের পর্দা ফাটিয়ে, শ্যামলকে আর স্কুটার চালিয়ে ঘুরতে দেখা গেল না। শোনা গেল, রজকিনী প্রেম তাকে দেশান্তরী করেছে।

ভাটির দিনে, পুকুরধারের গাছতলায় এখনো উত্তমা বৃদ্ধাকে দেখা যায়। বয়স বোধ হয় আশীর ওপর হল। চোখে ছানি পড়েছে, ভাল দেখতে পায় না। বিড়ি টানে বসে বসে, শিশুদের তেমন আগলাতে পারে না। কিন্তু তার ছানি-পড়া চোখ যখন দূরের আকাশে নিবদ্ধ থাকে, মনে হয়, সেখানে কালের ছবি নানারূপে খেলছে। মাঝে মাঝে তাকে বিড়বিড় করতে শোনা যায়, 'কি করব, সে যে মহাপাপ হত। তুমি তো জানো, তুমি তো সবই জানো হে।'…

কবি চণ্ডীদাস ভরদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন কী না, মনে করতে পারি না। সম্ভবত তাই ছিলেন। এটা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল কী না জানি না, কিন্তু মনে হয়, শ্যামল আর সন্ধ্যা যেন সেই পুনরাবৃত্তিরই একটা ঘটনা। সন্ধ্যা আত্মহত্যা করেই যেন সেটা বিশেষভাবে প্রমাণ করে গেল।

বাসিনীর খোঁজে

তা বউ একখান আমারও চাই।

কথাটি বলে মাথায় একটি ঝাঁকি দিয়ে ঘাড় শক্ত করে গোঁজ হয়ে বসেছিল পবন। যেন ও দাবি থেকে সে এক পাও সরতে রাজী নয়।

বউ?

মেয়েদের উদ্গত হাসিটা খিলখিল করে ফেটে পড়েছিল বাঁধের গায়ে। বাঁধের কিনারে কিনারে লকলকে ঝাড়ালো কালচে গেমোবনও বাতাসের ঝাপটায় হেসে কুটিপাটি হয়েছিল।

কেন, সকল মানুষের হতে পারে, আর আমার হতে পারে না?

গোঙা গোঙা মোটা স্বরে কথাটি বলে পবন খুব গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। যদিও মাথা নত ছিল, তবু পিটপিটে চোখে মেয়েদের পর্যবেক্ষণে বিরত ছিল না সে। কেননা, ও-মেয়েদের ওপর খুব ভরসা পবনের ছিল না। সারাদিন পরে নদীর ওপার থেকে ফিরছে জোতদারের খেয়ায়। রোয়া বোনা ভেজা-হাজা কোমর টাটানি গেছে সারাদিন ওপারের রাক্ষুসে বাদায়। তারপর কিসের থেকে কি হবে। দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামরে-খামচে ছিঁড়ে-কুটে রেখে গেলেই হল। পরে তোমারটা তুমি বোঝ।

তবে কথা কী? না, পবনেরও ইজ্জত আছে একটা। সে একটা ড্যাইভার মানুষ। বাদার এই বন শোরমারি থেকে মহকুমা শহর পর্যন্ত একমাত্র যাত্রীবাহী গাড়ির সেই চালক। আর তো সব ধান চাল পাট সবজী গরু ছাগলের লরী যায়।

তাছাড়া আরো কথা কী, না, মেয়েরা যদি তোমাকে ওস্‌কায়, সত্যি কথা বলতে দোষ কি? তারা দল বেঁধে রোজ যাবে, আর তোমাকে দেখে সব হাসবে। বলবে, অই গো, অই দেখ, গালে হাত থে আবার বইসে আছে।

তা হাতটা তখন কোথায় দেবে পবন? যখন সন্ধ্যা নামতে থাকে ঘনিয়ে। নদীটা যেন পশ্চিমের লাল ছায়া পড়ে কেমন হয়ে যায়। ওপারের পাখিগুলি এপারে আসে। এপারেরগুলি যায় ওপারে। মশারা ফিরতে থাকে গুনগুনিয়ে।

গেমো বন কালো হতে থাকে। সংসারে একলা মানুষটার সেই নালটন গাড়িটার আঁধারি কোটরে বসে, তখন হাত তার কোথায় যায় ?

আবার বলবে, ও মা গো, অই দেখ আবার কেমন দমাদম নিশ্বাস পড়তে লেগেছে। বলেই হাসি।

তা নিশ্বাস পড়তে পারে। সংসারের একলা মানুষ। অমন ঝুকো ঝুকো সন্ধ্যায় তার চোখ জোড়া অবশ্য ওপারেই পড়ে থাকত। কখন সেই নৌকাটি ফিরবে। মেয়েরা যাবে সেই ভোরে, ফিরবে সন্ধ্যায়। তাদের দেখবার জন্য চোখদুটি তার আতুর হয়ে থাকত। কিন্তু কোনোদিন ডেকে তো কিছু বলেনি। আর সে-দেখা কি কাকপক্ষীতেও কোনোদিন টের পেয়েছে। তা বলতে পারবে না।

কিন্তু মেয়েরা দুদিন দেখে, চারদিন দেখে হাসতে আরম্ভ করলে। হাসির পরে ওই কথাগুলি। তবু পবন যেন কিছুই জানে না, এমনি উদাসীন হয়ে বসে থাকে।

হাসির রোলটা তখন বাড়ে বৈ কমে না।

তারপরে সেই একদিন, মেয়েদের দলের মধ্যে একজন পা বাড়িয়ে দু পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, অই ড্যাইভার অই, রোজ রোজ কি দেখ চেয়ে চেয়ে!

এই দেখ। দাঁড়িয়ে পড়ল যে মেয়েরা ? চেয়েছিলাম চোখে, মনের কথা টের পাওয়া যায় নাকি সেখানে! তা খেপলেই বা কি করা যাবে। অন্যায় তো কিছু করেনি পবন। তবু সাবধানের মার নেই। সে নালটনের জিরজিরে স্টীয়ারিং হুইলটার কাছ থেকে একটু একটু করে সরে এসেছিল। কারণ ওই হুইলের ওপরেই তার কনুই ছিল। হাত ছিল গালে। বলেছিল, দেখব আবার কি। এই বইসে আছি।

কিন্তু মেয়েদের সেদিন নড়বার নামটি নেই। উপরন্তু হাসি। দলের ধাড়ি সেই মেয়েটিই বলেছিল, তা বইসে থেকে কি হয় ?

বোঝ ? বসে থেকে কি হয়। কথাগুলি কেমন বাঁকা বাঁকা নয় ? একদম বিশ্বাসযোগ্য নয় এ হাসি। ওসব বাদার খাটা মেয়ে। মেজাজের কিছু বোঝা যায় না।

পবন খুব ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলেছিল, কি আর করব ?

অগ্রবর্তিনী তবু ছাড়েনি। দক্ষিণের এ বাদাবনের মতো গায়ের রং। মেঘলাভাঙা রোদের চলকানি তাতে। চোখ দুটিও ভেড়ির জলের মতো কালো। ফুট্ করে বলেছিল, পুরুষরা যা করে।

পুরুষরা যা করে! পুরুষরা কী করে ? কয়েক মুহূর্ত গায়ের মশা তাড়াতেও

ভুলে গেছল পবন। তার গোঁফদাড়িহীন কালো মুখে গুটিকয় রোঁয়া কেঁপে উঠেছিল। হলদে চোখের দৃষ্টি কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছল। আর হাঁ হয়ে যাওয়া মুখে ভাঙা দাঁতের ফুটোয় অস্পষ্ট অন্ধকারের মতো মনের জবাব যেন আঁকুপাঁকু করছিল তার। তারপরে সে বেশ সাব্যস্ত করেই জবাব দিয়েছিল, তা' বউ একখানা আমারও চাই।

বউ ?

মেয়েরা হেসে বাঁচেনি। পবনের পরের জবাবটা শুনেও মেয়েরা পিছোয়নি। বরং সেই মেয়েটি, মাথায় যার কাপড় ছিল না, আঁটো শরীরের কোমরে যার ঠাটে হাত দেওয়া ছিল, সে চোখ ঘুরিয়ে বলেছিল, তা এই দলের মধ্যে কাউকে পছন্দ নিকি ?

এই সময়ে দলের মধ্য থেকে কে একজন চাপা স্বরে ডেকে উঠেছিল, অই, অই বাসিনী।

পবনের বিভ্রান্তিটা তখনো যায়নি। কিন্তু কালো তালতোবড়া মুখের ভাঁজে ভাঁজে, হলদে চোখ দুটিতে তার একটি অবাধ্য অপরূপ হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই যে বাসিনীর দিকে গুটি গুটি ল্যাজনাডাভাবে তাকিয়েছিল, আর চোখ ফেরাতে পারেনি।

কে যেন দল থেকে বলেও ছিল, তা এ দলের সকলের ঘরেই যে পুরুষরা খুঁটি গেড়ে আছে গো।

পুবে বাতাস-লাগা বাঁধের গেমো গাছের মতো দুমড়ে গেছল বাসিনী হাসতে হাসতে। তারপর চলে গেছল।

কিন্তু বাদার মশারাও সেদিন পবনের রক্ত খেয়ে খেয়ে এলিয়ে পড়েছিল। পবন আর নড়তে পারেনি। এবং সেই যে তার বিশ্বাস জন্মেছিল, বাসিনীর সঙ্গে তার প্রেম হয়েছে, সে বিশ্বাস থেকে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে টলাতে পারেনি। ইতিমধ্যে বাসিনীর, এক ছেড়ে দুই সন্তানের মা হবার সম্ভাবনাও বুঝি দেখা দিয়েছে। তবু পবন অটল।

আজ পবন বাসিনীকে খুঁজতে যাচ্ছে কলকাতায়। বাসিনীরা পরশু ভোর ভোর কলকাতায় চলে গেছে। পরশু রাত্রেই ফিরে আসার কথা ছিল। কাল রাত্রেও আসেনি। আজকে রাতেরও দেরি নেই আর।

শোরমারির মাঠে-খাটা মেয়ে-পুরুষ, কৃষিমজুরেরা ঝাঁটিয়ে চলে গেছে

কলকাতায়। বলে গেছে মন্ত্রীদের অফিসে যাচ্ছে চালের দাম কমাবার জন্যে। গঞ্জের আড়তদারেরা বলে চাল নেই। এদিকে দেখ, আড়তদারের মনের মতো দাম দিলে যত চাও পাবে। দর-দামের বালাই নেই। যা বলে তাই। তাহলে রোজের খাটনির পুরো পয়সাটা শুধু চালেই দিতে হয়। তাতেও কুলোয় না। তার ওপরে সময়টি দেখ। রোয়া-বোনা সারা। জোতদারের কাছে আগামে নেওয়া পয়সায় খেতে হচ্ছে। আদিবাসীগুলি পয়সাও নেয় না। ভাত খাবে বলে মালিকের কাছে চাল ধার করছে। সেই চালে হাঁড়িয়া তৈরি করে, বৃষ্টি নেই বাদলা নেই, বাঁধের ওপর বসে বসে খাচ্ছে, তারপরে দেখ দুদিন সাড়া নেই। কিন্তু জোতদারের চালের দাম বেশি বৈ কম নয়। আর ওপরে সুদ আছে। এ অবস্থায় দাম না কমালে চলে? পবনের অভিমত আদিবাসীরাই খুব ভালো আছে। সে তো পরশুদিন দুপুরে ভাত খেয়েছিল সেই মহকুমা শহরে। কাল আর হয়নি। পেট্রলের পুরো দাম তোলাই মুশকিল ছিল। আজো তাই। কিন্তু তা বলে খায়নি কি? ফুলুরি কি খাবার নয়? মুড়িও কিছু মিনিমাগনা পাওয়া যায় না। আর চা?

নালটনকে দাঁড় করাতে হল পবনের। চায়ের কথাটা যখন মনেই পড়ল, আর মহকুমা শহরের মুখে যখন নিরালা দোকানটা পাওয়াই গেল, হয়ে যাক এক পাত্র।

সন্ধে বুঝি হয় হয়। পবন নেবে এল গাড়ি থেকে। হলদের ওপর কালো ডোরা গেঞ্জি। সেটি দোকান থেকে কিনে মাস কয়েক আগে সেই যে গায়ে দিয়েছিল আর বোধহয় খোলা হয়নি। খাকি হাফ প্যান্টটার বুঝি আসল নেই। বয়সও নেই। তেলকালির তো অভাব নেই-ই। তলা ছিঁড়ে ফুঁপড়ি বেরিয়েছে অনেকদিন। কোমরে বাঁধা আছে গামছা। লম্বা, নয় বেঁটে নয়, মাঝারি লম্বা পবনের কালো শরীরে হাড়মাংস কতখানি আছে বোঝা মুশকিল। কিন্তু বাদার নামিতে কালো মাটির বুকে অজস্র নদী-নালা খাল-বিলের মতো মোটা মোটা শিরা-উপশিরার ছড়াছড়ি। মুখের সঙ্গে ক্ষুরের চিরদিনের অ-বনিবনা। তবু সাফ-সজুত কালো মুখ। প্রথম তেলে-পড়া ফুলুরির মতো রং দুটি চোখের। চুলগুলি বড় রাখার শখ, কিন্তু তেল জল দেবার সময় নেই।

দেওয়া হয় না কেন? সময় কই? কেন সকালে বেলা নটা পর্যন্ত। দুপুরে মহকুমা শহরে, চারটের পর শোরমারিতে।

ওই খালি করুক পবন। জিরুবার আর দরকার নেই, না? শোরমারির গাড়ি চালায় বলে পবন ড্যাইভার নয়? নালটনটা কি মটরগাড়ি নয়?

ওইটি বলো না। তা হলে সব পীরিত চটে যাবে।

নালটন নাম কেন? তা জানে না পবন। নালটন আগে চালাত ফজল মিয়া ইটিণ্ডাঘাটে। খুলনায় যাতায়াত ছিল। পবন ছিল ফজলের শাগরেদ। গাড়ি চালানোটা ওই গুরুর কাছেই শেখা।

তারপর ফজল চলে গেছে পাকিস্তানে। নালটন অনেকদিন কেনা পড়েছিল বসিরহাটের অনাদি ঘোষের কাছে। শোরমারি থেকে মহকুমা শহরে তখন কোনো সার্ভিস ছিল না। তত্তাদনে নালটনের লাল রংও কালোটন হয়ে গেছল। আর এখনো সেই কালোটনই আছে। থাকুক। ফজল বুড়ো হয়ে গেছে, দাঁত ঝরে গেছে। ফজলের নাম বদলায় নি।

লোকেরা ধরল অনাদি ঘোষকে। শোরমারির ওপারে, দক্ষিণ ঘেঁষে ঝিলে-নগর গঞ্জ। বড় গঞ্জ, সপ্তাহে দুদিন হাট হয়। উত্তরের লোকদের লঞ্চ ছাড়া গতি নেই। সার্ভিস একটা হোক না।

হবে? হোক! লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে। লোকসানের ব্যাপার। ভালো গাড়ি দেওয়া যাবে না। তাই নালটনের গতি হল। কিন্তু চালাবে কে? যে দুপয়সা করে খাবে, সে কেন শোরমারির লাইনে যাবে? অনাদি ঘোষ লাভ চান না। হলে ভালো। কিন্তু পয়সা খরচ করতে রাজী নন। এমন চালক কে আছে যে সপ্তাহে দুদিনের ওপর ভরসা করে ও-লাইনে পড়ে থাকবে?

থাকবে একজন। পবনচন্দর মৈত্তির। এ মৈত্র-ধারায় বরেন্দ্র রক্ত খুঁজতে গেলে চলবে না। জাতের নাম নাকি ছিল লোধা। আদিবাসভূমি বুঝি ছিল পশ্চিম-মেদিনীপুরে। তারপরে বাদায় পবনের বাবা এসেছিল গোসাবায়। পবন ইটিণ্ডাঘাটে। সেই শুরু, আর এই গতি।

আজ সে বাসিনীকে খুঁজতে চলেছে কলকাতায়।

মোটা মোটা ঠোঁট দুটি কেমন একটা দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন বিরক্তিতে উল্টে গেছে পবনের। পায়ের টায়ার-কাটা স্যাণ্ডেলে যদিও খট্‌খট্ করে শব্দ হয় না, কিন্তু ওই ভঙ্গিতেই হেঁটে গিয়ে দোকানে ঢুকল পবন। বলল, চা দ্যাও দিনি এ্যাট্টা।

দোকানী বলল, চললে কম্‌নে?

কলকাতা।

দোকানী চা করতে করতে পবনের বিরক্তগম্ভীর মুখের দিকে বারকয়েক তাকিয়ে নিল। বলল, কলকাতায় যাচ্ছ কি? সেখানে তো বড় হাঙাম।

শিরাবহুল সরু ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে, খুব গম্ভীর মুখে একটা বিড়ি বার

করল প্যান্টের পকেট থেকে। কানের কাছের নিয়ে টিপে টিপে তাজা তামাকের মড়মড়ানি শুনল। ফুঁ দিল, শুঁকল, তারপর কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে। কিন্তু ধরাল না। বলল, হাঙাম বলেই তো যেইতে হচ্ছে। নইলে কি যাই নাকি? কি কাণ্ড বল দিনি?

দোকানী চা দিয়ে বলল, নয়? আরে বাপ্ রে। এত দাম চালের—

মেলা ফ্যাঁচফেচিও না তো। মেলা ফ্যাঁচফেচিও না। ও কথাখানি তোমার চে আমি বেশি শুইনেছি বুইলে।

অ!

হ্যাঁ।

বিকৃত মুখে চায়ের গেলাসে চুমুক দিল পবন। ভাবল কি রকম লোক এরা? পবন কি না খেয়ে বাঁচে নাকি? কথাবার্তা নেই, চালের দাম। চাল ছাড়া কিছু খাবার নেই?

দোকানী বুঝল নালটনের ড্যাইভারের মেজাজ খুব সুবিধের নেই।

নেই সেটা কে বুঝবে? বুকের মধ্যে একটা কেমন করছে। সেটা যে কী জিনিস, সে নিজেও জানে না। থেকে থেকে কেবল বাসিনীর মুখটা মনে পড়ছে। ওই সেই মুখটা। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি আর অপলক চোখ। গেযোবনের ছায়া-পড়া নদীর জলের মতো কী যেন থাকা-না-থাকার কোনো হদিস না পাওয়া চোখের চাউনি।

সেই মুখখানি মনে পড়ছে আর বুকের মধ্যে কেমন যেন লাগছে। তার হাসতে ইচ্ছে করছে না, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। পথ চেয়ে তার দিন কাটছে। সে তো আর কিছু চায় না। ফিরে আসবে বাসিনী, এসে আবার কাজকর্ম সংসার করবে ফটিকের সঙ্গে। মিটে গেল।

অবিশ্যি আছে, আরো ব্যাপার আছে। পবনের সঙ্গে আছে বাসিনীর, মানে ভাব ভালবাসা বলতে যা বোঝায়। সেটা শুধু পবনই জানে না, শোরমারির ঘাটের আশেপাশে যারা থাকে তারা জানে বৈ কি।

ঘাটে একটা ছোটো চায়ের দোকান আছে। দোকানদারের নাম কালো। পবনই তার সবচেয়ে বড় খদ্দের। আর সারা রাতের সঙ্গী। যদিও নালটনই পবনের একমাত্র বাসস্থান। তবু মাঝে মাঝে দোকানেও থাকতে হয় বৈ কি। ঝড় এলে নালটনের ভিতরে জল যায়, আর দোলে।

কালো বলেছে পবনকে, বাসিনী মরেছে, বুইলে হে পবন।

মরেছে ?

মরেছে, মানে তোমাকে বাসিনী মনে মনে ইয়ে করে আর কি, বুইলে না ?

আর বলতে হয় নি। এইতেই বুঝে নিয়েছে পবন। ওসব তো বেশী ভেঙে বলতে হয় না। খাঁটি জিনিস, একটু ছাড়, তা হলেই বোঝা যায়।

পবন বলেছে, তা'লে তুমোও বুয়েচ ?

পবন আপন মনেই হেসে ঘাড় দুলিয়েছিল। কেবল তার পরদিন বকে ধমকে জিজ্ঞেস করেছিল বাসিনী, কী বলেছ আঁ, কালোকে কী বলেছ কাল রাতে ?

পবনের ভাঙা দাঁতের ফাঁকে জিভটি আটকা পড়ে গেছল। কোন জবাব দিতে পারে নি। সেই প্রথম দিনের মতোই তাকিয়েছিল অসহায় হয়ে। যদিও ভয় করছিল বৈ কি।

কিন্তু একদম হাসেনি বাসিনী। জবাব না নিয়ে সে ছাড়বে না। বলেছিল, অমন মুল্‌মুল্‌ করে তাকুকে রইলে যে বড় ? কী বলেছ বল।

সেদিন অবশ্য মেয়ের দল ছিল না। কারণ, ওপারের কাজ তখন বন্ধ। বাড়ি থেকেই এসেছিল বাসিনী। ঘাট থেকে তাদের পাড়া তো চোখের পলকের পথ। শোরমারির ঘাটপাড়া-ই বলা যায়।

অবশ্য এদিক ওদিক দু-চারজন মেয়ে-পুরুষ আড়ি পেতে ছিল। পবন টের পায় নি। সে বলেছিল মুখ কাঁচুমাচু করে, বলে ফেলেছি।

বলে ফেলেছ ?

বাসিনী হাত তুলবে কি না সন্দেহ হচ্ছিল। নাকের নাকছাবিটা তার ফুলছিল। চোখে চোখ রাখা যাচ্ছিল না।

পবন আবার মুখ করুণ করে বলেছিল, হ্যাঁ, বলে ফেলে দিইচি।

আর একবার ধমকে উঠতে গিয়ে বাসিনী খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, মরণ, মুখে আগুন তোমার, বুইচ ?

পবন বলেছিল, হ্যাঁ।

বাসিনী হাসতে হাসতেই চলে গেছল। শুধু শোনা গেছল, একি মরণ গো!

নালটন চালিয়ে দিল পবন। শব্দটা একটু বেশি হয় নালটনের। গায়ের হাড়-পাঁজরার শব্দই বেশি। তলার সাইলেন্সিয়ারটাও ভেঙে গেছে খানিকটা। অ্যাকসিডেন্ট গোরুর গাড়িই বেশী করে নালটনের সামনে! বলদগুলির বোধ হয় কান ঝালাপালা হয়ে যায়। ওরা তো আর কানে হাত দিতে পারে না। একেবারে

মাঠে নেমে যায় বিরক্ত হয়ে। গাড়িওয়ালা চাষারা গালাগাল দেয় শুধু পবনকে। গালাগালগুলি খুবই খারাপ। কিন্তু নালটনের দোষ নিজের গায়ে পেতে নিতে হয় তাকে।

মহকুমা শহরটা ছাড়িয়ে, আকাশের দিকে একবার ফিরে তাকাল পবন। রাত্রি নামতে হয়তো একটু দেরি আছে এখনো। কিন্তু মেঘ বোধহয় কথা শুনবে না। পুবে আকাশটা যেন যত বাজে মাল খারিজ করছে। ঝরল বলে।

কিন্তু জায়গাটা চেনাই মুশকিল। যেখানে নাকি বাসিনীরা এখনো আছে। মহকুমা কোর্টে একজন তাকে বলেছে, কলকাতায় কী একটা জায়গায় সব জমা হয়ে আছে বাসিনীরা। লাঠি-গুলিও নাকি মেরেছে খুব। কিছু নাকি মরেছে।

কিন্তু বাসিনী কি মরেছে? মরলে শুধু শুধু পবনের মন টানবে কেন? ওই জমে থাকা দলের মধ্যেই আছে বাসিনী। ডাকলেও আসতে চাইবে না, কিন্তু পবন ছাড়বে না। আর পেট্রল কিনে যে-কটি টাকা বাড়তি আছে, তা দিয়ে কলকাতার হোটেলে খেতে হবে। একলা নয়। বাসিনীর সঙ্গে। এখন বাসিনী রাজী হলে হয়।

রাজী করাতে হবে। সেইদিনের ধমক-ধামকের পরও রান্না কচুর শাক তো খাইয়েছিল বাসিনী। ফটিক নিজে এসে দিয়েছিল। অর্থাৎ বাসিনীর স্বামী। বড় রাশভারী লোক। এসে বলেছিল, এই নাও। ওই কর। নালটনের মধ্যে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাক, আর পরের বউয়ের হাতের ঘণ্ট চেয়ে চেয়ে খাও।

কথার আর প্রতিবাদ করতে সাহস করেনি পবন। কিন্তু পবন বাসিনীর কাছে খেতে চাওয়ার সাহস দেখিয়েছে কবে?

ফটিক আবার গম্ভীর গলায় বলেছিল, তা বাড়ি যেইয়ে খেয়ে এলেই হয়। ড্যাইভার হয়েছ বলে কি বয়ে নে্য আসতে হবে?

পবন চুপ। ফটিককে মারছিল না কেন, সেইটিই আশ্চর্য লাগছিল তার। তারপর বাসিনীর সঙ্গে যাই দেখা হয়েছিল সে জিজ্ঞেস করেছিল, খেয়েছ?

পবন একটি গূঢ় হাসি হেসে বলেছিল, হ্যাঁ।

তবু বেঁচে আছ?

কেন?

বাসিনী খিলখিল করে হেসে বলেছিল, ওমা! বুনো বিষকচু দিইছিলাম যে। গলা বুক জ্বলে দাপাদাপি করবে বলে।

পবনের গূঢ় হাসিটা আর থাকেনি। তার হলদে চোখের গূঢ় তলে একটি হাসি-মাখা অসহায়তা থমকে আড়ষ্ট হয়েছিল।

কিন্তু সেই বাসিনীর গোরুর বকনা বাচ্চা হয়েছিল বলে, বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেছল। বাতাসা খাইয়েছিল। আর আসন দিয়ে বলেছিল, বস এট্টু, খালি তো নালটনেই ঠ্যাং তুলে বসে থাক।

তা বাসিনী যদি আসন পেতে বসতে দেয়, পবন তার সারা সময়টা কেন নালটনে গিয়ে বসে থাকবে।

কিন্তু আর কোনোদিন ডাকেনি। পবন সাহস করে গেছল, বাসিনী বসতেও দিয়েছিল। কথাও বলেছিল। কিন্তু সেই হাসিটি কোনোদিন যায়নি বাসিনীর। যে হাসিটার দিকে চিরদিন ধরে চেয়ে রইল পবন। আর ফটিক কখন কি বলে বসে, সে ভয়টা থাকত।

ফটিক যখন বাসিনীকে মাঝে মাঝে মারধোর করে ফেলত, এই অভাব অনটনের সময়েই অবশ্য, শুনে পবনের মুখ অন্ধকার হত। কিন্তু বাসিনীর সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, ঠোঁটে আর চোখে সেই গেমোবনের ছায়া-পড়া নদীর জলের মতো কী যেন থাকা না-থাকা হাসি হারায়নি।

কিন্তু পবনের বুক তবু টাটিয়েছে। তবে ফটিকের বউকে ফটিক মারবে, পবনের কি? তার তো বউ নয়। যা আছে তা তারই আছে। সময়ে সময়ে সন্দেহ হয়। বাসিনীও জানে কিনা সেটা।

জানে না কি? জানে বোধ হয়। মনটা কি তার এমনি এমনি এরকম করে। তবে জিজ্ঞেস করবার জো নেই।

সেই একদিন গঞ্জ থেকে ফিরতে সন্ধে উতরে গেছল বাসিনীর। হাটের দিন ছিল না। শোরমারীর ঘাট নিরালা ছিল। বাসিনীকে একলা দেখে কাছে যাবার অদম্য বাসনাটা চাপতে পারেনি।

সে কাছে গিয়ে খুব চাপা গলায় ডেকেছিল, বাসিনী।

বাসিনী থমকে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, কে? মোটরঅলা!

গলার স্বর নামতেই থাকছিল পবনের, হ্যাঁ!

অমন করে কথা বলছ কেন?

বলে অন্ধকারের মধ্যে কী দেখেছিল বাসিনী, কে জানে। হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিল, খবোদ্দার। আর এক পা এগুবি তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

বলেই সে পিছুতে আরম্ভ করেছিল পায়ে পায়ে। তারপরে এক ছুটে পাড়ার মধ্যে। পবন শুধু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কী হল? কেমন একটা থমকানো অবাক অস্বস্তিতে সারাটা রাত কেটেছিল তার।

তার পরদিনই সেই বাসিনী ফটিকের সঙ্গে মহকুমা শহরে গিয়েছিল। কিন্তু ফটিকের কাছে বসেনি। সারাটা পথ পবনের পাশে বসে গেছে। নালটন সেদিন মাটি দিয়ে চলেছিল কি না, মনে নেই পবনের।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। পথ বড় নিঝুম লাগছে। নালটনের হেডলাইটের আলোয় শুধু শেয়ালের দেখা পাওয়া যাচ্ছে রাস্তায়—পথ তারা ছেড়ে দিচ্ছে বটে। ভাবখানা, মানুষের মতো সরে একটু পাশ দিচ্চে কেবল।

স্পীড্ বেশি দিলে কী একটা খুলে পড়ে যাবে, সেই ভয় পবনের। মাঝপথে আটকে থাকার চেয়ে যেতে পারাটাই লক্ষ্য তার। সেইদিকে খেয়াল রেখে চালাচ্ছে। অবশ্য উড়োজাহাজের ইস্টিশনের আলোটা দেখা যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু দেখাই যায়, কাছে আসতে চায় না যেন।

কিন্তু বাসিনীকে একটু বকবে পবন। মেয়েমানুষের এত রাগ ভালো নয়। এর আগেও একবার কলকাতায় গিয়েছিল বাসিনী। একলা নয়। এবারের মতোই সেবারও শোরমারীর সবাই দল বেঁধে। শুধু কি শোরমারীর নাকি? মহকুমার কেউ কি বাদ ছিল। নদীর ওপার থেকেও কত লোক গেছল। এবারও তাই গেছে।

সেবার বলেছিল বাসিনী, কলকাতার লোকেরা নাকি ওদের পথে আদর করে ডেকে খাইয়েছে। রুটি আর ভাতের পাহাড়ে ডাঁই। আবার নাকি ফুলের মালা দিয়েছিল ওদের সবাইকে। সেই শুকনো মালাটি আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছল বাসিনী।

এ সব বিষয়ে মানা করেছ তো গেছ। বাসিনীর সঙ্গে তোমার চিরদিনের জন্য চটে গেল ভাব। বলে, গতরে খেটে খাব, তারো জো নেই। ঘরে বসে থাকি কেমন করে? বাবুদের কানের সামনে না গিয়ে বললে যে বাবুদের কানে যায় না, তাই যেতে লাগে।

রাস্তায় যেন একটু ভিড দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ধারে ধারে লোকজন জটলা করছে। দমদম রেললাইনের পুল দেখা যাচ্ছে। সব আলোগুলি জলেনি।

কিন্তু কোথায় বাবা সেই সব লোকেরা, যারা বাসিনীদের খাওয়াবার জন্যে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। খাবারের চ্যাঙাড়ি চুপড়ি কিছুই তো দেখতে পাচ্চে না পবন। মুখ বাড়িয়ে দেখল আশেপাশে। তার দিকে কেউ ফিরেই দেখছে না। ফুলের মালার দরকার নেই। খান দুয়েক রুটি আর একটু ঘ্যাঁট হলেই এখন চলে যেত।

সামনের দিকে তাকাল পবন। আবার রাস্তাটা খালি খালি লাগছে। এখনো তো বাঁদিকে একটা মোড়, তারপরে সেই বড় একটা পুল। সেটা পার হয়ে আর একটা বড় পুল। তারপরেই খাস কলকাতা বলা যায়।

লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে কি আর বলে দেবে না। অতগুলি মেয়ে-পুরুষ কোথায় জমা হয়ে আছে ?

ওহো, অনেকদিন কলকাতায় আসেনি পবন! আজকাল তো পুলিশ আবার হাত দেখায় না। লাল নীল আলো দেখায়। লালে থাম, নীলে যাও। তাই তো ? না কি জানি! যাকগে, খালি তো নালটন আর পবন নয়। হাজার হাজার আছে ওরকম কলকাতায়।

অবিশ্যি নালটনও কলকাতা ফেরতা। জীবনে বারতিনেক ঘুরে গেছে। পবনের হাত দিয়েই। ইটিণ্ডাতে থাকতে তা হয়নি। নদীর ওপারে ছিল তখন গাড়ি।

প্রথম পুলটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অন্ধকার। পুলটা যেন একটা কুঁজো পিঠ-ওয়ালা জীব। চুপ করে বসে আছে মেঘ আকাশের তলায়।

বাসিনীরা আছে ওপারে। গীয়ার আর এক ধাপ তুলল পবন। শব্দটা তার নিজের কানেই বড় ঘ্যাং ঘ্যাং করে লাগছে।

বাসিনী দূর থেকে শুনলেই এ শব্দ চিনতে পারবে। হাসল পবন। হয় তো রাগ করবে বাসিনী। একটুও কি খুশী হবে না ? কে জানে। বাসিনীর কথা বলা যায় না।

পবন এবারে বলেছিল, আমি তোমার সঙ্গে কলকাতা যাব ?

কেন, মরতে ? আর কলকাতা যেতে হবে না। এখানকার লোকগুলোকে শহরে বইবে কে ? তুমি নালটন নে থাক।

কথাটা অবশ্য বলেছিল পবন অন্য কারণে। এবার ফটিক যায় নি। যেতে পারেনি। সেবারে ফটিক গেছল। এবার সে অসুখ করে ঘরে পড়ে আছে।

কিন্তু ফটিকের ওপর একটু রাগই হয়েছে পবনের। সে তাই কলকাতায় আসবার আগে বলতে গেছল ফটিককে। কলকাতায় আসার কথা নয়, একটু রাগের কথা।

বলেছে, ঘরে তো শুয়ে রয়েছ, ওদিকে কি হচ্ছে, খবরটবর পেলে ?

ফটিক ককাচ্ছিল নিজের যন্ত্রণায়। বলেছে, না।

পবন বলেছে, তা তো জানবেই না। ঘরে চিত্তির দিয়ে পড়ে রইলে, আর বউটা গেল কমনে সে খোঁজ নেই।

ফটিকের অসুস্থ মুখেও রাগ ফুটে উঠেছিল।—বলেছে, যাও, যাও দিনি এখন। তোমার ওসব পীরিতের কথা এখন আমার ভালো লাগছে না।

পবন তবু না বলে পারে নি, পীরিতের কথা আবার কি? এখন যাও, বউকে গেঁনে এইস। তখন তো চুপটি মেরে ছিলে। বউয়ের মুখের সামনে তো—

শালা, যাবি তুই এখেন থেকে?

ফটিকের চীৎকারে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড় হয়েছিল পবনের। কিন্তু ফটিক উঠতে পারবে না, এটা সে জানত। তাই সে আর একটু দাঁড়িয়েছিল এবং ফটিকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বিড়ি ধরিয়েছিল একটা।

তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে খালি ভেবেছিল, রাগ। খালি রাগ! মনের সংবাদটা কেউ রাখে না। একটা ছা কোলে নিয়ে গেল মেয়েমানুষটা, আজো এল না। সেটি কিছু নয়।

আর বাসিনীর তো সেই হাসিটুকুই আছে।

আর একবার তাকিয়ে দেখছিল পবন ফটিকের দিকে। হুঁ! বোঝ, ম্যালেরিয়া ধরেছে বোধহয়। নইলে অমন উপুড় হয়ে কাঁপছে কেন?

পবন খুব গম্ভীর হয়ে বলেছিল, আমি তা'লে যাচ্ছি, বুইলে?

কোনো জবাব দেয়নি ফটিক। পবন চলে এসেছিল।

পুলটার ওপরে উঠে হকচকিয়ে গেল পবন। যা বাবা! এ যে ঘোর অন্ধকার। এখনো যে পবনদের মহকুমা শহরের আলোই নেভেনি। আর কলকাতার আলো সব এর মধ্যেই নিভে গেল। কেন? তা কেন হবে? মহকুমা শহরের মতোই বিজলীর গোলমাল হয়েছে নিশ্চয়।

কিন্তু এত নিঝুম কেন? রাস্তায় যে একদম লোক নেই। একটাও না। ভিখিরিও নেই একটা। কত রাত হয়েছে এখন?

প্রথম পুলের পর দ্বিতীয় পুল। কিন্তু, কি ব্যাপার? গাড়ি নেই, ট্রাম নেই। নালটনের লাল্‌চে হেডলাইটের আলোয় সামনের একটুখানি রাস্তা যেন তার দিকে খাবার মতো তাকিয়ে আছে।

চলন্ত অবস্থাতেই, এক হাতে হুইল ধরে আর এক হাতে বিড়ি বার করল পবন। ফস্‌ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরাল কায়দা করে।

এবারে কয়েকটা মেড়োর আবাস। কিন্তু জিজ্ঞেস করা যায় কাকে? কলকাতায় কোথাও আলো নেই? আলো শুধু নালটনের। ডাকও শুধু তারই।

তারপরে পবনের মনের মধ্যে যেন কেউ টেনে টেনে বলল। ব্যাপারটা যেন কেমন! গাড়িটাকে সে ডানদিকের মোড়ে ঘোরাল। গতিটা কমিয়ে দিল আগের চেয়ে।

আলো নেই, লোক নেই। বাসিনীদের খোঁজ বা কোথায় পাওয়া যাবে। রাত-ই বা কাটে কোথায়?

এমন সময় কার গলার একটা চেঁচানি শোনা গেল, হল্ট!

আর সঙ্গে সঙ্গেই পবনের চোখ দুটি ঝলসে গেল। তার সারা নালটনের গায়ে আলো পড়ল।

পবনকে কি কিছু বলছে? পবন গাড়িটা ওই জোরালো আলোর দিকে ঘোরাল।

আবার একটা চীৎকার, হল্ট।

গাড়িটা থামাল পবন। নালটনের অস্পষ্ট আলোয় সে দেখল সামনে আর একটা কালো গাড়ি। মানুষের ইশারা দেখা যায় যেন।

বিড়িটা কামড়ে ধরে পবন নামল। হাফ্ প্যান্টের পকেটে হাত দুটি ঢুকিয়ে এগিয়ে গেল সে গাড়িটার দিকে। ওদের জিজ্ঞেস করলে যদি বাসিনীদের খোঁজ পাওয়া যায়। কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।

মনে হল ওই গাড়িটা থেকেও যেন কারা নামল জুতো খটখটিয়ে। পবন তাদের সামনে যেতে না যেতেই, তারা কয়েকজন পবনকে ঘিরে ফেলল। আর কয়েকটা প্রচণ্ড ঘুষি পড়ল তার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে কড়া হুকুম, আগে বাত্তি বুতাও।

পবন ঘুষি কটা সামলে, মুখে হাত দিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়াল। যদিও একটা চোখ তার টাটাতে লাগল, কিছুই দেখতে পেল না; কিন্তু আর একটা চোখে দেখে তার মনে হল, খাকি পোশাক আর টুপি মাথায় লোকগুলি পুলিশের মতো দেখতে।

তাকে ওরা ধাক্কা দিতে দিতে নালটনের কাছে নিয়ে এল। বলল, বুতাও, বাত্তি বুতাও আগে।

আন্দাজেই হাত বাড়িয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল পবন। তারপরে লোকগুলি তাকে ঠেলে দিল নালটনের ওপর। যাও, ভাগো জলদি।

বলে তারা কালো গাড়িটার দিকে চলে গেল।

পবনের মুখে কি একটা ঠেকল। থুঃ থুঃ করে সেটা ফেলে দিল সে। একটা দাঁত।

সে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল। বাসিনীর মুখটা মনে পড়ল তার। এ কথাটা সে বলবে কেমন করে বাসিনীকে ? কেমন করে বলবে যে, পুলিশের মার খেয়ে চলে এলাম।

মুখে হাত বুলিয়ে সে আবার কালো গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। সে খানিকটা এগুবার আগে, ওরাই এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি। যদিও অন্ধকার, তবু ওরা যেন কেমন স্তব্ধ। যেন অবাক হয়ে গেছে।

পবন দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, মারলেন কেন, অ্যাঁ ? আমাকে মারলেন কেন, সেইটি বলেন।

কথাটা শেষ হবার আগেই, পবন খালি বুঝল সে মাটিতে পড়ে গেছে। আর ওদের পা কী ভীষণ শক্ত। খালি মারতে মারতে তাকে নালটনের কাছে নিয়ে এল। তারপরে তার ডোরাকাটা গেঞ্জিটা ধরে তুলল। কিন্তু গেঞ্জিটা ছিঁড়ে গেল পড়্‌পড়িয়ে।

অনুভূতিটা অসাড় লাগছিল। কিন্তু এরা জবাবও দিলে না। ধরে খালি মেরেই দিলে।

আবার সেই হুকুম, ভাগো, নহি তো মরোগে।

সেটি বুঝতে পারছে পবন। কিন্তু স্টিয়ারিং হুইলটা ধরে একসিলেটর ঠেলে স্টার্ট দিতে গিয়ে বুঝল, হাতে তার জোর নেই। তবু দিতেই হবে।

খুব একটা ব্যথা পেলেও, স্টার্ট নিল নালটন। একটু একটু এগুতে লাগল। বাতি সে জ্বালাতে পারবে না, হুকুম আছে।

কিন্তু, প্যাণ্টটা ভিজে যাচ্ছে পবনের। আপনি আপনি বেরিয়ে যাচ্ছে। পেটটা, ঠ্যাং দুটি, পায়ের পাতা অবধি গরম তরল স্পর্শটা ভাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কোমর সোজা করে, নর্দমার ধারে হেঁটে যাওয়াই মুশকিল।

ছি ছি ! বুড়ো বয়সে ছেলেমানুষের মতো কাণ্ড করছে পবন। ছেলেমানুষের মতোই তার চোখ দুটিও যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। অন্ধকারে সে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। চোখ তাকানোও যাচ্ছে না।

কিন্তু বাসিনীর মুখটা তার মনে পড়ছে। সেই হাসি মুখটা। যা দেখে কোনোদিন কিছু বোঝা যায়নি। তবে আছে, বাসিনীর সঙ্গে তার আছে। মানে ভাব-ভালবাসা যাকে বলে আর কি।

কিন্তু খোঁজটা কোথায় পাওয়া যায়। গাড়িটা নিয়ে কোথাও আশ্রয় দরকার পবনের। কলকাতা যে এত অন্ধকার, কে জানত !

নাচঘর

জেমস্ ওয়াইলি তাঁর ভারতীয় মোটা ছড়িটিতে ভর দিয়ে প্রাচীন দেবদারু গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন। প্রবীণ জেমস্ ওয়াইলি, তাঁর চশমার মোটা লেন্সের ভিতর দিয়ে, বৃদ্ধ চোখে, যে চোখের ধূসর মণি দুটি প্রায় ভেজা, জেবড়ে যাওয়া গলা গলা দেখায়, একবার মুখ তুলে দেবদারু গাছের দিকে তাকালেন। আসন্ন সন্ধ্যায় পাখিরা জটলা করছে, বাসায় ঢোকবার আগে একবার সারাদিনের হিসাব-নিকাশের কিচির-মিচির চলেছে। পঞ্চাশ বছর আগে, এ গাছ যখন ছোট ছিল, তার মূল দেহ যখন আরো ছোট ছিল; ডালপালা হাত বাড়িয়ে ধরা যেত, এবং অনেক বেশী ঝাভালো দেখাত, তখনো পাখিদের বাসা ছিল, এমনি জটলা ছিল। তখনো ওয়াইলি অনেক দিন, এমনি আসন্ন সন্ধ্যায় এখানে দাঁড়িয়েছেন। পঞ্চাশ বছর, তারও বেশী, পঞ্চান্ন কিংবা আটান্ন বছর আগের সেই দাঁড়ানো, আর আজকের দাঁড়ানো অবিকৃত্তি এক নয়।

ওয়াইলি তাঁর নকল দাঁতে একটু হাসলেন, মনে মনে বললেন, নিশ্চয়ই নয়। যদিচ, কয়েক গজ দূরেই, ট্রলির লাইনের ওপর দিয়ে ভারতীয় কুলিরা, তেমনি প্রায় উলঙ্গ, খালি গায়ে, ট্রলিতে মাল ঠেলে নিয়ে চলেছে। বাঁ দিকে, একটু পিছনে, বয়লার ঘরে তেমনি সোঁ সোঁ শব্দ উঠছে, আধো অন্ধকারে ছায়ার মতো শ্রমিকেরা ওখানে চলাফেরা করছে, তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। আরো পিছনে, মস্ত বড় বাঁধানো যে চত্বরের ওপর দিয়ে, ট্রলির লাইন চলে গিয়েছে, তার একধারে সারি সারি গোডাউনগুলো পাটের গাঁটে ভরতি আছে নিশ্চয়ই। লক্ষ লক্ষ টাকার পাট ওখানে জমানো, মেঝে থেকে অনেক উঁচুতে রাখতে হয়, যাতে মাটির স্পর্শে ভিজে না ওঠে, ময়শ্চার না জমে। ওই তিন নম্বর না চার নম্বর গোডাউনেই তো, একবার পাটের গাঁট নামাতে গিয়ে, একদল কুলির মধ্যে একজন আর ফিরে আসে নি। হুড়মুড় করে পাটের গাঁট তার ওপরে চাপা পড়ে গিয়েছিল। প্রায় তিনশো, সাড়ে তিনশো পাউণ্ডের এক একটা গাঁট, তার ঘাড়ের ওপর পড়েছিল, আর তার সঙ্গীরা মনে করেছিল সে হয়তো গোডাউনের বাইরে চলে গিয়েছে। কয়েকদিন কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি লোকটার। তার পরে···কিন্তু থাক, ওয়াইলি সে সব দুর্দৈবের কথা ভাবতে চান না। এমনি

ছুর্দৈব তো একটা নয়, অনেক অনেক, হত্যা, মৃত্যু, জিঘাংসা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, চুরি, সর্বোপরি শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট, ভাবলে তো মনে হয়, সমস্ত বছরগুলো ছুর্দৈবে ঠাসা।

তবু, আনন্দ কি ছিল না? অনেক ছিল, অনেক সুখ, প্রমোদ, ভোগ, এমন কি, হ্যাঁ স্বীকার করতেই হবে, শান্তির নিবিড়তাও কখনো কখনো ভোগ করা গিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রতিষ্ঠিত বেগ্ ডানলপ-এর এই জুটমিলের সব কিছুর সঙ্গেই জেমস্ ওয়াইলি জড়িত। প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে তাঁর পরিচয়, প্রতিটি পুরোনো -গাছ, ইমারত, দরজা-জানালা পর্যন্ত। একজন সাধারণ ওভারশিয়ার থেকে, ম্যানেজারের আসনে বসেছিলেন। এবং সে সময়ে, যদি এমনি আসন্ন সন্ধ্যায় এসে তিনি দাঁড়াতেন এখানে, তা হলে, গোটা কারখানাটাই হয়তো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। বিদ্যুৎবেগে নানান্ কানাকানি, ফিসফিসানি, হাতের ও চোখের ইঙ্গিতে রাষ্ট্র হয়ে যেত, 'বাইলি সাব্ পেড কে নিচে খাড়া হ্যায়।' মুহূর্তের মধ্যে শ্রমিকদের এদিক-ওদিক ঘোরা, গল্প করা, কথা বলা বন্ধ হয়ে যেত। শুধু বয়লারের গর্জন, আর স্পিনিং ঘর থেকে একটা যান্ত্রিক তাল বাজতে থাকত, ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্। বাবুরা (ক্লার্কস) বিড়ি ফুঁকতে বা নস্যি নিতে ভুলে যেতেন। কেবল এই পাখিগুলো তাঁকে ভয় পেত না। এ রকমই ডাকত।

আবার একবার হাসলেন বৃদ্ধ জেমস্ ওয়াইলি, আর হাসতে গিয়ে তাঁর নকল দাঁতের দুটো পাটিই একটু ঢেউ খেলে উঠল, এবং অভ্যাসবশত জিভ দিয়ে ঠেলে তিনি আবার সেট করে নিলেন। অনেক-অনেক তফাত সেদিনে আর এদিনে, এইসব মানুষের মধ্যে, যারা তাঁর আশেপাশে, একটু দূরে কাজ করছে, যারা অনেকেই হয়তো বংশগতভাবে এখনো কাজ করছে, যাদের বাপ-পিতামহরা কাজ করেছে ওয়াইলির সময়ে, তাঁর কাছে, বংশের রক্ত ছাড়া, যাদের মধ্যে সম্ভবত আর সব কিছুরই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। কারণ তাদের বাপ-পিতামহরা ছিল পরাধীন, পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ, আর এরা স্বাধীন ভারতবর্ষের। যারা সেই ছুর্দান্ত পরাক্রমশালী বাইলি সাব্‌কে চেনে না, নামই শুনছে হয়তো। আর এখন দূর থেকে দেখছে, এমনভাবে, যেন, কে এক বুড়ো সাহেব, লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ঠকঠকিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন বুড়ো বা ছোকরা হলেও, কোন সাহেবকে ওদের তেমন ভয় নেই, তার অনেক বেশী ভয় হত, যদি কোন নিরামিষাশী, পান চিবনো, সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, মাথায় শেঠ-এর টুপি লাগানো গোলগাল মারোয়াড়ি এসে দাঁড়াত। কারণ, বেগ্ ডানলপ-এর এই ফ্যাক্টরি

এখন মারোয়াড়িরাই কিনে নিয়েছে। না, তারা কেউ জেমস্ ওয়াইলির মত, মেশিনের প্রতিটি অস্থি-সন্ধি জানা এক্সপার্ট ওভারশিয়ার নয়, মেকানিক নয়, গুণের জন্য কেউ উঁচুতে ওঠেনি, টাকার জোরেই তাদের সব ক্ষমতা। সেরকম লোক কেউ এসে দাঁড়ালে, হয়তো সবাই সাবধান হয়ে উঠত, আর ওয়াইলি; বৃদ্ধ জেমস্ ওয়াইলির প্রতি তাদের তেমন কৌতূহলের তীব্রতাও নেই। হয়তো বড জোর, 'কে এই বুড্‌ঢা সাহেবটা, ঢিলা পাতলুন, চোখে চশমা, লাঠি ভর দিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে ?'

'তোমরা আমাকে চিনবে না হে ছেলেরা।' মনে মনে বললেন, ওয়াইলি, 'আমি আজ নিজেকেই একটু দেখতে এসেছি, বলা যায়, চিনতে এসেছি।' কথাগুলো মনে মনে বলতেই বৃদ্ধ স্কচম্যানের গলার কাছে যেন শক্ত একটা কিছু এসে ঠেকল, তিনি ঢোক গিলতে লাগলেন বারে বারে। কয়েক পা দক্ষিণে গিয়ে, চোখ তুলে তাকালেন পশ্চিম দিকে, যেখানে গঙ্গা, ওপারে চন্দননগর, তার ওপরে অক্টোবরের আকাশ। এমন বিচিত্র বর্ণের আকাশ নিজের জন্মভূমিতে কখনো দেখেছেন কিনা, স্মরণ করতে পারেন না। অবিশ্যি, স্মৃতির দোষই বা দেওয়া যায় কী করে! কতটুকু বয়সে চলে এসেছিলেন এই ট্রপিকাল দেশে! আঠারো বছর হবে বোধহয়, বড জোর কুড়ি। তারপরে ক'বারই বা স্কটল্যাণ্ডে গিয়েছেন ? বার চার পাঁচেক হতে পারে, যেখানে এখন আর তাঁর কেউ নেই। এই বাংলাদেশ তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি। তাঁর সমসাময়িক যাঁরা এখনো জীবিত, কেউ এদেশে আর নেই। কিন্তু ওয়াইলি যাননি। আর সকলের মত তাঁর এমন মনে হয়নি, উত্তর আটলান্টিকের হাওয়া যেখানে বহে, সেখানে ফিরে না যেতে পারলে, মরণেও সুখ নেই। বঙ্গোপসাগরের হাওয়ায় অনেকদিন বেঁচেছিলেন, প্রবলভাবেই বেঁচেছিলেন, এখন আরব সাগরের হাওয়ায় বেঁচে আছেন। বম্বে থেকে একটু দূরে ছোট একটা শহরে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে থাকেন, যদিচ তাদের গলগ্রহ নন। এখনো বিশ বাইশ বছর যদি বাঁচেন, অর্থাৎ যদি সেঞ্চুরি করতে পারেন, তা হলেও কারুর কাছে হাত পাততে হবে না। এক পাত্র গরম স্যুপ, রুটিতে একটু মাখনের পোঁছড়া জুটে যাবে ঠিক।

ছেলে নেই, মেয়ে ফ্রেডা বিয়ে করেছে একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেকে, জর্জ মিলারকে, ভারতবর্ষই যার দেশ। এদের ছেড়ে, শুধুমাত্র দেশবাসীদের সঙ্গে বাকী জীবনটা কাটাবার জন্যে, স্কটল্যাণ্ডে যাবার ইচ্ছে তাঁর হয়নি। যত বয়স, হল, যত দেখলেন, ততই তো বুঝতে পারলেন, দেশকালের ঊর্ধ্বে আরো কিছু

আছে, মন আছে। যে ব্যক্তি মানুষের সকল কিছুর নিয়ন্তা, সেই নিয়ন্তা তাঁকে ছাড়েনি। ভারতবর্ষে তিনি কিছু অশান্তি বোধ করেননি।

কয়েকদিন আগে জর্জ কলকাতায় এল ওর কাজে। আরো অনেকবারই এসেছে। এবার সহসা ওয়াইলির ইচ্ছে হল, আর একবার, হয়তো শেষ বার, কলকাতাকে দেখে আসি। কলকাতা থেকে একবার জগদ্দল, জগদ্দলের সেই বেগ্ ডানলপ-এর জুট মিল, যার প্রপ্রায়টারশিপ, এজেন্সী সবই এখন মারোয়াড়িদের। যেখানে বলতে গেলে, জীবনের উদয় হয়েছিল, অস্তও গিয়েছে, যেখানে সুখ-দুঃখ, তিক্ততা-মাধুর্য, হাসি ও কান্না—হ্যাঁ কান্নাও ছিল বৈ কি, দুঃসহ কান্নার দিনগুলোও কেটেছে। যেখানে জীবনের বেগ, নানান্ প্রবাহে, হয়তো কেবলমাত্র শুষ্ক খাতের চিহ্ন নিয়ে পড়ে আছে। তবু তো সে সব তাঁর চলমান প্রাণবেগেরই চিহ্ন।

জর্জ একলা ছাড়তে চায় নি; সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। ওয়াইলি বারণ করেছেন, ভয়ের কিছু নেই, এই সুবারবন লাইনে এখন ইলেকট্রিক ট্রেন চলে এবং অস্বীকার করা যাবে না, যুবক সাধারণ সকলেই বৃদ্ধদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল, কোন অসুবিধাই তাঁর হবে না। অকারণ জর্জ কেন কলকাতার কাজের ক্ষতি করবে। তিনি রাত্রি দশটার মধ্যে নিশ্চয়ই হোটেলে ফিরে আসবেন। ওয়াইলি এসেছেনও ঠিক সেইভাবেই, কোন অসুবিধা তাঁর হয়নি। স্টেশন থেকে সাইকেল রিক্শায় একেবারে মিলের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন, ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে, নিজের পরিচয় দিয়ে মিলটা একটু ঘুরে দেখবার অনুমতি চেয়েছেন। ভারতের মানুষ, বিদেশীর প্রতি অভদ্রতা ওদের রক্তে নেই, সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়েছে, লোকজন দিতে চেয়েছে সঙ্গে। ওয়াইলি বারণ করেছেন, না, তিনি নিতান্ত একলাই ঘুরতে চান, কোন পরিচয় পেড়ে, একজন অচেনা ভিজিটারের মত দেখতে চান না।

গোটা কারখানা অঞ্চলটাই দেখতে দেখতে এবারে এসে দাঁড়িয়েছেন পিছনে, গঙ্গার দিকে। গঙ্গা তো নয়, ওয়াইলি বলেন, হুগলী নদী, যার জল এখন রক্তবর্ণ। আর আকাশটা যেন বহু বর্ণে রঞ্জিত, যদিও রক্তাভাটাই বেশী। কে জানে, এত ঘাস কেন হয়েছে সামনে, এখানে তো ছিল সবুজ মাঠ! এখন হাঁটু সমান ঘাস, বাতাসে ঢেউ খেলছে। এখানটা বরাবরই সবুজ ঘাস ছাঁটা মসৃণ মাঠ ছিল। মাঠের বাঁ পাশ, অর্থাৎ উত্তর ঘেঁষেই, সেই বাড়িটি, যে বাড়িটির দিকে চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে, স্মৃতির ভারে মাথা নুয়ে পড়ছে, এবং রক্তোচ্ছ্বাস ফুটে

উঠছে তাঁর মুখে। বুকের মধ্যে রক্তধারা বার্ধ্যক্যের স্তিমিত প্রবাহ থেকে যেন একটা উজানের ঠেলা দিয়ে তোলপাড় করে উঠছে।

জেমস্ ওয়াইলি মাথা থেকে টুপিটা খুলে, বাঁ হাতে নিলেন। বাঁ হাতেই তাঁর রেইন কোটটা ঝুলছে। তিনি আস্তে আস্তে চোখ তুলে বাড়িটার দিকে তাকালেন। ক্লাব বাড়ি। এ দেশের লোকেরা বলতো, নাচঘর। এবং সেটাই বোধ হয় ঠিক, এটা নাচঘর। কিন্তু নাচঘর যেন মৃত, নিশ্চুপ অন্ধকারে একটি অভারতীয় অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন চারিদিকে আলো জ্বলে উঠছে মিলের মধ্যে, কিন্তু এ বাড়িটা অন্ধকার। কোথায় ভিতরে দূর অভ্যন্তরের কোন এক কোণে একটি আলো জ্বলছে, তারই রেশ আধভেজা জানালা দিয়ে এসে পড়েছে। অনেকটা যেন কবরের সঙ্কেতের মত, মৃতের অবস্থানকে জানান্ দিচ্ছে মাত্র। কিন্তু বাড়িটার চারপাশে কারুকার্য করা ঝালর দেওয়া যে আলোকস্তম্ভ রয়েছে, সেগুলো জ্বলে না কেন? টেনিসকোর্টের দিকটা অন্ধকার, আরো দূরে, জেটির কাছ ঘেঁষে দরোয়ানের রোদ-বৃষ্টিতে মাথা বাঁচাবার ছোট গুমটি ঘরটা আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ওয়াইলি দূর দক্ষিণে তাকালেন, নাচঘর থেকে অনেকটা দূরে, যেখানে কোয়ার্টার রয়েছে, দেশীয় লোকেরা বলত কুঠি। কুঠির সীমানা ঘেরা। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে তার অনেক পিছনেই, কারখানা এলাকা শেষ। এটা ভিন্ন এলাকা। কারখানার শ্রমিক এবং বাবুরা বয়লার ঘর পেরিয়ে এসে, মাঝে মধ্যে উঁকি মেরে এদিকে তাকিয়ে তাদের উদগ্র কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করত। নাচঘরের সীমানায় আসা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবু আসত বৈকি, দু চারজন বাবু মাথা নীচু করে আসত, নিতান্ত কাজ মেটাতে। সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে, হয়তো কারখানারই কোন গোপন সংবাদ জানাতে। সেখানে মেমসাহেবরা থাকত। এমনিতেই স্ত্রীলোকদের দিকে চোখ তুলে সরাসরি তাকানোটা তাদের কাছে অশালীনতা। তার ওপরে, মেমসাহেবের দিকে চোখ তুলে তাকানোটা তো আরোই দুষ্কর ছিল।

গম্ভীর স্বরে গোঙানির মত একটা শব্দে ওয়াইলি সচকিত হলেন। দেখলেন নাচঘরের প্রধান দরজা একটু খুলে গেল, একটা স্বল্পালোকের রেশ এসে দরজার সামনে বারান্দা এবং থামের কোমর স্পর্শ করল। ওয়াইলি যাবেন কিনা, একবার ভাবলেন; যাঁর প্রবেশের অপেক্ষায় একদা নাচঘরের প্রতিটি দরজা আলোর উচ্ছ্বাসে যেন অপেক্ষা করত। যাঁর অপরিমেয় যৌবনের সরসী জলে, পৌরুষের

মত্ততায়, নাচঘর তরঙ্গায়িত হয়ে উঠত, রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রমত্ততা জাগত। একলা তার নয়, সকল ইউরোপীয় স্টাফেরই. তবু জেমস্ ওয়াইলি আর নাচঘর, এ দুয়ের সম্পর্ক আর সকলের মত ছিল না। ওয়াইলির ক্রোম লেদারের জুতোর শব্দ, বন্ধুদের প্রাত তাঁর উচ্ছ্বসিত আহ্বানের ধ্বনি যতক্ষণ বেজে না উঠত, ডিকাণ্টারের সামনে, যতক্ষণ তাঁর যৌবনমত্ত প্রগল্ভ হাসি উচ্চকিত হয়ে না উঠত ততক্ষণ নাচঘর নাচঘর হয়ে উঠত না। কারখানায় হাজিরা এবং নাচঘরে হাজিরা, দু-ই তাঁর সমান ছিল। কাজের দিন অনেকেই আসত না, অবসরটুকু তারা কুঠিতে বসেই কাটিয়ে দিত; একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন ওয়াইলি। তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। এমন দিনও গিয়াছে, ইওরোপীয় স্টাফের কেউ আসে নি, তিনি একলা। একলাই যতক্ষণ ইচ্ছে হয়েছে থেকেছেন, তারপরে চলে গিয়েছেন।

ওয়াইলির লোলচর্ম মুখের অজস্র রেখা কেঁপে উঠল। তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টি চোখে ব্যাকুলতা দেখা দিল। তাঁর মনে হল, নাচঘর তাঁকে ডাকছে। যৌবনমত্তা কোন যুবতী নয়, যেন কোন বৃদ্ধার করুণ বিলাপের সুরে ডাকছে, 'জেমস্, একবার —একবার এস তোমার স্থবির পায়ে, একবার মুখোমুখি হই, একবার দেখা করি, একবার কথা বলি। প্রিয় জেমস্, আমি তোমার সেই বুড়ি নাচঘর।'

নাচঘরের অন্ধকার চত্বরে জেমস্ ওয়াইলি দাঁড়িয়ে অথচ কোথাও বেয়ারাদের ত্রস্ত ব্যস্ততা নেই; ফিসফাস্ গুঞ্জন নেই ডিকেণ্টারের হিসেবরক্ষী বাবুর। এমন কি, এই অন্ধকার থাকাই কি সম্ভব ছিল? এও যে তেমনি অভাবিত। সেই কারখানার দেওয়ালের এক কোণা থেকে, সামান্য একটু আলোর রেশ পড়েছে তাঁর গায়ে, একটা অস্পষ্ট কিম্ভূত ছায়া পড়েছে, রুক্ষ চত্বরে, যেখানে বাগানের কোন চিহ্ন নেই; মোরাম ছড়ানো পথের কোন নির্দেশ নেই। কেবল কাঁকর, ধুলা আর অবাঞ্ছিত ঘাসের এক একটা চাবড়া।

ওয়াইলি তাঁর শক্ত ভারতীয় ছড়ি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে গেলেন নাচঘরের সামনে। পাথরের ধূলি ধূসরিত সিঁড়ি বেয়ে, একটা থামের পাশ ঘেঁষে বারান্দায় উঠলেন। কেউ নেই দরজায়। অবাক হয়ে দেখলেন, একটা রুগ্ণ দেশীয় কুকুর তাঁকে দেখে, হঠাৎ চমকে, এক কোণ থেকে উঠে দাঁড়াল, ভয় ভয় সংশয়ে নিরীক্ষণ করল, সম্ভবত তাঁর হাতের লাঠিটার জন্যেই। তারপর এক পাশ দিয়ে দৌড়ে নিচে নেমে চলে গেল। জেমস্ দরজার খোলা অংশ দিয়ে ভিতরে তাকালেন। কেউ নেই, একেবারে কেউ না। বিশাল হলঘরটা একেবারে জনশূন্য, স্তব্ধ। হলের মাঝখানে, অনেক উঁচুতে ঝাড়লণ্ঠনের বড় আলোটা মাত্র জ্বলছে, আর ব্যাডমিণ্টনের

একটা নেট টাঙানো রয়েছে মাঝখানে। সেগুন কাঠের মেঝে, অনেকখানি জায়গা এখনো চকচক করছে। অথচ গোটা হলের মেঝেটাই এক সময়ে চকচক করত, আয়নার মত চকচক করত। তখন শুধু খেলা ছিল না, বিশেষ উৎসবে, গোটা হল জুড়ে অন্তত দুশো জোড়া নরনারী নাচত।

ওয়াইলি বারান্দা পেরিয়ে, দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। না, বিশাল হলঘরের চারপাশে যে ডেকরেটেড গালিচা পাতা ছিল, তা নেই। চারপাশের দেওয়ালে যে ছোট ছোট কারুকার্য করা শেডের আলো ছিল, সেগুলো জ্বলেনি। দেখে মনে হয়, আর জ্বলে না, বরং ধুলো পড়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। দেখলেন, ভিতরে ঢুকে, বাঁ পাশে টেবিল টেনিসের টেবিল। ধুলো নেই তাতে। বোঝা গেল, এখনো খেলা হয়। কতদিন খেলেছেন এখানে জেমস্? তার কোন হিসেব নেই। লিভক্ ছোকরা খুব ভাল খেলত, টেবিল টেনিসের চ্যাম্পিয়ন, কেউই ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। মাপা মার ছিল ছোকরা মেকানিকটির, বিপরীতের ঠিক টেবিলের ধার ঘেঁষে তীব্র বেগে গিয়ে বল পড়ত। তবে মিসেস ওয়াইলডেভ-এর সঙ্গে ও খেলতে ভালবাসত। সিনিয়র ওভারসিয়ার ওয়াইলডেভ-এর সুন্দরী গৃহিণীও, রূপের তরঙ্গে ঢেউ তুলে লিভক্-এর সঙ্গে খেলতে ভালবাসত, যার পরিণতি হাতাহাতি মারামারিতে দাঁড়িয়েছিল। এখনো মনে আছে, আবদুল গিয়ে তাঁকে খবর দিল, লিকে আর আলিডেভ সাব (ভারতীয় বেয়ারা বা শ্রমিকেরা যে বিদেশী নামের কী পরিমাণ বিকৃত উচ্চারণ করতে পারে, যারা শোনে নি, তাদের পক্ষে কিছুতেই বোঝা সম্ভব নয়।) মারপিট লাগিয়ে দিয়েছে নাচঘরে, মেমসাব ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছেন, কাউকে ছাড়াতে পারছেন না। ওয়াইলি ছুটে এসেছিলেন, দেখেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন, প্রেমিক লিভক্ বেচারাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, ওয়াইলডেভ-এর সঙ্গে কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারছে না। আর ডরোথি, প্রেমিকের প্রতি ওর স্বামীর প্রত্যেকটি আঘাত যেন ওরই গায়ে লাগছিল, এমন যন্ত্রণাকাতর মুখে, চোখে জল নিয়ে সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখছিল। ও রকম একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ যে আসন্ন হয়ে উঠেছিল, সেটা অনেকেই অনুমান করেছিল, কারণ লিভক্-এর সঙ্গে ডরোথির, টেবিল টেনিসের ছোট্ট জালের বাধাটা কেটে গিয়েছিল, লুকোচুরি খেলাতেই ওরা তখন চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠেছিল। আর সেটা বোধ হয় খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। একটি অবিবাহিত প্রাণোচ্ছল সুন্দর যুবক মেয়েদের মাঝখানে এসে পড়লে, কেউ না কেউ তাকে কৃপা করবে, এটা ধরেই নেওয়া যায়। মানুষ মাত্রেরই সেটা হওয়া

সম্ভব, আর মেয়েরাও নিশ্চয় মানুষ। বিবাহিতদের মধ্যেই কত ঘটনা ঘটেছে, আর অবিবাহিতদের তো কোন প্রশ্নই নেই। ওয়াইলির নিজের জীবনটা···। না থাক, সে কথা থাক এখন। ওয়াইলি দুজনের মাঝখানে পড়ে ওদের থামিয়েছিলেন। লিভক্ আর ডরোথির টেবিল টেনিস খেলা, সেইদিনই শেষ, আর কখনো ওরা একসঙ্গে খেলে নি। শুধু টেবিল টেনিস কেন, লিভক্-এর সঙ্গে সব খেলাই সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, কারণ ওকে বেগ্‌ ডানলপ-এর হেড অফিস কলকাতায় ট্রান্সফার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; যেটা ওয়াইলির একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু স্টাফের যত বিবাহিত লোকেরা ছিল, তারা সকলেই লিভক্-কে তাড়াতে চেয়েছিল, এমন কি জুডি ও জেমসের স্ত্রী। অন্যথায় হয়তো তিনি একবার শেষ চেষ্টা করতেন; কারণ লিভক্ কারখানার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু গৃহবিবাদটা আর চান নি তিনি। বিশেষ করে, জুডির ধারণা ছিল, ওদের প্রেম তিনি সমর্থন করতেন, যেহেতু তাঁর নিজের মর‍্যাল নাকি খুব উঁচুদরের নয়। সে কথা বলবার অধিকার জুডির ছিল এবং সম্ভবত বেগ্‌ ডানলপ-এর স্টাফ কোয়ার্টারের সমস্ত মহিলাদের মধ্যে মর‍্যালিটির কথাটা বলার অধিকার ওর সব থেকে বেশী ছিল, কারণ রূপ আর গুণ দুই-ই ওর ছিল, তবু কাউকে সমালোচনা করবার সুযোগ ও দেয়নি। আর দাম্পত্যজীবনে একনিষ্ঠতা, যার সমালোচনা তো দূরের কথা, বরং আদর্শ স্ত্রী হিসাবে ওর প্রশংসা করত সবাই। বিশ্বাস-ঘাতকতার কোন প্রশ্নই নেই, উপরন্তু অন্য কারুর সঙ্গে বেশী হেসে ঢলে কথা বলাটাও ওর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। যাকে বলে রিজার্ভ টাইপ, জুডি ছিল তাই। আর সে হিসেবে, জেমস্ ছিলেন বিপরীত, হ্যাঁ, তিনি স্বামী হিসেবে···।

ভাবনাটা শেষ করতে পারলেন না ওয়াইলি, তাঁর বৃদ্ধ বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে নিশ্বাস পড়ল, আর জুডি নামক সেই মেয়েটির চেহারা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কান্নায় বিগলিত, ক্রোধে স্ফুরিত, আর হাসিতে, হ্যাঁ স্ত্রী, প্রেয়সী যাকে বলে, সেই রূপেই জুডি ছিল অপরূপা। ও যখন কোন কারণে কাঁদত, তখন মনে হত, বিশ্বের সমস্ত কিছু নিরানন্দে ভরে উঠেছে। ওর কোনটাই যে অল্প ছিল না। সবকিছুই একটু বেশী ছিল, হাসি-কান্না-ক্রোধ, সব কিছুতেই আত্মহারা হয়ে পড়ত, যে কারণে ওর কান্না ও রাগের আত্মহারা চেহারা দেখলে মাঝে মাঝে জেমস্ বিমর্ষ হয়ে ভাবতেন, এই আইরিশ মেয়েটিকে জীবনের সঙ্গে না জড়ালেই বোধ হয় ভাল হত। সবাই যে বলত, আইরিশদের ভাবপ্রবণতা বেশী। কিন্তু সে বিমর্ষ মুহূর্তেই মনে হত, তারপরে আবার

যখন দুজনে একত্র হতেন, তখন সে সব সংশয় কোথায় ভেসে যেত। জুডি-জুডি। সেও এই ক্লাবেই, এই নাচঘরেই, খ্রীষ্টের জন্ম-দিনে প্রথম আলাপ। জুডির বাবা ছিলেন চাঁপদানি মিলের ম্যানেজার। তখনকার এ মিলের ম্যানেজারের নিমন্ত্রণে, সস্ত্রীক সকন্যা এসেছিলেন। জেমস্ তখন ওভার-শিয়ার, কিন্তু হেড-অফিস এবং ডাণ্ডী তাঁর কাছে খুব খুশি ছিল, তাঁর সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলো ফুটতে আরম্ভ করেছিল। তাঁর ওপর কোম্পানি এবং ম্যানেজিং এজেন্টদের গভীর আস্থা ছিল। যদিও বিপক্ষ দলের বাধাও কম ছিল না। কিন্তু যারা খবর রাখত, যারা সেই বেগ্-ডানলপের শুরুর যুগের চেহারা দেখেছিল, তারা জানে, জেমস্ ওয়াইলির দিনগুলো কীভাবে কেটেছে। একটু দেশীয় হুইস্কি কতদিন চোখেও দেখেননি, মাসের পর মাস কলকাতার চেহারা দেখেন নি ; এই গণ্ডগ্রাম জগদ্দলে, মেশিন কামড়ে পড়ে থেকেছেন, এখানকার কালো জোয়ান ছেলেদের হাতে করে কাজ শিখিয়েছেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ধরে এনেছেন, নিজে তাদের সঙ্গে বসে কান্ট্রিমেড লিকার, অথবা টডি খেয়েছেন, এবং হ্যাঁ, অস্বীকার করতে পারবেন না, সে সময়ই, এদেশীয় মেয়েদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। একেবারে ভুলে যাবার মত অবস্থা তো হয়নি, সেই সব মেয়েদের মুখ এখনো একটু একটু মনে পড়ে। হাসিখুশি সরল গরীব মেয়ে, প্রথমে জেমসের দিকে তাকাতেই তারা ভয়ে আধমরা হয়ে যেত। ভয়টা আর কিছু নয়, রং ও ভাষার ভয়, সাদা চামড়া, যাকে ওরা 'গোরা' বলে তারই ভয়। আস্তে আস্তে যখন ভয় কেটে যেত, তখন তাদের মত হাসি-খুশি আর কেউ ছিল না। সেই সব মেয়েদের অধিকাংশই তো এই মিলে কাজ করত, আজীবন কাজ করেছে, কিন্তু আশ্চর্য, তাদের কোন দাবি-দাওয়া ছিল না। বরাবর হাসি-খুশির সঙ্গেই কাজ করেছে, দেখা হলে সেলাম জানিয়েছে। সময় বিশেষে, হাসিঠাট্টা গল্পও হয়েছে, কিন্তু এমন বাসনা কারুর ছিল না যে, সে স্ত্রী হতে চায়, কিংবা রক্ষিতার মত কোন দাবি সে কখনো করে নি। এখনকার দিনে হয়তো অভাবিত ; তবু তারা অনেকটা বন্ধুর মতই ছিল। জেমস্ সঠিক জানতেন না, ওদের সমাজে ওদের কী চেহারা ছিল, তবে স্বাধীন ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সকলেই মোটামুটি জানত তাদের কথা, লুকোবার মত ব্যবহার করত না। কতদিন এ রকম হয়েছে, হয়তো চেনা মেয়েটি আর তারাও মেশিনে কাজে লিপ্ত, জেমস্ গিয়ে তার কোমরে একটি চিমটি কেটে দিয়েছেন। মেয়েটি ফিরে তাঁর পাছায় চাঁটি কষিয়ে দিয়েছে। তাই নিয়ে, ডিপার্টমেন্টের সবাই হাসাহাসি করে উঠেছে। কিন্তু সব মেয়েদের সঙ্গে তা সম্ভব

ছিল না। চেনা মেয়েদের সঙ্গেই ওসব চলত। আর সেইসব মেয়েকে যখন মীট করেছেন, সেও তো এই নাচঘরেই। তাদের নিয়ে তিনি কখনো সীমানা পেরিয়ে কুঠিতে গিয়ে ওঠেন নি। যদিচ সে ঘটনা ঘটেছে, অপরের দ্বারা ঘটেছে এবং তা নিয়ে অনেক কেচ্ছা কেলেঙ্কারি হয়েছে। জেমস্ কখনও তা নিয়ে যান নি, কারণ তাতে উভয় পক্ষেরই আড়ষ্টতা ছিল। এদেশীয় মেয়ের পক্ষে কুঠির আবহাওয়া বরদাস্ত হত না, তাঁরও অস্বস্তি হত। নাচঘরই ছিল তখন আশ্রয়। এই নাচ-ঘরেরই আলাদা কামরায়, কালো মেয়েকে বুকে নিয়ে সারা রাত কেটে গিয়েছে।

ওয়াইলির দীর্ঘশ্বাস পড়ল আবার। যৌবন-যৌবন! একদিকে সে যেমন পরম পবিত্র, কর্মঠ, একনিষ্ঠ, আর একদিকে সে তেমনি অন্ধ, বিবেচনাহীন, হিসাবনিকাশের পরোয়া করে না। কিন্তু কোথায় তাব চিহ্ন আজ। সময়, কাল, তাঁর যৌবনের মতই সব কিছু মুছে নিয়ে চলে গিয়েছে, তাঁর এ প্রাণও নেবে, এবং ভবিষ্যতে একদিন এই নাচঘরও নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে যাবে। এ কথা কি তখন বিশ্বাস করা গিয়েছিল, যখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মনে হত, সব কিছুতেই 'আমি', 'আমাকে' ঘিরেই পৃথিবীর আবর্তন। সকলেরই তাই মনে হত নিশ্চয়ই, জুডিরও। আজ যদি জুডি এসে তাঁর সঙ্গে এভাবে এসে দাঁড়াত নাচঘরের এই কোণে, তাহলে ওর কি এ কথাই মনে হত না? ওর স্মৃতির আয়নায় যখন ভেসে উঠত, ওর নিজেরই ছবি, সেই গোলাপী নাইলনের ছোট জামা গায়ে দিয়ে, রক্তাভ মুখে এই টেবিল টেনিসের টেবিলের পাশেই ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর রক্তিম ঠোঁট, যে ঠোঁট রাগে ও ঘৃণায় নিজেই দাঁত বিঁধিয়ে রক্ত উপছে তুলেছে, একটা উন্মাদ ঘোরে, নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বেঁকে আছে সেই ঠোঁট, রুক্ষ কালো চুলের গোছা (হ্যাঁ, ওর আইরিশ চুল ছিল আশ্চর্য কালো, চোখের মণি দুটিও।) মুখের একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আর ওর হাতে উদ্যত পিস্তল। জুডি নিজেকে যদি আজ বহু বছরের পিছনে, ওই বেশে, ওই ভঙ্গিতে আবিষ্কার করত, যে উদ্যত পিস্তল ও জেমস্ ঢোকা মাত্র, তার দিকে লক্ষ্য করেই ফুঁসে উঠেছিল, 'কোথায় সেই বাদামী সুন্দরী কুকুরীটা কোথায়?' তা হলে কী ভাবত ও?

ওয়াইলির মনে হল, এই মুহূর্তেই যেন তাঁর বৃদ্ধা গৃহিণী; তাঁর হাতটি ধরে বলে উঠলেন 'ওঃ হোয়াট এ সিলি, এক্সকিউজ মী!' তাঁর নিজেরও ঠিক সেই রকমই মনে হল, সত্যি, কি ছেলেমানুষি ব্যাপার সে সব। নিজেরই অবাক লাগে, তখন কেমন করে ও সব ঘটনা ঘটেছিল। তখন কী ভয়ংকর উত্তেজিত

মুহূর্ত সে সব। জীবন মরণের খেলা, প্রেম এবং ঈর্ষার দুঃসহ দ্বন্দ্ব। অথচ এখন যেন সে সবই অনেকটা হাস্যকর, পাগলামি বলে মনে হচ্ছে। এখন নিরাবেগ, নির্বিকার, উত্তেজনাহীন চোখে যেন বিচিত্র বিস্ময়কর নাটকের মত সব কিছু দেখছেন, যার মধ্যে অনেক বছর আগেকার সেই সব সত্যের রূপটা অবাস্তব বলে বোধ হচ্ছে। তবু যে সে সবই সত্য, সেই দিনগুলোপার হয়েই তো এই বয়স ও মন নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাই বার্ধক্যের স্তিমিত রক্তধারায় সময় উজান ঠেলে বড় কলরোল করছে, আর একটা হাহাকার ভিতর থেকে যেন অতি অস্পষ্ট ভাবে দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কেন, যা ছেলেমানুষি, অবাস্তব, হাস্যকর পাগলামি বলে এখন বোধ হচ্ছে, সেই সব দিনের জন্যেই এই নিস্তেজ গতায়ু যৌবন বুকে দীর্ঘশ্বাস কেন? যেন এই নাচঘরও তাঁর মতই দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। কেন?

কারণ এই প্রবীণ প্রাজ্ঞতার মধ্যে আমি এখন মৃত, আসলে বেঁচেছিলাম সেদিনের যৌবনের মধ্যেই। এ কথা মনে মনে উচ্চারণ করলেন ওয়াইলি। কারণ তখন আকাঙ্ক্ষা করবার দুর্জয় ক্ষমতা ছিল; ত্যাগ করবার উদারতা ও মহত্ত্ব ছিল। আজ আকাঙ্ক্ষা নেই, তাই ত্যাগও নেই। শুধু শেষ প্রস্থানের ভীরু স্থবির মন্থর পদচারণা।

ওয়াইলি মুখ তুলে হলের মাঝখানে তাকালেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল নাচের দৃশ্য; জুডি নাচছে। পর পর অনেকের সঙ্গে নেচেও তার ক্লান্তি নেই। শেষবার তাই, জেমসের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করে নি। খ্রীষ্ট জন্মদিনে, প্রায় পঞ্চাশ বছর, কিংবা তারও বেশী আগে, সেই উৎসবের দিনটিতে স্টাফের গিন্নিদের বা মেয়েদের, অনেকের সঙ্গেই তিনি নেচেছিলেন, কিন্তু তাঁর তৃষ্ণার্ত চোখ পড়েছিল সেই বলিষ্ঠ অপূর্ব গঠন দুটি পায়ের দিকে, সেই কোমল অথচ স্বাস্থ্যপূর্ণ দুটি বাহুর দিকে, নাচের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে, যার বিশ বছরের ক্ষীণ কটি বিশাল জঘন আর উদ্ধত বুক, তাঁর বুকের রক্ত দোলার ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠেছিল। তখন বোধ হয় একটু ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল জুডি। মেয়ে-পুরুষ অনেকেই মাতাল হয়ে, শোফায়, চেয়ারে এমন কি মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। নাচিয়েদের ভিড় কমে গিয়েছিল। জুডি মাঝে মাঝে শরীরের ভার ছেড়ে দিচ্ছিল জেমসের ওপরে, যতই ছেড়ে দিচ্ছিল, ততই তিনি জুডির কোমরে হাত দিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরছিলেন। ওর পেটেও ইতিমধ্যে অনেকখানি ককটেল গিয়েছিল, তবু শালীনতা হারায় নি। জেমসেরই উচিত ছিল, ক্লান্ত

মেয়েটিকে বিশ্রাম দেওয়া, দিতে পারেন নি। বরং ককটেলের বেলায়, ক্রমেই অন্য-দিকে সরে যাচ্ছিলেন এবং দু' একবার ডেকে উঠেছিলেন 'মিস ওয়ালেশ্।'

'ইয়েস ?'

জুডি যেন চমকে উঠে, নিজেকে বিন্যস্ত করতে চাইছিল, কারণ ও ভাবছিল, জেমস্ ওকে ঘোর কাটিয়ে উঠতে বলছেন। তাই লজ্জিত হেসে বলেছিল, 'দুঃখিত, মাফ করবেন।'

'না না, মাফ চাইবার কিছু নেই। আমার পরম সৌভাগ্য··· ।'

জেমস্ বলছিলেন বারেবারে, আর কৌতূহলী, সন্ধানী চোখে জুডি এক একবার হঠাৎ তাঁর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। জেমস্ বুঝতে পারছিলেন জুডির ঘোর থাকলেও আসলে যাঁর সঙ্গে সে নাচছে, সে লোকটি কোন মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করছেন কি না, সেটা অনুধাবন করতে চাইছিল। যত ঘোরই থাক, এটা সে বুঝতে পারছিল, জেমস্ তাকে খুবই নিবিড় করে ধরে আছেন। ওই অবস্থায়, সেটা একটা মহাপাপ বলে ওর মনে হয় নি ; কিন্তু আচরণের মধ্যে খারাপ কিছু পেলে, ও নিশ্চিত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করত। জুডি সেই রকমেরই মেয়ে। ও জেমসের কথার জবাবে বলেছিল, 'আমাদের সকলেরই সৌভাগ্য, আমরা একত্র হয়েছি।'

জেমস্ না বলে পারেন নি, 'তার মধ্যে আমার সবচেয়ে বড সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে নাচছি।'

জুডি একবার পূর্ণ চোখে তখন তাকিয়েছিল, জেমস্কে পায়ের থেকে মাথা অবধি লক্ষ্য করে বলেছিল, 'ধন্যবাদ ! কিন্তু আমরা নাচের আসরের কাছ থেকে সরে এসেছি।'

জেমস্ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে একটু বসতে অনুরোধ করছি ; আপনি টায়ার্ড। আসুন আমরা একটু গল্প করি, আপত্তি নেই তো ?'

জুডি আবার তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অনুসন্ধানী চোখে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, 'আচ্ছা।'

জুডিকে বসিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কোন্খানটায় যেন ? কোথায়, দেয়াল ঘেঁষে সেই শোফাগুলো কোথাও নেই এখন। হয়তো বর্তমান কর্তৃপক্ষ সে সব সরিয়ে দিয়েছেন আর আমেলিয়া কোথায় বসেছিল ? এই মিলেরই মিঃ ফার্গুসনের মেয়ে ছিল সে। জুডিরই সমবয়সী, অবিবাহিতা, একটু স্থূল, মাংসালো বলা চলে, আর তেমনি রঙটাও ছিল রক্তাভ। জুডিকে দেখবার আগে পর্যন্ত,

আমেলিয়ার সঙ্গে খুব প্রেম করেছিলেন জেমস্। আমেলিয়ার কাছে প্রেম মানেই শোয়া। ঠিক মত বললে, একটু চড়া প্রবৃত্তির মেয়ে বলতে হয়। বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন ছিল না, বোকার মত সাহস ছিল ওর। সুযোগ পেলেই লুকিয়ে জেমসের কোয়ার্টারে পালিয়ে আসত। সাক্ষী থাকতেন মিসেস ডিকাম্বার ; কারণ তিনি সবই জানতেন। আমেলিয়ার মা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, মেয়ে তাঁর বাড়িতেই বেড়াতে গিয়েছিল। মিসেস ডিকাম্বার তিন সন্তানের জননী হয়েও কেমন করে আমেলিয়ার বান্ধবী হয়েছিলেন এবং কেন জেমসের সঙ্গে প্রেমে তাকে সাহায্য করতেন, কে জানে। কিন্তু ব্যাপারটা তাই ছিল। সেই রাত্রে জেমস্ যখন জুডিকে বসিয়ে দিয়ে তার পাশে বসলেন, তখন লক্ষ্য করেছিলেন, একটু দূরেই আমেলিয়া বসে রয়েছে। তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল, ঠিক যেন ফুলে ওঠা ক্রুদ্ধ বেড়ালীর মত। ওর চোখে নিশ্চয়, জেমসের সঙ্গে নাচঘরে কাটানো অনেক মুহূর্ত, চুম্বন ও আলিঙ্গনের ব্যাকুল মুহূর্তগুলো ভেসে উঠেছিল। জেমসের সেই চেহারাটা তো ওর চেনা ছিল, তাই ওর পক্ষে রেগে ওঠা খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জেমসেরও তখন রাগ হয়েছিল ওর ওপর। আমেলিয়ার ও রকম চেহারা দেখে, তিনিও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ওয়াইলি নিশ্বাস ফেলে করুণভাবে একটু হাসলেন। যৌবন বড় স্বার্থপর, নিষ্ঠুরও বটে। না না, এ কথা মানতেই হবে তিনি খুব খারাপ লোক ছিলেন। জঘন্য চরিত্র বলতে যা বোঝায়, তিনি তাই ছিলেন। মেয়েদের ব্যাপারে অত্যন্ত নির্বিচার ভোগের মধ্যে তিনি ডুবে যেতেন। যদিচ, তার জন্য তিনি কোন ফাঁদ পেতে বেড়াতেন না। সম্ভবত তাঁর দীর্ঘ পেশল দেহ, নিরন্তর খুশি চঞ্চলতা, ব্যবহারের উদ্দামতা, কাজে অক্লান্ত, এই সবের মধ্যে আকর্ষণের মূল কারণগুলো নিহিত ছিল। এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন, তিনি জানেন না। কিন্তু তাঁকে ঘিরে মেয়েরা এসেছে, আর সেই আসাটাকে তিনি পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা করেছেন। এই অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণকে কোন কিছু দিয়েই সমর্থন করা যায় না।

যায় না, তবু করুণ বলে বোধ হচ্ছে এই জন্যে, সেই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতার কোন চিহ্নই আজ আর নেই। জুডি মারা গিয়েছে। আমেলিয়া ওর স্বামীর সঙ্গে হোমে ফিরে গিয়েছিল। মারা গিয়েছে ইয়র্কশায়ারে গিয়ে। জুডি কলকাতায়। এবং জেমস্‌ও শেষদিনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। যেখানে ওরা গিয়েছে। সেখানেই চলেছেন। যেখানে বকুলবালা গিয়েছে, গঙ্গার ওপারের মেয়ে ছিল সে, এই নাচঘরে অনেকবার এসেছে। কিংবা সোন্‌পাতিয়া, সেই বিলাসপুরওয়ালী মেয়েটি। কী ভুল করেছিল একদিন সোন্‌পাতিয়াকে জিন্ খাইয়ে। অমন অপরূপ

স্বাস্থ্যবতী লজ্জাবতী মেয়েটি, নগ্ন হয়ে দেহাতী নাচ শুরু করে দিয়েছিল। মেয়েদের প্রসাধন ও বিশ্রাম কক্ষের মধ্যে ঘটনাটা ঘটেছিল, তাই রক্ষা, নয়তো আবদুল দেখে ফেলত। দেখে ফেললেও ক্ষতি কিছুই ছিল না, আবদুল তাঁর সব কিছুরই সাক্ষী ছিল, তাকে ফাঁকি দিয়ে এই নাচঘরে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। সে শুধু সর্দার বেয়ারা ছিল না; বাইলি সাহেবের সঙ্গে দোস্তি ছিল তার। আসলে, ক্লাবের সেক্রেটারি থাক, ক্লার্ক থাক, সব কিছুর ওপরে আবদুল ছিল, আবদুলই আসলে সব চালাত। কে জানে সেই আবদুল এখনো বেঁচে আছে কি না। জেমসের থেকে বয়স বেশী ছিল না তার নিশ্চয়। হয়তো সমবয়সীই ছিল। বেঁচে থাকলেও সে এখন কোথায় আছে, কে জানে। সে যদি সোন্‌পাতিয়াকে উলঙ্গ দেখত, তাহলেও কিছুই যেত আসত না। কোন কথাই নাচঘরের বাইরে যেত না। তবু একটি মেয়ে, ভারতের প্রায় আরণ্যক মেয়ে, পৃথিবীতে যার সৌন্দর্য ও জীবনের কোন তুলনা হয় না বলে জেমসের ধারণা, সেই রকম মেয়ে নেশায় উন্মত্ত নগ্ন, যেটাকে এক রকম দুর্দশাই বলতে হবে, অপরের চোখে না পড়াই উচিত। রক্তে উন্মাদনা তাঁরও জেগেছিল, তবুও অনুশোচনাও হয়েছিল, ভয় পেয়েছিলেন সোন্‌পাতিয়ার জন্যে।

ওরা যেখানে গিয়েছে, উনিও সেইখানেই চলেছেন, খুব তাড়াতাড়ি তো চলেছেন, অনেকটা শীতের সূর্যাস্তের শেষ বেলার মত। ছায়া নিবিড় হয়ে এল বলে। তারপরে তো স্মৃতিটুকুও থাকবে না, সেই সব প্রগল্‌ভ বেহিসাবী, উন্মত্ত দিনের কোন রেশই থাকবে না। এর থেকে করুণ আর কী আছে। মানুষ যে কোন যুক্তি দিয়েই বিচার করুক, নাচঘরের যে জীবন, তার সবটাই তো প্রায় প্রবৃত্তির দাসত্ববিচিত্রা। এখন সেই প্রবৃত্তি গত, যাদের নিয়ে আচরণ করেছেন, তারা অনেকেই গত। এই নাচঘরই শুধু আছে। এ কি খুবই করুণ নয়।

তবে বোধ হয় শুধু যৌবন নয়, মানুষের জীবন কালটাই বিচিত্র। তার সকল আচরণের মধ্যে কি কখনো বোঝা যায়, কিছুই থাকবে না, সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বোঝা যায় না। তাহলে মানুষ সম্ভবত জন্মের পর থেকে কেবল কবর-খানা তৈরিতেই মন দিত। না যৌবন নয়, সমগ্র জীবনটাই এমন বেগে চলমান, মৃত্যু যেখানে নিরন্তর প্রতিহত। জেমসের থেকে আজ কে বেশী জানে, মৃত্যু আসন্ন, তবু জীবনের বেগ তাঁর ভিতরে খেলা করছে, মন্দ বল, দুর্নীতি বল, সেই জীবনের বেগ বড় আতুর করে তুলছে।

ওয়াইলি জেমস্ পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। তাঁর জুতোর শব্দ, কাঠের মেঝের ওপরে ঠকঠক শব্দ তুলল, আর নাচঘরের এই বিশাল হলের উঁচু ছাদে, দেয়ালে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হল। এত শব্দ আগে হত না যেন, এমন গম্ভীর প্রতিধ্বনি আগে বাজত না যেন। তখন অবিশ্যি এতটা নিঃশব্দও ছিল না বোধ হয়। কিংবা ছিল, তবু চারিদিকে জানালাগুলোতে ভারী পর্দা ছিল, আসবাবপত্রও কিছু বেশী ছিল, সেইজন্যেই হয়ত শব্দ কম হত। এখন যেন মৃত্যু-পুরীর মত স্তব্ধ, কোন প্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সত্যি কি নেই নাকি? একটু আগেই তবে কে সামনের প্রধান দরজাটা খুলে দিল? কে এই একটি মাত্র মাঝ-খানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছে? যে আলোর বুকে ছায়া ফেলে জেমস্ এগিয়ে চলেছেন, আর ছায়াটা ক্রমাগতই ছোট হয়ে আসছে। এই ছায়া এই ঠকঠক শব্দ, কোন কিছুই যেন মরজগতের নয়, পৃথিবী ছাড়িয়ে এক দূরলোকে চলে এসেছেন যেন।

ব্যাডমিণ্টনের জালটার কাছে এসে আবার দাঁড়ালেন জেমস্। স্টেজটা কতদূর? নেই নাকি সেটা? মোটা লেপের ভিতর থেকে, ভেজা ভেজা জ্যাবড়া চোখের মণি দিয়ে তিনি সামনের দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, আছে। ভিতরে যেখানে ডিক্যাণ্টার, সেখানে যাবার সরু পথের দেয়ালে সম্ভবত কমজোরি আলো একটা আছে, যেটা আগে সারারাত্রি জ্বলত। সেই আলোটা জ্বলছে, তারই অস্পষ্ট আলোয়, মঞ্চটা ঝাপসা দেখতে পেলেন তিনি। বাঁ পাশে, আধো অন্ধকারে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা একটা পশুর মত যেটাকে মনে হচ্ছে, সেটা নিশ্চয় কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা পিয়ানোটা। অথচ আগে ওই পিয়ানো স্টেজের একটা সৌন্দর্য ছিল। লণ্ডন থেকে আনানো পিয়ানো। ইংল্যাণ্ডের বা স্কটল্যাণ্ডের যত শ্রেষ্ঠ বাদক সেই যুগে কলকাতায় এসেছেন, তাঁরা অনেকেই এই নাচঘরে এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে, এই পিয়ানো বাজিয়েছেন। এই মঞ্চে। সেই যুগে কত নর্তকী নেচেছে; কত গায়িকা গেয়েছে। যারা শীতের সময় ইউরোপ বা আমেরিকা থেকে কলকাতায় এসেছে, তাদের অনেককেই এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যদিচ কলকাতার বাইরে জুট ইণ্ডাস্ট্রির স্কচ স্টাফের ওপর অনেকেরই বিশ্বাস ছিল না, অর্ধশিক্ষিত গোঁয়ার ভাবত সবাই, ইউরোপের অন্যান্য অধিবাসীরা, তবু সেই সব নর্তকীরা অনেকেই এখানে এসেছে। তাদের ভয় দেখানো হয়েছে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে, তবু এসেছে। প্রথম কথা, টাকার কমতি ছিল না, দ্বিতীয়ত আচরণের দিক থেকে

কেউই কোন অভদ্রতা করেনি। উৎসবে আনন্দে উল্লাস সকলেই প্রকাশ করে। কেউ বেশী কেউ কম। কলকাতার ক্লাবেও জেমস্ দেখেছেন, মেয়ে নিয়ে বাড়াবাড়ি; এমন কি মারামারি; কী না ঘটেছে সেখানে? সেই তুলনায় এসব ক্লাবের পরিবেশ তো যথেষ্ট শান্ত ভদ্র ছিল। মারামারি এখানেও না হয়েছে তা নয়। মাতাল হয়ে গেলে, অনেকেই বন্য হয়ে উঠেছে, ভিতরের বিদ্বেষ ফেটে পড়েছে। মনে আছে, ক্রুকশন্ একবার ওয়েবস্টারের প্যাণ্ট খুলে নিয়েছিল মহিলাদের সামনেই। এবং জেমস্ সেদিন ক্রুকশনের অন্ততঃ কয়েকটা দাঁত নড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার কারণও মাঝখানে একটি মেয়ে। ডোভারের সেই মেয়েটি প্রায় তিন বছর ভারতবর্ষে ছিল, নাচতে সে এসেছিল বটে, বেশ্যাবৃত্তিই তার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। তাকে এখানে, আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, আর তাকে নিয়েই দুজনের মধ্যে লড়াই লেগে গিয়েছিল। এ রকম এক জায়গায় নয়, মেয়েটি তাকে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধ হয় ভালবাসত; যে কারণে তার সম্পর্কে কলকাতাতেও নানান্ রকম কথা রটে গিয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ তাকে জোর করে হোমে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এ কি সেই মঞ্চ! বেগ্-ডানলপ-এর নাচঘরের সেই মঞ্চ, আর এই মঞ্চ, জীবিত ও মৃতের চেয়েও যেন বেশী ফারাক। আলো নেই, পর্দা নেই, স্ক্রীন নেই। লাল মখমলের বিরাট স্ক্রীন ছিল, দুপাশে সরানো থাকত। তার কোন চিহ্নই নেই। উইংস চোখে পড়ে না। সবই খুলে নেওয়া হয়েছে। মঞ্চের স্ক্রীনের সঙ্গেও এক অতি ব্যাকুল ভীত উত্তেজিত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। জুডি যাকে পিস্তল হাতে খুঁজে বেড়িয়েছিল, নাচঘরের প্রতিটি অংশ তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছিল, সেই লুক্রেজিয়া, গোয়ার সেই মেয়েটি; আশ্চর্য উপায়ে নিজেকে গুটনো স্ক্রীনের মধ্যে ঢুকিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল।

লুক্রেজিয়া…… !

ওয়াইলি হাত দিয়ে ব্যাডমিণ্টনের জালটা ধরলেন। মঞ্চের কাছে যেতে চান, মেয়েদের সেই বিশ্রাম ও প্রসাধন কক্ষটি একবার দেখতে চান। আর ডিক্যাণ্টার এবং তার সেই উঁচু আসনগুলো, যেখানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মদ্য পান করেছেন। ডানদিকে ফিরতে গিয়ে থমকে গেলেন। একটা ছায়া বারে বারে তাঁর চোখের সামনে ঘুরে যেতে লাগল। তাঁকে ঘিরে চক্রাকারে উড়তে লাগল। ভাল করে মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন, চামচিকা। পোড়োবাড়ির অন্ধকারে যে রাতচরা নোংরা জীবগুলো উড়ে বেড়ায়। তিনি একবার হাতের ছড়িটা তুলতে চাইলেন। কিন্তু না, নিরস্ত হলেন। পারবেন না। জুতো আর ছড়ির ঠকঠক শব্দে ডান-

দিকে এগিয়ে, জালের পোস্ট পেরিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন। মঞ্চের কাছা-কাছি এসে হঠাৎ ডানদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। খোলা দরজার ওপারে আলো জ্বলছে বিলিয়ার্ড রুমে। সেই বিলিয়াড় রুম। কত সন্ধ্যা কত রাত্রি এই ঘরে কেটে গিয়েছে। গান এবং খেলা সমানে চলেছে। তাঁর সময়ে কে ছিল সব থেকে ভাল বিলিয়ার্ড খেলোয়ার্ড? ক্রুকশন, সেই ডাকাতে গোঁয়ারটাই ছিল চ্যাম্পিয়ান।

কিন্তু ঘর খোলা; আলো জ্বলছে, বোর্ড পর্দাযুক্ত। কে খেলবে, কারা? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছেন না জেমস্? তবে বোর্ড এভাবে খোলা পড়ে আছে কেন! ধুলো পড়বে যে, বোর্ড নষ্ট হয়ে যাবে।

বিলিয়ার্ড রুমের পাশ দিয়ে, সিঁড়ি উঠে গিয়েছে, বার-এ যাবার সরু পথ বাঁক নিয়েছে ওখানে। ওই পথেই পুরুষদের বাথরুম, ল্যাভেটরি। জেমস্ উঠলেন সিঁড়ি দিয়ে। এখন আর কাঠ নয়; লাল মেঝের ওপর দিয়েই এগিয়ে চললেন। অল্প হলেও আলো ঠিকই জ্বলছে। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর বাঁদিকে বার। সেখানে গেলেন। আর সেখানেই প্রথম মানুষের দেখা পেলেন। একটি মাঝ-বয়সী, কালো লোক, গায়ে আধোয়া ময়লা কুর্তা, কিন্তু বেয়ারার কুর্তা তার গায়ে। সে দাঁড়িয়ে আছে ডিক্যাণ্টারের টেবিলের ওপাশে। কেন? আলমারি তো শূন্য, একটি বোতলও দেখা যায় না। একটি গেলাসের চিহ্ন নেই কোথাও। অথচ লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, মাথার ওপরে পাখা ঘুরছে, আলো জ্বলছে। কী করছে লোকটা?

লোকটা তাঁকে দেখে, কয়েক মুহূর্ত অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে রইল তারপরে হাতটা কপালে ঠেকাল, কিন্তু কিছুই বলল না। ঘুরে টেবিলের বাইরে এসে, তাঁকে আপাদমস্তক একবার দেখল। আশ্চর্য! এই নাচঘরে ওয়াইলি জেমস্ দাঁড়িয়ে, বেয়ারাটা তাঁকে একটু কৌতূহলী হয়ে দেখছে। এই লোকটাকে তিনি চেনেন বলে মনে হয় না। লোকটাও নিশ্চয় তাঁকে চেনে না।

'আপ কিস্‌কো মাংতা সাব?'

জেমস্ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমকো নাম কেয়া?'

'গফুর।'

'আবদুল কো তুম পহ্চনতা, আগে যো ইধার কা বেয়ারা থা?'

'হাঁ সাব্, আবদুল মেরা আব্বাজান।'

আবদুলের ছেলে! না, কোন মিল নেই চেহারায়। আবদুলের কত বড় গোঁফ ছিল, কত লম্বা দাড়ি ছিল। তার রং ছিল ফর্সা, তামাটে ফর্সা।

এমন সময়ে পাশেই কোন দেয়ালের আড়াল থেকে, ঘড়ঘড়ে ভাঙা গলা শোনা গেল, 'ক্যায়া গফুর, কৌন্ হ্যায় ?'

বলতে বলতেই লুঙ্গি পরা, খালি গায়ে একটি বৃদ্ধ, মঞ্চে যাবার গলি পথ থেকে বেরিয়ে এল। লোলচর্ম স্থবির, সামনে ঝুঁকে পড়া লোকটির দাড়ি সব সাদা। গোঁফ জোড়া পাঁশুটে দেখাচ্ছে, বোধ হয় হুঁকা খায়। দেখা মাত্রই জেমস্ চিনতে পারলেন, আবদুল। নাচঘরের সেই পুরনো বেয়ারা। আবদুল জেমসের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে, সহসা যেন চমকে কেঁপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইল। ভয়ংকর উত্তেজনা, তার গলার স্বর আরো অস্পষ্ট হয়ে উঠল। কপালে হাত ঠেকিয়ে সে বলে উঠল, 'সালাম সাব্।'

জেমসের মনে হল তিনিও কাঁপছেন। উত্তেজনায় তিনি হয়তো দাঁড়াতেই পারবেন না। তিনি বলে উঠলেন, 'তুম আবদুল, আবদুল।'

কাছে গিয়ে তিনি আবদুলের হাত ধরলেন। যা চির অকল্পিত, চির অভাবিত। জেমস্ ওয়াইলি বেয়ারার হাত ধরেছেন। কারণ, তাঁর মনে হল, এই-ই ভারতবর্ষ। যাঁকে সম্মান দেখাবার আর কোন দরকার নেই, যাঁকে চিনতে না পারলেও কোন ক্ষতি নেই, যাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেও কোন প্রতিবাদ আসবে না, এবং জীবনে বহুবারই যার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, গালে থাপ্পড় মেরেছেন, দাড়ি টেনে দিয়েছেন সে সম্পূর্ণ ক্ষমাশীল। অনেকেই ওর এই অভ্যর্থনাকে দাস মনোভাব ভেবে এখনো ভুল করবে, কিন্তু জেমস্ ভারতবর্ষে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ওদের ঘৃণার চেহারা দেখেছেন, ক্রোধের আগুন দেখেছেন। কিন্তু মূল বুঝতে কখনো ভুল করেন নি। তুমি যদি হাত বাড়িয়ে আস, ও তোমাকে কখনো ফিরিয়ে দেবে না।

আবদুল এখনও কথা বলতে পারছে না। তার চোখ দিয়ে জল এসে পড়েছে। সে জেমসের হাতটা দেখছে, হাতটা তার কাঁপছে। কোন রকমে সে একবার উচ্চারণ করল, 'বাইলি সাব, হমারা বাইলি সাব আপ হাঁয়।'

'হাঁ আবদুল, হম বাইলি তুমকো বাইলি।'

ওয়াইলি জেমস্, বেগ্ ডানলপ-এর সেই প্রবল পরাক্রান্ত ম্যানেজার, পুরনো দিনের বেয়ারার হাত ধরে আছেন। তাঁর চোখ দুটিও গলে গলে পড়ছে যেন। অতি সুখেই যেন বুকটা টনটনিয়ে উঠছে। এই লোকটিই তো একমাত্র জীবন্ত স্মৃতি। প্রকৃত জেমস্কে যারা জানে, তাদের মধ্যে এই একজনকেই তো মাত্র বহু-বহুকাল বাদে দেখতে পেলেন, কাছে পেলেন, ছুঁতে পেলেন। এখন, এই মানুষই

তো একমাত্র বন্ধু, আর বাকী এই পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ, এমন কি নিজের মেয়ে, জামাই, নাতি, নাতনী কেউ তাঁকে সঠিক চেনে না। তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানে না। আর যারা তাঁকে চেনে, তারা, এই ফ্যাক্টরী, বাইরের কুঠি, এই নাচঘর, সবই জড় পদার্থ, কেউ কথা বলতে পারে না। কেঁদে উঠতেও পারে না।

গফুর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। আবদুল ভেজা চোখে, ফোগলা দাঁতে ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল, 'বেটা গফুর, হমারা বাইলি সাব, কেতনা কিস্‌সা উন্‌কে বারে সুনায়া—সেলাম্ বোল্।'

গফুর অবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। সে কাপালে হাত ঠেকাল আবার। তার আগেই জেমস্ ওর কাঁধে চাপড মেরে বললেন, 'বেটা বেটা।'

কিন্তু আবদুলের হাত তিনি ছাড়লেন না। আবদুল তাঁকে বসতে বলল বার বার, গফুর একটা কুর্শি এগিয়ে দিল। জেমস্ সে সব খেয়াল করলেন না, তিনি একগাদা প্রশ্ন করলেন আবদুলকে। তার মধ্যে প্রধান জিজ্ঞাস্য, সে এখনো এই নাচঘরে কেন? এখানে সে কি করছে?

আবদুল জানাল, তার কিছু করার নেই আর। হয়তো এ সময়ে সে বাড়িতেই থাকতে পারত। এখন তো সে আর কোন কাজ করতে পারে না। সেই গোলঘর ময়দানের কাছে নিজের একটা ঘর আছে। গফুর এখানে কাজ করে। নাতিরা কারখানায় খাটে। কিন্তু আবদুল ঘরে বসে থাকতে পারে না। তাকে নাকি নিশির টানের মত এখানে টেনে নিয়ে আসে। 'মগর সাব দিন কভি নহী ঠারতি।' দিন তো থামে না, আর দিনের সঙ্গে সব কিছুই ভেসে চলে যায়। সেই খেলাধুলা হাসিহল্লা নাচ গান ফুর্তি, কিছুই নেই। দু-চার ছোকরা আসে, একটু আধটু খেলে, দুটো রেকর্ড বাজায়, এক আধ পেগ মদ খায়, ব্যাস খতম। এখনকার যারা আসলি সাহেব, তারা কোন রকমে কাজ খতম করেই, কলকাতায় যায় ফুর্তি করতে। ঔর আপলোগ, আপনা হাথ মে ফেক্‌টরি বানায়া থা, কামকে টাইম মে কাম কিয়া, খেলা গানা বাজানা কে টাইম মে নাচঘর চলা আয়া। আপলোগ্‌কো থা এক হি জাহ্গা।

জেমস্ ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললেন, 'ঠিক, ঠিক বলেছ আবদুল। আমাদের সব কিছু এখানেই ছিল। আমরা বাইরে যেতাম না।'

এরপরে আবদুলও নানান্ কথা জিজ্ঞেস করল জেমস্‌কে। এবং যখন শুনল, মেমসাহেব মারা গেছেন, তখন সে উঁচুতে হাত তুলে, খোদাতালার কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করল। তার চোখে জল এসে পড়ল। ওয়াইলি জেমস্

এবার সত্যি তাঁর লোল শিথিল মুখখানি তার অবিকৃত রাখতে পারলেন না। তিনিও ঠোঁট নেড়ে চুপিচুপি বলে উঠলেন, 'রেস্ট ইন পীস্ মাই ডারলিং।...'

পরমুহূর্তে আবদুলও যেন স্মৃতিভারে নুয়ে পড়ল, আর ফিসফিস করে বলল, 'ইয়া আল্লা, মেমসাবকো হম কভি নহী ভুল সক্‌তা। তাঁর হাতে সেই পিস্তল, হয়তো সেদিন আমাকেই মেরে ফেলতেন। গোস্তাকি নেবেন না সাব্, জুলিখা মেমসাবকে যখন তিনি খুঁজতে এসেছিলেন।...'

না, গোস্তাকি নেবেন না জেমস্, বরং কৃতজ্ঞ। আবদুল ছাড়া সেই সব দিনের সাক্ষী আর কেউ নেই। আবদুল জীবন্ত স্মৃতি। কিন্তু জুলিখা মানে লুক্রেজিয়া। আবদুল ওই নামটাকে চিরদিনই জুলিখা বলে এসেছে।

এই বিচিত্র উচ্চারণগুলো কখনো সংশোধন করা যেত না।

জেমস্ বললেন, 'মনে আছে, সব মনে আছে আবদুল।'

'মনে আছে, আপকো ইয়াদ হ্যায় সাব, সিতারাবাঈকো, যো নাচনেওয়ালী আয়ী থি বিশোকরমা পূজাকে টাইমমে ?'

'জরুর, জরুর।'

জেমস্ যেন তাঁর স্মৃতির গভীর অন্ধকার থেকে রুদ্ধশ্বাস আবেগে বলে উঠলেন। আহা কেন, কেন তিনি অমন ছিলেন ? প্রবৃত্তির সোনা-মুক্তা দিয়ে মোড়া একটা পোকা ছিলেন যেন তিনি। সিতারাবাঈ ! প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই, কারখানার বিশ্বকর্মা পূজা কমিটির সবাই মিলে লখ্‌নৌ থেকে বাঈজী আনিয়েছিল। অপূর্ব রূপসী বাঈজী। অস্বীকার করার উপায় নেই, অমন ভারতীয় রূপসী আগে কখনো দেখেন নি জেমস্। সোন্‌পাতিয়ার সৌন্দর্য ছিল আরণ্যক। মধ্যভারতের জঙ্গল থেকেই সে এসেছিল। আর সিতারাবাঈ ছিল যেন, ভারতের সৌন্দর্যের একটি জলন্ত হীরা। কারখানার অন্য অংশে ম্যারাপ বেঁধে, পূজা প্যাণ্ডেলেই নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল আলাদা। কিন্তু সিতারাবাঈকে দেখে, প্যাণ্ডেলে সর্বসমক্ষে নাচ দেখে শান্ত থাকতে পারলেন না জেমস্। তখনই তিনি অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার, অফিসের বড়বাবুকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, 'যত টাকা লাগে লাগবে, বাঈজীকে বলে দাও, সে আমাদের নাচঘরে নাচবে। কিন্তু মনে রেখো, বাঈজী যেন বলে, সে নিজের ইচ্ছায় সাহেবদের নাচ দেখাতে চায়, তাঁরা যেন দয়া করে দেখেন।'

ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে গিয়েছিল। ইওরোপীয় স্টাফের মধ্যে কেউ কেউ যে আপত্তি করে নি, তা নয়। কিন্তু অধিকাংশেরই চোখে সিতারাবাঈ নেশা ধরিয়ে

দিয়েছিল, অতএব নাচঘরে বাঈজীর নতুন আসর হয়েছিল। চারপাশে সোফা, মাঝখানে বাঈজীর আসর। কিন্তু সিতারাবাঈ নিশ্চয় জেমসের খবরটা জানত, তাঁরই অর্থে ও অনুরোধে সেই আসরের ব্যবস্থা এবং কেউ নিশ্চয় তাকে চিনিয়েও দিয়েছিল। সিতারাবাঈয়ের ঈষদারক্ত নিবিড় চোখের কটাক্ষ তাঁকে বারেবারেই হানছিল। যদিও সুর তান লয়, ইত্যাদি বিষয়ে কেউই অভিজ্ঞ নয় বলে, বাঈজীকে কেউই ঠিক উৎসাহিত করতে পারেন নি। কিন্তু জেমসের হুইস্কির গ্লাস মুহূর্তে মুহূর্তে খালি হয়ে যাচ্ছিল। এমন কি জুডির সামনেই, সোফা থেকে টলতে টলতে উঠে, সীতারাবাঈকে মদের গেলাস অফার করেছিলেন, তার হাতে পাত্র তুলে দিয়ে এসেছিলেন, সিতারা কুর্নিশ করে সম্মান দেখিয়েছিল। জেমসের সহকর্মী বন্ধুরা অনেকে হাততালি দিয়েছিল। কেবল জুডির চোখে ঘৃণার আগুন জলে উঠেছিল। অন্যান্য মহিলারাও কেউ বিশেষ প্রসন্ন হয় নি।

তারপরে এক আশ্চর্য কাণ্ড করেছিল সিতারাবাঈ। ওয়ালজ-এর সুরে সে উর্দু গান গেয়ে উঠেছিল। অনেকে নাচতে আরম্ভ করে দিয়েছিল জোড়ায় জোড়ায়। জেমস্‌ও জুডিকে হাত ধরে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জুডি শুধু উঠতেই চায় নি, তা নয়, সে অত্যন্ত ঘৃণাভরে বলে উঠেছিল, 'নেটিভ ড্যান্সিং গার্লটার মুখে লাথি মারতে ইচ্ছে করছে।' বলেই সে চলে গিয়েছিল কুঠিতে। আসর ভেঙেছিল রাত্রি একটায়। জেমস্‌ তার আগেই লুকিয়ে পড়েছিলেন নাচঘরের পিছন দিকে, যাতে সবাই ভাবে তিনি ফিরে গিয়েছেন। তারপর মেয়েদের প্রসাধন ঘরে এই আবদুলের সাহায্যেই দেখা করেছিলেন সিতারাবাঈয়ের সঙ্গে। সিতারাবাঈ প্রথমটা ভয় পেয়েছিল, তারপর অনেক অনুনয় বিনয় করেছিল জেমস্‌কে চলে যাবার জন্যে; কিন্তু অস্বীকার করার উপায় ছিল না, তার আরক্ত চোখে, জেমসের প্রতি আকাঙ্ক্ষার বহ্নি ফুটে উঠেছিল। নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিল সে।

এই আবদুল ছিল পাহারায়। ভোর রাতের দিকে, দরজায় টোকা পড়েছিল। জেমস্‌ দরজা খুলে দেখেছিলেন ভীত আবদুল। বলেছিল, 'মেমসাব আতা হ্যায়।'

ততক্ষণে কাঠের মেঝেয় জুডিয় পদধ্বনি বেজে উঠেছে। জেমস্‌ দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। জুডি আবদুলকে সাহেবের সন্ধান জিজ্ঞেস করেছিল। তারপরেই মেয়েদের বিশ্রাম ঘরের দরজায় ঘা পড়েছিল। সেই শব্দটাই শুধু শুনতে পেয়েছিলেন জেমস্‌। তিনি ততক্ষণে গরাদহীন জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, উত্তর দিক দিয়ে ঘুরে সোজা চলে গিয়েছিলেন

কারখানার অংশে। সেখানে, দারোয়ানকে দিয়ে অফিস খুলিয়ে, ফ্যান ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেন, দারোয়ানকে বলে দিয়েছিলেন, তাঁর এখুনি আসার কথা যেন মেম-সাহেবকে না বলা হয়। কিন্তু আশ্চর্য, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও জুডিকে তিনি আসতে দেখেন নি, এবং নিজে চেয়ারের ওপরেই এলিয়ে পড়েছিলেন। পরদিন যখন কোয়ার্টারে ফিরে গিয়েছিলেন, তখন বেলা আটটা, ব্রেকফাস্টের সময়। ব্রেকফাস্ট সাজানো ছিল টেবিলের ওপর। জুডির দেখা পান নি। সোজা চলে গিয়েছিলেন বাথরুমে। যখন জামাকাপড বদলে, পরিচ্ছন্ন হয়ে এসে বসেছিলেন, দেখেছিলেন, জুডি টেবিলের কাছে বসে আছে। জুডি ফিরে তাকায় নি, কিছু জিজ্ঞেস করে নি, খেতে অনুরোধ করে নি। কিছু জিজ্ঞেস করতে জেমসেরও অস্বস্তি হচ্ছিল, কারণ জিজ্ঞেস করার কিছুই ছিল না। তিনি যেন চুপসে যাচ্ছিলেন, অপরাধের ছায়া ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে। তবু তিনি ডেকেছিলেন, বলেছিলেন, 'এস, খাওয়া যাক।'

জুডি তবু নিরুত্তর। জেমস্ একটা কৈফিয়ত দেবার জন্যে সবে বলেছিলেন, 'যদিও অবিশ্যি সারারাত্রি—।'

কথা শেষ করতে পারেন নি। জুডি সরোষে হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় প্রায় টেবিলের সব কিছু মেঝেয় ফেলে দিয়েছিল। দিয়ে উঠে ছুটে চলে গিয়েছিল ঘরের মধ্যে, দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। খানসামা বেয়ারারা ছুটে এসেছিল। জেমস্ তাদের সব পরিষ্কার করতে বলে, দরজা খোলবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি। অভুক্তই কাজে চলে গিয়েছিলেন······না না, বড খারাপ, খুব অন্যায় করে-ছিলেন জেমস্। কেন তিনি নিজেকে রোধ করতে পারতেন না? কেন একবারও ভাবতেন না, এ বিশ্বাসঘাতকতা, পাপ। কারণ, তারপরেও যেদিনই বাঈজীর সঙ্গে বিদায়ের শেষ মুহূর্তও তিনি নাচঘরে কাটিয়েছিলেন বেলা চারটেয়। আর তিনদিন পরে সবই স্বীকার করেছিলেন জুডির কাছে। সব—সবই, এমন কি সিতারাবাঈকে ধরে রাখা, টাকা দেওয়া, সর্বোপরি ভাল লাগা, কিছুই গোপন করেন নি। জুডি দুঃসহ কান্না কেঁদেছিল, আর বারেবারে বলেছিল, 'ঈশ্বর, আমাকে কেন এমন ক্ষমতা দেন নি, যাতে তোমাকে ত্যাগ করতে পারি।'

আবদুলের হাতটা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন জেমস্। বললেন, 'বিলকুল সব ইয়াদ হায়। আবদুল তুমি আমাকে নিশ্চয় মনে মনে অনেক গালি বকেছ, ঘৃণা করেছ।'

'তোবা তোবা সাব্, এমন কথা বলবেন না।'

'কেন আবদুল, সে সব কি পাপ নয়?'

'আপনি খোদা নন, দুনিয়ার মানুষ সব এক রকম নয়। হুজুর, আমার ভাষায় একটা গান আছে, "খোদা তুমি আমাকে কেন এমন ফুলের বাগিচায় পাঠিয়েছো? আমার চোখ আছে দেখতে পাই, নাক আছে গন্ধ পাই, আমার চামড়ার নিচে প্রতিটি রক্তকণা সব কিছুই ছুঁয়ে স্বাদ নিতে চায়। তুমি অনেক কাঁটা রেখেছ বটে, কিন্তু কী করব, কাঁটার যন্ত্রণা আর রক্তপাত যে আমাকে দমাতে পারে না।"

জেমস্ অবাক হয়ে, বৃদ্ধ বেয়ারার মুখে কবিতা শুনলেন, ভাবলেন, সত্যি অনেক কাঁটা, অনেক যন্ত্রণা রক্তপাতও ছিল, তবু থামতে তো পারেন নি জেমস্। আবদুল বলল, 'মগর সাব্, এই কোম্পানির হাজার লাখ রুপেয়া চুরি হতে দেখেছি, সবাই জানত, বাইলি সাবকা পাস চোরাই রুপেয়া হারাম হ্যায়। সব ম্যানেজারই লাখ লাখ টাকা চুরি করেছে। আপনার নামে কোনদিন সে কথা কেউ বলে নি।'

জেমস্ বললেন, 'উস্‌সে মেরা দিল ছোটা হোত।'

'গোস্তাকি না লিজিয়ে সাব, আপ আওরত লোগকা দিল চোরায়া, ইসকে বারে খোদাকে যো ফরমান মিলেগা, মান লিজিয়ে, ব্যস্। মগর, আপনি কারুর ইজ্জত নেন নি, কারুর ঘর ভাঙেন নি, কাউকে খুন—।'

আবদুলের কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। দুই অশীতিপর বৃদ্ধের পরস্পরের চোখের দৃষ্টি মিলল। আবদুল তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে, ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, আপনি খুন করেন নি।'

জেমসের বৃদ্ধ-স্বর রুদ্ধ হয়ে এল, বললেন, 'আমি নয়!'

'না, কভি না।'

জেমস্ হঠাৎ হাত ধরে টানলেন আবদুলকে, বললেন, 'চল একটু, দুজনে যাই, অওরৎ লোগ্‌কো কামরা চল। উধার কোই নহী তো?'

'কোই নহী, অওরৎ নহী আতী।'

মঞ্চে যাবার পাশের গলি দিয়ে, জেমস্ আবদুলের হাত ধরে এগিয়ে গেলেন। বাঁদিকে মঞ্চটা দেখে একবার দাঁড়ালেন। সামনেই পিয়ানোটা রয়েছে। সামলাতে পারলেন না, এগিয়ে গেলেন। মঞ্চ থেকে দাঁড়িয়ে নাচঘরের মস্ত হল্ দেখলেন; তারপর পিয়ানোর ঢাকনা সরিয়ে রীড-এর ওপর ঝুঁকে দু'বার টোকা দিলেন। খাদের পর্দায় দু'বার গম্ভীর স্বর বেজে উঠল। আর নাচঘরের দেয়ালে দেয়ালে মৃদু প্রাতধ্বনি হল ঢং ঢং। আর পুরনো দিনের সেই সব জাদুকর বাজিয়েদের বাজনা

জলতরঙ্গের মত তাঁর স্মৃতি মন্থিত করে বেজে উঠল। আর একবার তাঁর চোখের সামনে বহু নরনারীর নাচের ছবি ভেসে উঠল। তার মধ্যে জুডি—জুডি আর, হ্যাঁ, লুক্রেজিয়ার সেই স্লাভ নৃত্য। গোয়ানীজ মেয়েটা কতই কী জানত।

একটা নিশ্বাস ফেলে ঢাকনাটা ঢেকে, আবদুলের কাঁধে হাত রাখলেন। গলি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে, ডান দিকের দরজাটা খুলে দিল আবদুল। মেয়েদের বিশ্রাম ঘর। আলোটা জ্বালানোই রয়েছে। এখন মাত্র কয়েকটা সোফা, এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে। লাল রং-এর কাপড়ে ঢাকা গদি-গুলোতে ধুলো পড়েছে, বোঝা যায়। পোকায়ও হয়তো খাচ্ছে। ছোট ছোট শ্বেতপাথরের টেবিলগুলো সব নেই, দু'তিনটে, না সাজানো অবস্থায় এখানে সেখানে। বড় আয়না মাত্র একটাই আছে। বড় ড্রেসিং টেবিলটা নেই। মেঝে খোলা, সেখানে গালিচা নেই।

জেমস্ ঢুকলেন, আর অনেকগুলো মুখ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু লুক্রেজিয়াই শেষ, বাদামী রঙের সেই মেয়েটি। শেষ পর্যন্ত আর কারুর মুখই মনে পড়ছে না। জেমস্ ভিতরের দরজা দিয়ে বাথরুমের দিকে গেলেন। পর পর বাথরুম, সবগুলোতেই ফ্যান ঝোলানো। দেওয়ালে সারি সারি আয়না গাঁথা। জীবনে, সারা জীবনের মধ্যে, পুরো সাতদিন এই মেয়েদের ঘরেই বাস করেছিলেন জেমস্। লুক্রেজিয়ার সঙ্গে ছিলেন। কলকাতায় নাচতে এসেছিল মেয়েটি, তারপরে এখানে তাকে ডেকে আনা হয়েছিল। কী এক আশ্চর্য মুহূর্তে যে লুক্রেজিয়ার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়েছিল, কে জানে। জেমসের তখন চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। লুক্রেজিয়া তাঁকে ছাড়তে পারল না, তিনিও ছাড়তে পারলেন না। জুডি তাঁকে ভালবেসেছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার মধ্যে ছিল, অনেক শাসন নিষেধ বিত্ত সম্মান একনিষ্ঠতার সুউচ্চ প্রাচীর, সমাজে যার মূল্য সর্বাধিক এবং থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাণের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরছিলেন জেমস্। তখন মনে হয়েছিল, নির্বিচার ভোগ নয়, প্রাণকে প্রতিটি মুহূর্তে স্পন্দিত করার জন্যে একটি, একটিই মুক্তধারা দরকার। হয়তো ভুল ভেবেছিলেন, যুক্তি দিয়ে ধারাস্নানের উৎস যে কেউ প্রাণ থেকে ছিটিয়ে দেবে, যে কারণে তুমি কথনোই আর কোথায়ও যেতে চাইবে না, তা বোধহয় এ বিশ্বসংসারে নেই।

তবু তখন লুক্রেজিয়া, আধা পর্তুগীজ আধা ভারতীয় মেয়েটিকে পেয়ে এ সবই মনে হয়েছিল। এবং অপ্রতিরোধ্য দ্বন্দ্ব বেধেছিল জুডির সঙ্গে। জুডি ডাইভোর্স চেয়েছিল। জেমস্ তাতেও রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু জুডি শেষ রক্ষা করতে

পারল না। একদিন সন্ধ্যাবেলায়, উন্মাদিনীর মত সে গুলিভরা পিস্তল নিয়ে ছুটে এল এই নাচঘরে। আবদুলের কাছে শুনেছিলেন, লুক্রেজিয়া তখন সামান্য অন্তর্বাস পরে, এই ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আবদুলই তাকে বলেছিল, স্ক্রীনের মধ্যে ঢুকে যেতে। তাই গিয়েছিল সে। আর জুডি তন্ন তন্ন করে সারা নাচঘর তাকে খুঁজেছিল। আবদুলের বুকের ওপর পিস্তল ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় সে ?' আবদুল সত্যি কথা বলতে পারেনি, বলেছিল, 'চলে গেছে।' জুডি বিশ্বাস করে নি। আবদুলকে গালে থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছিল। জেমস্ একটু পরে এসেছিলেন। প্রধান দরজার কাছেই জুডির সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, জুডি তাঁকেই গুলি করবে। জিজ্ঞেস করেছিল, 'সেই বাদামী কুকুরীটা কোথায় ?'

জেমস্-এর চোখেও আগুন দেখা দিয়েছিল। বলেছিলেন, 'কেন, তাকে মারবে ?'

'সেটা সামনে পেলে দেখতাম।'

'তার দেখা তুমি পাবে না। তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ।'

জুডি চিৎকার করে উঠেছিল, 'উন্মাদ নয়, আমি খুনী হয়েছি। হয় তুমি তাকে বের করবে, নয় আমি তোমাকে গুলি করব।'

আবদুল থরথর করে কাঁপছিল। জেমস্ এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'তবে সেটাই কর।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই ভুল করে ফেলেছিল লুক্রেজিয়া।

অল্পবয়সী গোয়ানীজ নর্তকীটি, যার পর্তুগীজ পিতার ভবঘুরে নিষ্ঠুর রক্ত ভারতীয় মায়ের গর্ভে কোমল স্নেহসিক্ত সরল একটি মেয়ে সৃষ্টি করেছিল, জীবনের চাপে যে নর্তকী হয়েছিল, যার দেহও নিশ্চয় অনাঘ্রাত স্পর্শহীন ছিল না, তবু প্রাণের মধ্যে একটি সহজ মানবী বেঁচেছিল, সে স্ক্রীনের বাইরে চলে এসেছিল। বলেছিল, 'না, মিসেস ওয়াইলি, আপনার স্বামীকে মারবেন না।'

জুডির কাছে, লুক্রেজিয়ার সেটা আরো বড় অপরাধ বলে গণ্য হয়েছিল, এবং নিজের পরাজয় যেন বেশী করে বেজেছিল। সে পর পর তিনবার ট্রিগার টিপেছিল। দুটো গুলি লুক্রেজিয়ার দেহ ভেদ করেছিল। জুডি আর দাঁড়ায়নি, ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। জেমস্ ছুটে গিয়েছিলেন লুক্রেজিয়ার কাছে। লুক্রেজিয়ার শরীরটা তখন স্ক্রীনের পাশে, অর্ধেক মঞ্চের ওপরে, অর্ধেক নীচের দিকে ঝুলে পড়েছিল। এত দ্রুত মৃত্যু হয়েছিল, লুক্রেজিয়া আর একবারও তাকায়নি; আর একটি কথাও বলেনি।

আবদুল মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে তার চোখগুলো বড় হয়ে উঠেছিল জেমস্ কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলেছিলেন, 'সমস্ত বাতি নিভিয়ে দাও' খালি একটা ছোট আলো জালিয়ে রাখ।' সৌভাগ্য, সেদিন নাচঘরে কেউ আসেনি তখনো। তবে আসবার সময় হয়ে এসেছিল। জেমস্ লুক্রেজিয়াকে কাঁধে তুলে, নাচঘরের পিছনে, অন্ধকার নদীর ধাপে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবদুলও সঙ্গে গিয়েছিল। তখন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী, লুক্রেজিয়ার মৃত ঠোঁটে শেষ চুম্বন এঁকে, জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। একবারও ভাবেননি, তার কি পরিণতি হতে পারে। যদিচ সত্যি পরিণতি মন্দ কিছুই হয়নি। কারণ লুক্রেজিয়ার কোন খবর কেউ আর নিতে আসেনি।

কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে দেখেছিলেন, জুডি নেই। সাত বছরের মেয়েকে নিয়ে সে ওর রিটায়ার্ড বাবার কাছে, কলকাতায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ যাওয়া নয়, বছর খানেক পরে আবার ফিরে এসেছিল, একসঙ্গে সারাটা জীবন কেটেছে। কিন্তু জুডি আর কখনোই পরিপূর্ণ চোখ তুলে কথা বলতে পারেনি। লুক্রেজিয়া বোধহয় সারাজীবনই তাকে ঘিরেছিল। পরে তাকে দেখে কষ্ট হত।

স্টাফের সবাই জানত ; লুক্রেজিয়া চলে গিয়েছে। আবদুলও তাই বলেছিল। সে-ই শুধু সত্য জানত।

কলকাতায় ফিরতে হবে বলে, আবদুলের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন জেমস্। তখন দুটি ভারতীয় ছেলে টেবিল টেনিস খেলছিল। আবদুলের হাত ধরা একজন বুড়ো সাহেবকে দেখে, তারা একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। একজন বলে উঠল, 'গো অন মাই ফ্রেণ্ড, গো অন।'

আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে ওরা খেলতে আরম্ভ করল। জেমস্ মনে মনে বললেন, 'ইয়েস, গো অন মাই বয়, গো অন। কিছুই পড়ে থাকবে না, সব কিছুই চলতে থাকবে, চলতে থাকবে।'

বাইরে এসে আবদুলকে বললেন, 'আবদুল, তুমি আর এস না, আমি যাই।'

আবদুল বলল, 'আজকের এই দিন বাইলি সাব, আমি ভুলব না। মনে হয়, আপনি আসবেন বলেই বেঁচে ছিলাম। চলুন, আপনাকে আমি রিক্‌শায় তুলে দিয়ে আসব। নইলে আপনার তখলিফ্ হবে।'

এক কালো বুড়ো, এক সাদা বুড়োকে নিয়ে এগিয়ে গেল।

বিপরীত রঙ্গ

ঘটনাকাল : সমসাময়িক। স্থান : পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা শহর। পাত্রপাত্রী : কাল্পনিক।

এ বিষয়ে আগেই বলে রাখতে হলো, কারণ, সময় স্থান ও পাত্রপাত্রী বিষয়ে, এর থেকে বেশি কৌতূহল মেটানো সম্ভব না। ঘটনার শুরু, একটি মেল ট্রেনের দুই বার্থযুক্ত প্রথম শ্রেণীর কুপে এর মধ্যে।

অনিরুদ্ধর ঘুমটা পাতলা হয়ে এলো। ও ভাববার চেষ্টা করলো, বিছানা এরকম ঝাঁকানি খাচ্ছে কেন, বা শব্দটাই বা কিসের। তন্দ্রার মধ্যে, এ কথা চিন্তা করে, পাশ ফিরতে যেতেই, ওর মাথায় ঠক্ করে আঘাত লাগলো, এবং আঘাতের দরুন চোখ খুলে, কিছু দেখবার আগেই, মনে পড়ে গেল, ও ট্রেনের যাত্রী, শুয়ে আছে ওপরের বার্থে। ও চোখ মেলে কামরার দিকে পাশ ফিরে তাকালো। অন্ধকারের মধ্যেও, একটা আলোর রেশ ভিতরে এসে পড়েছে। অনিরুদ্ধ বাঁ হাতটা চোখের সামনে এনে, কব্জির ঘড়ি দেখলো, ছ'টা বাজতে দশ মিনিট বাকী। তার মানে গন্তব্যে পৌঁছুতে, এখনো দু' ঘণ্টার ওপর বাকী।

অনিরুদ্ধ আস্তে আস্তে উঠে বসলো, সাবধানে, নীচের বার্থের দিকে একবার ঝুঁকে দেখলো। ওর সহযাত্রী এখনো নিদ্রা যাচ্ছেন। সহযাত্রীর বয়স সম্ভবত ওর থেকে বেশি না, বরং দু' চার বছর কমই হতে পারে। মেদবাহুল্য এবং আচার আচরণ মানুষকে অনেক সময়, প্রকৃত বয়স থেকে, বার্ধক্য এনে দেয়। সহযাত্রীকেও সেইরকমই মনে হয়েছিল গত রাত্রে। নিজে যেচেই আলাপ করেছিলেন, গন্তব্য জানতে চেয়েছিলেন, এবং অনিরুদ্ধর ও তাঁর একই গন্তব্য জেনে, খুশি হয়েছিলেন। আরো বেশি কৌতূহলিত হয়ে জানতে চেয়েছিলেন, অনিরুদ্ধ তাঁরই স্ব-জেলাবাসী কী না। অনিরুদ্ধ হেসে জানিয়েছিল, ও নিতান্তই কার্যব্যপদেশে, উক্ত জেলাশহরে যাচ্ছে। শহরে অবস্থানকালে, আশেপাশের নানান জায়গায় ওকে ঘুরে বেড়াতে হবে। সহযাত্রী অনিরুদ্ধর কাজের বিষয়টাও জানতে চেয়েছিলেন। অনিরুদ্ধ অস্বস্তি বোধ করলেও, ওর কাজের বিষয়ে বলেছিল, কারণ কোনো নিষিদ্ধ কাজে ও যাচ্ছে না।

অনিরুদ্ধ অবিশ্যি সহযাত্রীর নাম ধাম পেশা কিছুই জিজ্ঞেস করেনি, কারণ ওটা

ওর কাছে শালীনতা বিরুদ্ধ। লোকটিকে এমনিতে মন্দ লাগে নি। পোশাকে-আশাকে তাঁকে অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয়েছে, এবং কিঞ্চিৎ বিলাসীও। তাঁর গা থেকে বেরোচ্ছিল, দামী বিদেশী সু-গন্ধির গন্ধ। রাত্রেও তিনি শোবার আগে ব্যবহার করেছিলেন বিদেশী অডিকোলন। তাঁর হাতের সোনার আংটিতে ভারী আর মূল্যবান পাথরের ঝিলিক। সম্ভবত তাঁর ট্রাউজার এবং জামাও বিদেশী দামী কাপড়ের তৈরি। অনিরুদ্ধর অনুমতি নিয়েই, রাত্রে খাবার আগে, তিনি বিদেশী সুরার বোতল খুলে, অল্প পান করেছিলেন, এবং অনিরুদ্ধকেও অনুরোধ করেছিলেন। অনিরুদ্ধ সবিনয়ে অসম্মতি জানিয়েছিল, সহযাত্রী আর বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন নি। সেই সুরাপানের অবকাশেই জানা গিয়েছিল সহযাত্রী একজন ব্যবসায়ী, এবং কেবল জেলা শহরে না, জেলাব্যাপীই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। প্রায়ই তাঁকে কলকাতা যেতে হয়। কলকাতায় তাঁর নিজস্ব বাড়ি গাড়ি সবই আছে। জেলাশহরের বিষয়ে তো কোনো কথাই নেই।

অনিরুদ্ধ আস্তে আস্তে ওপর থেকে নামলো। অনুমান করলো, সহযাত্রীর নিদ্রা এখনই সম্ভবত ভাঙবে না। সুরার ক্রিয়া কিছু নিশ্চয়ই থাকবে। অনিরুদ্ধ আস্তে দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এলো। কোনো স্টেশন এলে, একটু চা পান করা যায়। সেই আশা নিয়েই ও বগীর বাইরের দরজার কাছে গেল। অ্যাটান-ডেন্ট গার্ড তার জায়গায় বসেছিল। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, দশ মিনিটের মধ্যেই একটি স্টেশন আসছে, সেখানে চা পাওয়া যাবে।

অনিরুদ্ধ আশ্বস্ত হলো। গরম বেশ আছে। ও দরজা খুলে দাঁড়ালো। কলকাতা থেকে দূর জেলার ভোরের রোদ, ক্ষেত-খামার গ্রাম গাছপালা, সবই যেন চোখ থেকে একটা পর্দা সরিয়ে দিল, উজ্জ্বল করে তুললো দৃষ্টি, সেই সঙ্গে অনুভূতি। মাঠে স্ত্রী পুরুষরা কাজ করছে, খুবই কম। এখন মাঠে সবুজ শস্যের মেলা, পাকবার প্রত্যাশা। আকাশে কোথাও হালকা মেঘ ভাসছে।

দশ মিনিটের মধ্যেই স্টেশন এলো। চা-ও পাওয়া গেল। চা পানের পরই, অনিরুদ্ধ মুখ ধোওয়া থেকে দাড়ি কামানো, এবং অল্পস্বল্প ধোয়ামোছা সেরে, ট্রেনে রাত্রিযাপনের গ্লানি কিছুটা কাটিয়ে নিল। পোশাক-আশাকেও একটু পরিষ্কার হয়ে নিল। ইতিমধ্যে ওর সহযাত্রীর ঘুম ভেঙেছে। তার তৈরী হবার তেমন গা দেখা গেল না। অনিরুদ্ধকে বললেন, 'আপনি তো দেখছি ফিটফাট। গাড়ি থেকে নেমে কোথায় যাবেন?'

অনিরুদ্ধ বললো, 'আগে কোনো একটা হোটেলে উঠবো।'

'কোন্ হোটেলে উঠবেন ভেবেছেন?'

'কিছুই ভাবি নি, আমি এ অঞ্চলে নতুন এসেছি। তবে একটা হোটেলের নাম জেনে এসেছি, শুনেছি সেটা ভালো হোটেল।'

সহযাত্রী বললেন, 'আপনি আমাকে বলুন না। শহরের ছোট বড় ভালোমন্দ সব হোটেল আমার জানা আছে।'

অনিরুদ্ধ হোটেলের নাম বলতে, সহযাত্রী মাথা ঝাঁকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি যে হোটেলের কথা বললেন, সেটাই সব থেকে বড় আর দামী হোটেল বটে। জায়গাটাও ভালো, একটা পাহাড়ী টিলা ঘেঁষে, নিরিবিলি। তবে আগের মতো আর তার সুনাম নেই।'

অনিরুদ্ধ জিজ্ঞেস করলো, 'কেন বলুন তো?'

সহযাত্রী বলে উঠলেন, 'ঠাটেই সব গেল। ভেতরে ফক্কিকারি। খাওয়া-দাওয়া যাচ্ছেতাই, দাম কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। এয়ারকনডিশনও নামে মাত্রই, একটা মেশিনও যদি ভালো থাকে।'

অনিরুদ্ধ সহযাত্রীর কথা বিশ্বাস করবে কী না বুঝতে পারছে না, কিন্তু খট্‌কা ঠিকই লাগছে।

সহযাত্রী আবার বললেন, 'আপনাদের স্যার, ওসব জায়গায় পোষায় না। হলোই বা কায়দার হোটেল।'

সহযাত্রীর 'স্যার' সম্বোধনটা অনিরুদ্ধর কানে যেন খট্ করে বাজলো। তাকিয়ে দেখলো, সহযাত্রী যেন আপন মনে মিটিমিটি হাসছেন। আবার বললেন, 'মানে আমি বলছি, আপনার মতো লোকের ওসব আদব কায়দার থেকে, অভিজাত জায়-গাতেই বেশি ভালো লাগবার কথা।'

অনিরুদ্ধ অবাক হলো। ওর মতো লোকের আবার নিরালা অভিজাত স্থানের কী দরকার? কী ভেবেই বা সহযাত্রী এরকম বলছেন? অনিরুদ্ধ ওর বিস্ময় বা কৌতূহল প্রকাশ করলো না। সংসারে কতো রকমের মানুষ আছে। তাদের কথাবার্তা আচরণের কথা বেশি ভাবতে গেলে চলে না। বললো, 'আমি সব জায়গাতেই থাকতে পারি। তবে হ্যাঁ, বলতে পারেন, একটু ভিড় বাঁচিয়ে থাকতে ভালো লাগে।'

'সেই কথাই তো আমি বলছি।' সহযাত্রী বলে উঠলেন, 'আমি জানি, ভিড়ে আপনার মতো লোকের ভালো লাগতে পারে না। কিন্তু যে হোটেলে যাচ্ছেন, সেখানে কি আপনি ভিড় এড়াতে পারবেন ভেবেছেন? মোটেই না স্যার।'

আবার 'স্যার'? এবং 'আপনার মতো লোকের' মানেই বা কী? অনিরুদ্ধ সহযাত্রীর দিকে দেখলো। তিনিও অনিরুদ্ধর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর ঠোঁটে ও চোখে যেন একটু অর্থপূর্ণ হাসি। অনিরুদ্ধ অবাক হলেও, মুখের অবস্থা স্বাভাবিক রেখে বললো, 'আমি তো সারাদিন কাজে-কর্মেই ব্যস্ত থাকবো। হোটেলের ঘরে দরজা বন্ধ করলে, কে আর আমাকে বিরক্ত করতে আসবে।'

সহযাত্রী হেসে বললেন, 'সে তো আপনি ভাবছেন। বিরক্ত করতে যখন আসবে, তখন আপনি সামলাবেন কী করে স্যার?'

সেই 'স্যার'! অনিরুদ্ধ ভাবলো বয়স অল্প হলেও, ভদ্রলোকের বোধহয় একটু মতিচ্ছন্নতা আছে। তা না হলে তাঁর মতো একজন সম্পন্ন বিলাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধকে এরকম করে বলবেন কেন? অনিরুদ্ধ কোনো জবাব না দিয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। বাইরে ক্রমেই যেন লোকালয় বেড়ে উঠছে। গ্রামীণ প্রকৃতির মধ্যে, আস্তে আস্তে যেন শহরের রূপ ফুটে উঠছে।

'আচ্ছা, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো? আপনার মুখ খুবই চেনা চেনা লাগছে।' সহযাত্রী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন।

অনিরুদ্ধ তেমন অবাক হলো না, বললো, 'কলকাতাতেই কোথাও দেখে থাকবেন। বাইরে বাইরেই তো কাজ করতে হয়।'

সহযাত্রী বললেন, 'কলকাতাতে দেখেছি বা আরো কতো জায়গায় দেখেছি কে জানে। তবে এ মুখ ভোলবার না।'

ভোলবার না! অনিরুদ্ধ মনে মনে নিশ্চিত হলো, সহযাত্রীটির ভাবনা চিন্তা খুব স্বাভাবিক না। ও প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললো, 'আপনার নামটা কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

সহযাত্রী ডান হাত তুলে বললেন, 'আমাদের আবার নাম। তবে জিজ্ঞেস করলেন, বলতেই হয়, আমার নাম রূপক সমাদ্দার।'

রূপক সমাদ্দার নাম বলে হাত জোড় করলেন এবং এই প্রথম অনিরুদ্ধ লক্ষ্য করল, রূপক সমাদ্দারের জামার বোতাম খোলার ফাঁকে, থলথলে বুকে একটি সোনার হার গলা থেকে নেমে এসে চিকচিক করছে। আজকাল এরকম কিছু লোক দেখা যায়, যারা যথেষ্ট আধুনিক পুরুষ, গলায় সোনার হার ঝুলিয়ে বেড়ায়। সোনার হারের লকেটটি সম্ভবত মাদুলি বা তাবিজ জাতীয় কিছু হবে। বড়বাজার বা উত্তর কলকাতায় এক শ্রেণীর মানুষের গলায় সোনার হার না থাকাটাই আশ্চর্যের,

কারণ মনে হয়, ওটা তাদের ট্রাডিশন এবং টেস্ট-এর বৈশিষ্ট্য। রূপক সমাদ্দারকে সেই দলে ফেলা যায় কী না, অনিরুদ্ধর কোনো ধারণা নেই।

রূপক সমাদ্দার তাঁর জোড় করা হাত তুলে বললেন, 'আপনার নামটা তো স্যার কাল রাত্রেই আমি শুনে নিয়েছি।'

বলেই তিনি তাঁর সর্বাঙ্গের অথৈ মেদে ঢেউ তুলে হোহো করে হেসে উঠলেন। অনিরুদ্ধ অবাক! হঠাৎ এতো হাসির কী ঘটলো, বুঝতে পারলো না। ও রূপকের দিকে তাকালো। লোকটা প্রকৃতিস্থ তো? না কি অনিরুদ্ধকে অপমান করবার মতলব? তা না হলে নামের কথা বলে এভাবে হেসে ওঠার কারণ কী? কিছু জিজ্ঞেস করবার আগে, রূপক সমাদ্দার নিজেই হাসি থামিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, হয়তো একটু বেয়াদপি করে ফেলেছি, ক্ষমা করবেন।'

লোকটাকে রীতিমতো রহস্যময় মনে হচ্ছে। রহস্যময় না বলে, উন্মাদ বলাই ভালো, এবং অনিরুদ্ধ কোনো উন্মাদের সঙ্গে, অকারণ কথা বাড়াতে চায় না। ও কিছু না বলে হাতের কাছে অ্যাটাচিটা খুলে সানগ্লাস বের করে চোখে পরে নিল। জানালা দিয়ে চোখের ওপর রোদ পড়ছিল। সানগ্লাসটা পরে, দ্রুত চোখের কোণে একবার রূপক সমাদ্দারকে দেখে নিল। লোকটি ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন, ঠোঁটের কোণে সেই অর্থপূর্ণ হাসি এবং চোখেও। তারপরেই বার দুয়েক ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাতের কবজি ঘুরিয়ে দামী ঘড়ির দিকে দেখলেন, বলে উঠলেন, 'এসে পড়লাম দেখছি।'

অনিরুদ্ধ মনে মনে বললো, 'বাঁচা গেল। অন্তত পাগলের পাল্লা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।'

রূপক সমাদ্দার তাঁর মেদ থলথলে বিশাল শরীর নিয়ে নানান কসরতে উঠে দাঁড়ালেন। আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সিল্কের লুঙ্গির কষি আঁটলেন। জিনিসপত্র গোছাবার তেমন তাড়াহুড়ো দেখা গেল না। দু' হাত দিয়ে চুলটা একটু ঠিকঠাক করে নিলেন। আংটির পাথরে ঝিকিমিকি খেলছে।

ইতিমধ্যে গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এলো। চারপাশে মালগাড়ি, লোকো শেড, কাজের লোকদের ব্যস্ততা, ধোঁয়া আর ছাইয়ের ছড়াছড়ির মধ্যে, জেলা শহরের ভিতর দিয়ে, গাড়ি স্টেশনে ঢুকলো। কুলিরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠতে লাগলো। অনিরুদ্ধ উঠে দাঁড়ালো এবং কুলিকে ডাকলো। রূপক সমাদ্দার বলে উঠলেন, 'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, বসুন না। আমার গাড়িতে আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো।'

অনিরুদ্ধ ভাবলো, খুবই সুখের কথা, কিন্তু একই সঙ্গে ভয়েরও। রূপক সমাদ্দারকে ও বুঝতে পারছে না। তা ছাড়া, ওকে লিফট্‌ দেবারই বা কী দরকার। বললো, 'না না, তার কোনো দরকার হবে না। আমার তো একটা স্যুটকেস, রিকশাতেই চলে যাবো। এখানে তো সাইকেল রিকশা আছে।'

'সব আছে।' রূপক সমাদ্দার বললেন, 'আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আলাপ পরিচয় যখন হয়েই গেল, আপনার একটু সাহায্যে লাগি।'

এ সময়েই একটি বাইশ তেইশ বছরের যুবক কামরার মধ্যে ব্যস্তভাবে ঢুকে বললো, 'এই যে দাদা, তুমি এসে গেছো?'

রূপক সমাদ্দার বললেন, 'হ্যাঁ। তারাপদ নাকি রে? শোন্‌, গাড়ি এসেছে?'

তারাপদ নামক তরুণ বললো, 'হ্যাঁ এসেছে।'

রূপক বললেন, 'বেশ! তুই এক কাজ কর। কামরার মধ্যে যা কিছু আছে, সব কুলির মাথায় চাপিয়ে নিয়ে আয়। আমি ওঁকে নিয়ে এগোচ্ছি।'

তারাপদ অনিরুদ্ধকে একবার দেখলো, তারপরে বললো, 'আচ্ছা, তোমরা যাও।

রূপক অনিরুদ্ধকে ডাকলেন, 'আসুন।'

অনিরুদ্ধ আবার আপত্তি জানালো, 'থাক্‌ না মিঃ সমাদ্দার, আমি ঠিকভাবেই—।'

'জানি, জানি স্যার।' রূপক বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি একলাই যেতে পারবেন। না হয় আমিই আপনাকে নিয়ে গেলাম। চলুন চলুন, কিছু ভাববেন না।'

অনিরুদ্ধর হাত না ধরলেও, পথ দেখিয়ে, প্রায় জোর করেই, রূপক ওকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। অনিরুদ্ধ হাতে টিকিট নিয়ে রেখেছিল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে, রূপক এদিক ওদিক তাকালেন। একজন এসে বললো, 'বাবু, গাড়ি ওখানে রেখেছি আসুন।'

অনিরুদ্ধ এই অপরিচিত শহরে, খানিকটা অসহায়ভাবেই রূপককে অনুসরণ করলো। মনে মনে ভাবলো, কী এক পাগলা উপকারীর পাল্লায় ওকে পড়তে হলো। আশেপাশের লোকজন, ভাড়াটে গাড়ির ড্রাইভাররা ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। নিশ্চয় রূপককেই দেখছে। কেউ কেউ হাত তুলে নমস্কারও

করছে। রূপক মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিচ্ছেন। ঠোঁটের কোণে তাঁর হাসি, বিশাল বপুর পদক্ষেপে যেন দর্প।

রূপক সমাদ্দার এসে দাঁড়ালেন, তৈরি একটি ঝকঝকে গাড়ির কাছে। ড্রাইভার সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দিল। অনিরুদ্ধ শেষ চেষ্টা করে বললো, 'আমি অনায়াসেই একটা রিকশা নিয়ে চলে যেতে পারতাম, আপনি মিছিমিছি—।'

'কিছু ভাববেন না।' রূপক সমাদ্দারের এক কথা, যার মানে হলো, ভবী ভোলবার না। বললেন, 'না হয় আমাকে একটু সুযোগ দিলেন স্যার। আফটার অল্, আপনি এসেছেন আমাদের শহরে। আমি জেনে শুনে, আপনাকে একেবারে ছেড়ে দিই কেমন করে।'

অনিরুদ্ধ অবাক চোখে রূপকের দিকে তাকালো। 'জেনে শুনে' মানেটা কী! রূপক সমাদ্দার অনিরুদ্ধকে জানলেন কী করে! ভদ্রলোক যেন ওকে মন্ত্রী-টন্ত্রীর সম্মান দিতে আরম্ভ করেছেন। 'স্যার স্যার' করছেন অনেকক্ষণ থেকেই। কথাবার্তা শুনে মনে হয়, অনিরুদ্ধর কি সত্যি এ বিষয়ে কিছু করবার বা ভাববার আছে? অচেনা জায়গায়, অপরিচিত একজন যদি ওকে কিছু একটা হোমরা-চোমরা ভেবে, হোটেলে লিফট্ দিতে চায়, দিক। শহরটা ওর কাছেও অচেনা। হোটেলটা কোথায় কত দূর, ওর কোনো ধারণা নেই। অন্তত হোটেল অবধি, এই যাচা উপকার গ্রহণ করা যাক।

রূপক সমাদ্দার অনিরুদ্ধকে নিয়ে, পিছনে বসতে বসতেই তারাপদ কুলির মাথায় দিয়ে, মালপত্র এনে হাজির করলো। ড্রাইভার সমস্ত মাল পিছনের ক্যারিয়ারে তুলে নিল। অনিরুদ্ধ কুলির মজুরি দেবার জন্য পকেট থেকে পয়সা বের করতেই, রূপক বললেন, 'আহা, রাখুন না স্যার। কুলির পয়সা তারাপদ মিটিয়ে দিয়েছে। আপনি একটু আরাম করে বসুন।'

অনিরুদ্ধর কিছু বলার নেই। অন্তত যতোক্ষণ এই রূপক সমাদ্দার সঙ্গে আছেন। তারাপদ কুলির পয়সা মিটিয়ে, ড্রাইভারের পাশের সীটে বসলো। ড্রাইভার উঠে গাড়ি চালালো। রূপক সামনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারাপদ, এখানকার কাজকর্ম কী রকম চলছে রে?'

তারাপদ বললো, 'ভালোই চলছে। আমাদের প্রায় দেড় লাখ টাকার পেমেন্ট পাওয়ানা পড়ে রয়েছে। আপনার সই হলেই হয়ে যায়।'

রূপক বললেন, 'সব হয়ে যাবে। পাহাড়ের ব্যাপারে, টেণ্ডারে আমরাই এখনো লোয়েস্ট আছি তো?'

তারাপদ বললো, 'হ্যাঁ। দু' একদিনের মধ্যেই আপনার ডাক পড়বে।'

রূপক বললেন, 'জানি। সেইজন্যই ছুটে আসতে হলো।'

গাড়ি তখন ঘন এবং জনবহুল শহরের উপর দিয়ে ছুটছে। রূপক সমাদ্দারের কথা থেকে অনিরুদ্ধ অনুমান করতে পারছে, সে একজন ধনী কণ্ট্রাক্টর। গত রাত্রে জেনেছে, তাঁর চা বাগিচাও আছে। ভূসম্পত্তিও কিছু কম নেই। কিন্তু সে বিষয়ে ভেবে ওর কোনো লাভ নেই। ও রাস্তার ধারে বড় বড় সাইনবোর্ডগুলো দেখছে, হোটেলের নামটা চোখে পড়ে কী না। শহরটাকে ও যতোটা ছোট ভেবেছিল, তা না। বেশ বড় এবং ব্যস্ত শহর।

রূপক সমাদ্দার মাঝে মাঝে ড্রাইভারকে পথনির্দেশ করছেন, সেই অনুযায়ী ড্রাইভার চালিয়ে চলেছে।

তারাপদ এক সময়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কি বাড়ি যাচ্ছেন না?'

রূপক বললেন, 'না। আগে ওঁর ব্যবস্থা করবো, তারপর বাড়ি যাবো।'

ব্যবস্থা! রূপক সমাদ্দার ব্যবস্থা আবার কী করবেন? অনিরুদ্ধকে হোটেলে নামিয়ে দেওয়া ছাড়া, তাঁর কিছু ব্যবস্থা করার নেই।

'তুই ওঁকে চিনতে পারলি?' রূপক জিজ্ঞেস করলেন তারাপদকে, এবং মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

তারাপদ সামনের সীট থেকে, অনিরুদ্ধর দিকে প্রায় মিনিট খানেক অপলক চোখে তাকিয়ে দেখলো। অনিরুদ্ধ রীতিমতো বিস্ময় অস্বস্তি এবং লজ্জাবোধ করলো, তারাপদর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলো না। রূপক ওকে কী ভেবেছেন? তারাপদ বলে উঠলো, 'হাঁ, চেহারাটা খুব যেন চেনা লাগছে।'

'ব্যস্, চেপে যা।' রূপক বলে উঠলেন, 'আর কিছু বলতে হবে না।'

বলে অনিরুদ্ধর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি ও মুখের অভিব্যক্তিতে একটা গোপন আবিষ্কারের আনন্দ ঝলক দিচ্ছে। অনিরুদ্ধ মনে মনে এক ধরনের প্রমাদ গণছে, আর ভাবছে, এরা একেবারে উন্মাদ! কারোর সঙ্গে ওকে মিলিয়ে ফেলেছে বোধহয়। কিন্তু এদের কাছে প্রতিবাদ বোধহয় নিরর্থক। তার দরকার নেই, হোটেল অবধি পৌঁছুতে পারলেই হয়। কিন্তু গাড়িটা যেন ক্রমেই ঘিঞ্জি শহর এলাকা ছাড়িয়ে, একটু ফাঁকা আর নিরিবিলি রাস্তায় চলেছে। অবিশ্যি অনিরুদ্ধ শুনেছে, ও যে-হোটেলে যাবে, সেটা একটা পাহাড়ী টিলার কাছে, নিরিবিলি জায়গাতেই।

এক জায়গায় মেয়েদের, গাছের তলার ছায়ায় গুচ্ছ গুচ্ছ বসে থাকতে দেখে

বোঝা গেল, পাঁচিল ঘেরা বড় বাড়িটা মেয়েদের কলেজ। একটু পরেই, ছোট একটি নদী দেখা গেল। গাড়ি সেই নদীর ধার দিয়ে খানিকটা গিয়ে, আবার ডান দিকে ফিরলো। মিনিটখানেক পরেই, রূপক সমাদ্দার ড্রাইভারকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস গাধা? বাঁ দিকে টার্ন নে, গাড়ি ব্যাক কর।'

ড্রাইভার আদেশ পালন করলো। অনিরুদ্ধর মনে হলো, শহরের এ অঞ্চলটা বেশ অভিজাত এবং জনবিরল, নতুন গড়ে ওঠা ধনীদের বসতি। কিছু কিছু সরকারি অফিসও চোখে পড়ে। রূপক ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, 'এবার আবার বাঁয়ে যা, একেবারে সোজা গেট দিয়ে ঢুকে যাবি।'

অনিরুদ্ধ ভাবলো, এবার হোটেল এলো। শহরের এরকম অঞ্চলে যে হোটেল থাকতে পারে, ওর কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু গাড়ি যে ইমারতের গাড়ি-বারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়ালো, তা মোটেই হোটেল বলে মনে হয় না। দেখে মনে হলো, সাবেক কালের মস্তবড় সাহেব বাড়ি। গাড়ি দাঁড়াতেই সাদা ধবধবে দাড়িওয়ালা, সাদা উর্দি পরা একজন বেয়ারা এলো। রূপককে দেখেই, ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে, কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম দিয়ে বললো, 'সালাম সমাদ্দার সাব্।'

রূপক নামতে নামতে বললেন, 'সেলাম। কেমন আছো শরাফত মিঞা?'

শরাফত বললো, 'আপনার দোয়ায় আচ্ছা আছি সাব।' রূপক অনিরুদ্ধকে ডাকলেন, 'আসুন স্যার, নেমে আসুন।'

তারাপদ ইতিমধ্যে, ড্রাইভারকে দিয়ে, মালপত্র নামাতে শুরু করেছে। অনিরুদ্ধ ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছে না, তবু নামতেই হলো। রূপক তখন শরাফতকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'দোতলার কোণার ঘরটা খালি আছে তো শরাফত? আমার খুব বড় মেহমান এসেছেন।'

শরাফত বললো, 'হ্যাঁ সাব, খালি আছে।'

রূপক বললেন, 'ম্যানেজার বাবুর কাছ থেকে চাবি নিয়ে, তাড়াতাড়ি কামরাটা খুলে দাও, ঠিক করে সাজাও।'

শরাফত নির্দেশ পালনের জন্য যেতে যেতে বললো, 'একদম ফিটফাট সাজানো আছে সাব্। আপনি আসুন।'

রূপক ডাকলেন অনিরুদ্ধকে, 'আসুন স্যার।'

অনিরুদ্ধ বললো, এটা কি সেই হোটেল নাকি?'

রূপক বললেন, 'না, এটা য়োরোপীয়ান ক্লাব। এখানে আপনি থাকবেন কলকাতার ফাইভ স্টার হোটেলের মতো ঘরে। আপনার কি পোষায় এখানকার হোটেলে থাকা? সেই ভেবেই এখানে নিয়ে এলাম।'

অনিরুদ্ধ এবার বিরক্তি প্রকাশ না করে পারলো না। ও এসেছে, ওর অফিসের বিশেষ কয়েকটি গোপন কাজের দায়িত্ব নিয়ে। এখানকার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কার্যকলাপে, হেড্ অফিস রীতিমতো চিন্তিত আর শঙ্কিত। অনিরুদ্ধর কাজের দায়িত্বটা একরকমের গোপন তদন্তের শামিল। তার মাঝখানে এ আবার কী আপদ জুটলো! জরুরী কাজ নিয়ে এসে, শেষটায় একটা উন্মাদের হাতে পড়তে হবে! নাকি এর মধ্যে, এখানকার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কোনো চক্রান্ত আর কারসাজি আছে? ও বললো, 'দেখুন মিঃ সমাদ্দার, কাজটা আপনি মোটেই ভালো করেন নি। আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব না। আমাকে হোটেলেই যেতে হবে।'

রূপক সমাদ্দার বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, 'স্যার, এখানে আপনি অনেক শান্তিতে থাকতে পারবেন, কেউ আপনাকে জ্বালাতে আসতে পারবে না। আপনি যে একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাইছেন, এখানে আপনি সেই সুবিধাটা পাবেন, বুঝলেন না? আসুন।'

বলে, সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠলেন। অনিরুদ্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই মানেটা কী?'

রূপক ফিরে তাকিয়ে, ঠোঁঠের কোণে হাসি ফুটিয়ে বললো, 'আপনি কি স্যার দশজনের ছোঁয়া বাঁচিয়ে, একটু আড়ালে আবডালে থেকে, আপনার কাজ সারতে চান না?'

কথাটা যে একেবারে মিথ্যা, তা অনিরুদ্ধ বলতে পারে না। কিন্তু রূপক সমাদ্দার তা জানলেন কী করে? ওকে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে, রূপক ডাকলেন, 'আসুন স্যার, ওপরে আসুন।'

বারান্দা দিয়ে, অফিস ঘরের পাশ দিয়ে, দোতলার সিঁড়ি উঠেছে। রূপকের সঙ্গে, অনিরুদ্ধ সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলো, এবং সামনের দিকে তাকিয়ে, একটা খুশির অনুভূতিতে, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। ওপরের বারান্দাটা প্রকাণ্ড রেলিং ঘেরা। সামনে অনেকখানি সবুজ লন পেরিয়ে, নদীর চর। চর ছাড়িয়ে, নীল নদী এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে। তার ওপারে শালের গভীর বন। আশে-

পাশে ফাঁকায় ফাঁকায় কয়েকটি বাড়ি, ব্যালকনিতে শাড়ি আর জামা শুকোচ্ছে। বনের মাথায় নীল আকাশ ঝকঝক করছে।

'কী স্যার, ভালো জায়গায় নিয়ে আসিনি আপনাকে?' রূপক সমাদ্দারের গলা শোনা গেল।

অনিরুদ্ধ চমকে কিছু বলবার আগেই, রূপক বললেন, 'বলবেন, স্যার, আপনার যা ইচ্ছা হয় বলবেন, আগে আপনার থাকবার ঘরটা দেখুন একটু।'

বলেই লম্বা বারান্দার একপ্রান্তে এগিয়ে গেলেন। অনিরুদ্ধ তাঁকে অনুসরণ করে, শেষ প্রান্তের একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলো। চমৎকার! বড় বড় কাঁচের জানালা দিয়ে দূর শহরের অনেকখানি দেখা যায়। আবার বারান্দার সামনে তাকালে, নদী আর বন। কার্পেট পাতা মস্ত বড় ঘর। সাবেক কালের বিরাট আয়না লাগানো ড্রেসিং টেবিল, ওয়ারড্রব, ডানলোপিলোর গদিওয়ালা দুটো খাটে দুটো বিছানা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সংলগ্ন বাথরুমটা শোবার ঘরের মতোই বড়, প্রকাণ্ড টব, ঠাণ্ডা গরম জলের ট্যাপ, বেসিন, আয়না, কমোড, ফ্ল্যাশ্, সব ঝকঝক করছে।

অনিরুদ্ধ সব দেখে মনে মনে খুশি হলেও, মনের অস্বস্তি দূর করতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলো, 'এবার বলুন তো মিঃ সমাদ্দার, আপনি জানলেন কেমন করে, আমার একটু আড়ালে আবডালে থেকে কাজ করবার দরকার আছে?'

রূপক সমাদ্দারের চোখে, গালের থলথলে মাংসের ভাঁজে হাসি ঝলকে উঠলো। বললেন, 'জানি স্যার, সব জানি। আপনি গোপন করবার চেষ্টা করলে কী হবে। এতো সহজে কি নিজেকে লুকিয়ে রাখা যায়? তাও আবার রূপক সমাদ্দারের চোখে? বিজনেস করে খাই স্যার, অনেকদিকে আমাদের নজর চলে। ইন ফ্যাক্ট্, গতকাল রাত্রে দেখেই আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম। তা ছাড়া, নিউজটাও আমার আগে থেকেই জানা ছিল।'

অনিরুদ্ধ অবাক চোখে তাকিয়ে বললো, 'নিউজটা আগে থেকেই আপনার জানা ছিল?'

'নিশ্চয়ই।' বলতে বলতে রূপক সমাদ্দার দেওয়ালে সুইচ্ টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন, এবং আবার বললেন, 'এখন আপনি ধীরে সুস্থে, চা খেয়ে, স্নান টান করে, ব্রেকফাস্টটা করে নিন। সারা রাত্রি ট্রেনে এসেছেন, একটু বিশ্রাম করুন। দুপুরবেলা কী খাবেন, সেটা এখনই বলে দিতে হবে, ওরা সেই অনুযায়ী

রান্না করবে। আপনার কী বাঙালী খাওয়া চলবে, না, য়োরোপীয়ান লাঞ্চ? যা বলবেন, সবই হবে।'

অনিরুদ্ধ তা বুঝতে পারছে, সে সবের কোনো ত্রুটি এখানে হবে না। কিন্তু রূপক সমাদ্দার তো ওর মাথা খারাপ করে দেবার যোগাড় করেছেন। ভদ্রলোক ওকে চিনলোই বা কী করে, আর সংবাদটাই বা যোগাড় করলেন কোথা থেকে? কলকাতার অফিস সমস্ত ব্যাপারটাকে রীতিমতো গোপন রেখেছে।

অনিরুদ্ধ কিছু বলবার আগেই, শরাফত এসে পড়লো, বললো,'কী হুকুম হুজোর?'

রূপক বললেন, 'শরাফত, চা দাও সাহেবকে। বাথরুমের জলটল সব ঠিক আছে তো?' -

'সব ঠিক আছে হুজোর।' শরাফত বললো, 'আমি এখুনি-টায়েল দিয়ে যাচ্ছি। সাহেব ব্রেকফাস্ট কী খাবেন, লাঞ্চ কী খাবেন?'

শরাফত অনিরুদ্ধর দিকে তাকালো। অনিরুদ্ধ বললো, 'ব্রেকফাস্টে বাটার টোস্ট আর ডিমের পোচ দিলেই হবে। দুপুরে মাছ ভাত দিলেই হবে।'

রূপক কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, শোন শরাফত, ডাল ভাজি স্যালাড, মাছ ভাজা, ছোট মাছের ঝাল, রুইয়ের ডালনা, চিতল মাছের পেটি—।'

'না না, এতো দরকার হবে না।' অনিরুদ্ধ বাধা দিয়ে বলে উঠলো।

রূপক বললেন, 'আমাকে বলতে দিন না স্যার, আপনার যা ভালো লাগবে খাবেন, আমার যা বলার বলে দিচ্ছি।'

বলে শরাফতকে সব মেন্যু বাৎলে দিলেন। শরাফত হুকুম নিয়ে চলে গেল। অনিরুদ্ধ তৎক্ষণাৎ বললো, 'এবার বলুন মিঃ সমাদ্দার, আপনি কী করে সংবাদটা পেলেন। কেন না, সংবাদটা তো কারোর জানার কথা নয়।'

এবার রূপক সমাদ্দারের অবাক হবার পালা। বললেন, 'সে কি! খবরের কাগজের সংবাদ আবার না জানবার কী আছে?'

'খবরের কাগজের সংবাদ? অনিরুদ্ধর আক্কেল গুড়ুম হওয়ার অবস্থা!

রূপক বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, গত সপ্তাহের কাগজেই বেরিয়েছে, এ সপ্তাহে আপনি এ অঞ্চলে আসছেন, ডিরেক্টর ইউনিট সহ আসছেন কাজ করতে। তবে আপনি যে একলা ফার্স্টক্লাসে আসবেন, আমি তা ভাবি নি। চেহারাটাকে আপনি অবিশ্যি একটু বদলে দিয়েছেন। চুলে সিঁথি কেটেছেন, গালপাট্টা জুলপি আর গোঁফ গজিয়ে নিয়েছেন। আচ্ছা, আপনার গোঁফ জুলপি কি নকল, না সত্যি?'

অনিরুদ্ধর নিশ্বাসরোধ হবার অবস্থা, কথা বলবার কোনো ক্ষমতাই নেই। রূপক সমাদ্দার তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন ওর গোঁফ আর জুলপির দিকে। ভদ্রলোক ওকে দেখে, কার কথা ভাবছেন ?

সন্দেহ আগেই হয়েছিল, একটি ঘোর উন্মাদের পাল্লায় পড়েছে ও। আপনা থেকেই ওর আঙুল জুলফি আর গোঁফ স্পর্শ করলো। প্রায় তোতলার মতো বললো, 'আ-আপনি কার কথা বলছেন মিঃ সমাদ্দার ? আমার গোঁফ জুলপি নকল হতে যাবে কেন ?'

রূপক সমাদ্দার শব্দ করে হেসে উঠলেন, কেঁপে উঠলো তাঁর বিশাল বপু, বললেন, 'বুঝেছি স্যার বুঝেছি, দিস ইজ্ য়োর বিজনেস সিক্রেট। ঠিক আছে, আপনাকে কিছু কবুল করতে হবে না। আপনি এখানে আরামে শান্তিতে থাকুন। এ অঞ্চলে আপনার ইউনিট এসে পৌঁছুলে, তাদের খবর দেবার আমি ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আপনি যদি হোটেলে উঠতেন, এতোক্ষণে শহরের মস্তান ছোকরাদের পাল্লায় পড়ে, আপনি পাগল হয়ে উঠতেন।'

পাগল হয়ে ওঠা! তার কি এখনো বাকী আছে। এই সময় শরাফত তোয়ালে আর চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকলো। চায়ের ট্রে কোণের সোফা বেষ্টিত সেণ্টার টেবিলে রেখে, তোয়ালে রেখে এলো বাথরুমে। রূপক সমাদ্দার বললেন, 'আমিও এখন যাই স্যার, আপনি চান-টান করুন।'

বলে শরাফতের দিকে ফিরে বললেন, 'সাহেবের সবকিছুর ওপর ঠিক মতো নজর রেখো, আমি লাঞ্চের সময় আসবো।'

'জী হুজোর।'

রূপক সমাদ্দার শরীর দুলিয়ে, আর এক প্রস্থ বিদায় নিয়ে, শরাফতের সঙ্গেই বেরিয়ে গেলেন। অনিরুদ্ধ ধপ্ করে একটা সোফায় বসে মাথায় হাত দিল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত কিছু ভেবে উঠতেই পারলো না। কিন্তু না ভাবলে চলবে না। একটু চা খাওয়াও দরকার। ও পট থেকে কাপে চা ঢেলে, দুধ চিনি মিশিয়ে নাড়তে নাড়তে রূপক সমাদ্দারের কথাই ভাবতে লাগলো। ডিরেক্টর, ইউনিট, অনিরুদ্ধর চেহারার সম্পর্কে আজগুবি কথাবার্তা…। ও চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিল। ডিরেক্টর ইউনিট সহ আসছেন, গত সপ্তাহের কাগজে সংবাদ বেরিয়েছে, তার মানে কী—।

ভাবনা শেষ হলো না, দরজায় খুটখুট শব্দ হলো। অনিরুদ্ধ চমকে বলে উঠলো, 'ইয়েস, কাম ইন।'

তারাপদ নামক সেই তরুণ ঢুকলো, ধীরে সসম্ভ্রমে। কিন্তু ধীরে ঢুকেই, প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে অনিরুদ্ধর পা স্পর্শ করে প্রণাম করলো। অনিরুদ্ধ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আরে করেন কী, করেন কী, কী হয়েছে ?'

তারাপদ সলজ্জ হেসে বললো, 'জীবনটা ধন্য হয়ে গেল, আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে। আপনাকে যাতে কেউ এসে বিরক্ত করতে না পারে সেজন্য রূপকদা আমাকে সব সময় আপনাকে চোখে চোখে রাখতে বলে গেছেন। দেখবেন, আমি একটা মাছিও এদিকে গলতে দেবো না।'

তার মানে কী, অনিরুদ্ধ বন্দী! নজরবন্দী! তারপদ ইতিমধ্যে ঝটিতি পকেট থেকে একটি ছোট খাতা বের করে বললো, 'আমাকে একটা অটোগ্রাফ দিন দয়া করে।'

অটোগ্রাফ। অনিরুদ্ধ ধমকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিল। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে শান্ত করে নিয়ে বললো, 'তারাপদবাবু, আপনি বসুন একটু, একটু কথা বলা যাক।'

তারাপদ ভীরু চকিত স্বরে বললো, 'আমি বসবো না স্যার, রূপকদা জানতে পারলে রাগ করবেন।'

অনিরুদ্ধ বললো, 'কিছু রাগ করবেন না, জানতে পারবেন না। বসুন।'

তারাপদ লজ্জিত মুখে অস্বস্তি নিয়ে, জড়োসড়ো হয়ে বসলো। অনিরুদ্ধ বসে, হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কার অটোগ্রাফ চান, বলুন তো ?'

'আমাকে আপনি করে বলবেন না।' তারাপদ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো।

অনিরুদ্ধ বললো, 'আচ্ছা, তুমি করেই বলবো পরে। কার অটোগ্রাফ আপনি নিতে এসেছেন ?'

তারাপদর চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে কোথাও বিস্ময় বা অবিশ্বাস নেই, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে, অনায়াসেই বললো, 'কেন, আপনি হলেন ভারতের টপ হিরো জ্যোতিরূপ, অথচ আপনি বাঙালী। বাঙালীর কতো গর্ব আপনাকে নিয়ে।'

তারাপদর গলা যেন উচ্ছ্বাসে কাঁপছে, আর অনিরুদ্ধর রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠছে। অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি ভারতবর্ষের ফিল্মের টপ্ হিরো জ্যোতিরূপ-এ রূপান্তরিত হয়েছে ? অনিরুদ্ধ অবিশ্যি ফিল্ম-টিল্ম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। কিন্তু হিরোদের নাম সব সময়েই শুনতে পায়। ছবি দেখে, কোন্‌টা কে বুঝতে পারে না। সে হিসেবে ও সেকেলে এবং আনাড়ী। তবু চট্ করে উঠে একবার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখলো। নিজেকে ছাড়া,

মুখের মধ্যে কোনো জ্যোতিরূপকে আবিষ্কার করতে পারলো না। কিন্তু ও যে পাগলদের পাল্লায় পড়েছে, তা বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

অনিরুদ্ধ চোখের কোণে একবার তারাপদকে দেখে নিল। ও যে সিনেমার হিরো জ্যোতিরূপ না, এ কথা তারাপদকে আপাততঃ বলে কোনো লাভ নেই, কারণ বিশ্বাস করে না। সমস্ত বিষয়টা এখন ওকে ঠাণ্ডা মাথাতেই ভাবতে হবে। পালাবার একটা পন্থা ভেবে নিতে হবে। ড্রেসিং টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে, সোফায় বসে বললো, 'তারাপদবাবু, আপনি বোধহয় জানেন না, জ্যোতিরূপ কখনো কারোকে অটোগ্রাফ দেয় না।'

তারাপদ বিস্ময়ে একটি বড় হাঁ করলো, তারপরে বললো, 'কিন্তু আমি যে ফটোতে দেখেছি, আপনি অটোগ্রাফ দিচ্ছেন?'

'সে অনেকদিন আগের কথা।' অনিরুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বললো, 'ইদানীং জ্যোতিরূপ আর কারোকে অটোগ্রাফ দেয় না। আপনি এখন যান, আমি চান-টান করবো।'

তারাপদ অনিরুদ্ধর গম্ভীর স্বর শুনে ঘাবড়ে গেল, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, 'স্যার, রাগ করেননি তো?'

অনিরুদ্ধ গম্ভীরভাবেই মাথা নেড়ে বললো, 'না।'

তারাপদ বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, 'আমি কাছাকাছিই আছি, কোনো দরকার পড়লেই ডাকবেন।'

অনিরুদ্ধ ধীরে সুস্থেই চা খেল, তারপরে দরজাটা বন্ধ করে দাঁত মেজে, দাড়ি কামিয়ে চান করলো, পোশাক বদলালো। শুয়ে থাকলে চলবে না। ওকে বেল টিপতে হলো না, সময় মতো শরাফত ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলো, এবং অনিরুদ্ধ চুপচাপ বসে খেলো। খেতে খেতে চিন্তার মধ্যে একটি উপায় উদ্ভাবিত হলো। কাজের কাগজপত্র সহ এ্যাটাচিটা নিয়ে এখনই একটা রিক্শা নিয়ে বেরিয়ে পড়া। স্যুটকেশটা নিয়ে বেরোতে গেলে সন্দেহ করবে। বেরোবার আগে রূপক সমাদ্দারের বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা সংগ্রহ করতে হবে, এবং হোটেলে গিয়ে সেখান থেকে বলতে হবে, ও আসলে অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি, জ্যোতিরূপ না। ওর স্যুটকেশটা যেন রূপক হোটেলে পৌঁছে দেন। তারপরেই ও নিজের কাজে বেরিয়ে পড়বে।

এই জেলার দুজন ডিলার ওদের মাল কেনে, দুই ভিন্ন মহকুমা থেকে। ডিলাররা মাল কেনে, এখানকার ব্রাঞ্চ অফিসের মারফত। একজন মহিলা,

আর একজন পুরুষ ডিলার প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার টাকার মাল নিয়েছে, দশভাগেরও কম এ্যাডভান্স দিয়ে। ব্যবস্থা করেছিল এখানকার ম্যানেজার। এখন দেখা যাচ্ছে, দুজন ডিলারের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নামধাম ঠিকানা, সবই ভুয়া। কিন্তু সুমতি চৌধুরী নামে যে ডিলারের নাম দেওয়া হয়েছিল, একটা সূত্রে জানা গিয়েছে, সে নামটা একেবারে ভুয়া না। সুমতি চৌধুরী এখানকার ম্যানেজারেরই কোনো আত্মীয়া। তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে। বড় বড় দোকানগুলোর সঙ্গে কথা বলতে হবে, খোঁজ নিতে হবে, সেই এক লক্ষ আশি হাজার টাকার মাল, দোকানগুলোতে কে বা কারা বণ্টন করেছে।

অনিরুদ্ধ ব্রেকফাস্ট শেষ করে, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, টাইয়ের নট্টা ঠিক করে নিল, হাতের কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলো, এগারোটা বেজে পাঁচ। দরজায় ঠুকঠুক শব্দ। নিশ্চয়ই তারাপদ। ও বললো, 'কাম ইন্।'

দরজা আস্তে আস্তে খুললো, কিন্তু দেখা গেল এক ঝাঁক তরুণী দরজায় ভিড করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শাড়ি জামা পোশাকে যেন এক ঝাঁক রঙীন পাখি। লজ্জা মেশানো কৌতূহলের সঙ্গে খুশি ঝরে পড়ছে। তাদের পিছনে, বিব্রত তারাপদ দাঁড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করলো, 'নন্দিতা, তোরা জানলি কী করে, কে বললো তোদের?'

নন্দিতা যার নাম, সে বললো, 'দাদার মুখেই শুনেছি। কলেজে গিয়েই বন্ধুদের নিয়ে চলে এসেছি।'

দাদা মানে, নিশ্চয়ই সেই উন্মাদ রূপক সমাদ্দার। কলেজেও খবর চলে গেছে। কী করবে এখন অনিরুদ্ধ? মেয়েরা ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকতে আরম্ভ করেছে, এবং নন্দিতা বললো, 'আমরা কিন্তু না বলেই ঘরে ঢুকে পড়লাম।'

অনিরুদ্ধ তা দেখতে পাচ্ছে। একবার ভাবলো, চিৎকার করে বলে, ও জ্যোতিরূপ না। কিন্তু সেটা হবে আর এক রকমের পাগলামি, পাগলের সাঁকো নাড়া দেওয়া। ও শান্তভাবেই হেসে বললো, 'কিন্তু আমি এখন একটু বেরোচ্ছি।'

একটি মেয়ে আদুরে স্বরে বলে উঠলো, 'তা বললে শুনছি না, আগে আমাদের অটোগ্রাফ দিন।'

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, 'আমি যে আটোগ্রাফ দিই না আর, বারণ আছে।' মেয়েদের সকলের চোখেই অবিশ্বাস ও হতাশা। নন্দিতা বললো, তা হলেও দু'মিনিট বসুন, আমাদের এভাবে নিরাশ করবেন না।'

অনিরুদ্ধ নন্দিতার দিকে তাকালো। সুগৌরী স্বাস্থ্যবতী রূপসীই বলা যায় নন্দিতাকে, এবং চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধির ঝলকও আছে। সলজ্জ আন্তরিকতার সঙ্গেই ও কথাগুলো বললো। নন্দিতা আরো বললো, 'তাছাড়া আপনি বেরোবেন কী করে। রাস্তায় আপনাকে সবাই ছেঁকে ধরবে! কোথাও যেতে পারবেন না।'

অনিরুদ্ধ বললো, 'আমি ঠিক চলে যাবো, রিক্‌শার হুড ঢাকা দিয়ে, কেউ চিনতে পারবে না।'

নন্দিতার সঙ্গে সব মেয়েরা খিলখিল করে হেসে উঠলো। নন্দিতাই মুখপাত্রী হিসাবে বললো, 'বুঝেছি, আপনি ঠাট্টা করছেন। বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন।'

অনিরুদ্ধ নন্দিতার চোখের দিকে তাকিয়ে, যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতোই, আস্তে আস্তে বসলো। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার দাদা কে?'

নন্দিতা বললো, 'রূপক সমাদ্দার, যে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাকে আপনি বলবেন না।'

একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, এখানে যে ছবির স্যুটিং হবে তার হিরোইন কে?'

অনিরুদ্ধ অসহায়ভাবে একটু হাসলো, বললো, 'হিরো যখন আছে, হিরোইন কেউ থাকবেই।'

মেয়েরা এ কথাটাও ঠাট্টা হিসাবে নিয়ে হাসলো। এ সময়েই একটি যুবক দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। তার গলায় ক্যামেরা। বললো, 'নে, তোরা সব ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে পড়, ফটোটা তাড়াতাড়ি তুলে নিই।'

মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধর দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রথমে ফ্ল্যাশ বালব্ জ্বললো না, ক্লিক করলো মাত্র। দ্বিতীয়বার জ্বললো। আর অনিরুদ্ধ ভাবছে, জীবনের বাস্তবতা বস্তুটা কী? ওকি এখন চিৎকার করে ভগবানকে ডাকবে? অন্যমনস্ক আচ্ছন্নতার মধ্যেই, ও নন্দিতার স্বর শুনতে পেলো, 'তোরা এবার চলে যা, ওঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। দাদা জানতে পারলে রাগ করবে। আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নন্দিতা ছাড়া, বাকী মেয়েরা সবাই চলে গেল। ক্যামেরা গলায় যুবক তখনো দাঁড়িয়েছিল। নন্দিতা অনিরুদ্ধর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললো, 'বোকাদা, তাড়াতাড়ি একটা স্ন্যাপ নিয়ে নাও।'

অনিরুদ্ধ নন্দিতার দিকে তাকালো। নন্দিতা লজ্জিত হেসে, অনিরুদ্ধর দিকেই

তাকিয়েছিল। ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠলো। নন্দিতা বললো, 'এখন তুমিও চলে যাও বোকাদা, পরে আবার নিও।'

বোকাদা নামক ফটোগ্রাফার অনিরুদ্ধর দিকে এক হাত তুলে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'জ্যোতিরূপদা, আমার সঙ্গে কিন্তু পরে একটা ফটো তুলতে হবে।'

বলে বেরিয়ে গেল। নন্দিতা কিন্তু অনিরুদ্ধর ঘনিষ্ঠ স্পর্শ থেকে সরলো না, বললো, 'মনে মনে খুব বিরক্ত হচ্ছেন, না?'

জ্যোতিরূপ হলে কী জবাব এক্ষেত্রে দিতো, অনিরুদ্ধ তা জানে না। নন্দিতার মতো একটি মেয়ের সামনে, ওর যুবচিত্তে যেন রঙ ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে, নন্দিতার কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে রোমান্সের সুর। চোখেমুখে আবেগ মুগ্ধতার আভা। অনিরুদ্ধ বললো, 'না, বিরক্ত হবার কী আছে?'

নন্দিতা বললো, 'এ রকম তো হামেশাই আপনাদের ঘটে, এখন নিশ্চয়ই সয়ে গেছে, না?'

অনিরুদ্ধ একটু হাসলো। নন্দিতা বললো, 'আমি একটু বসবো?'

'নিশ্চয়ই।' অনিরুদ্ধ একটু বেশি মাত্রায় ব্যস্ত হলো।

নন্দিতা বসলো, বললো, 'আপনাদের জীবনটা খুব অদ্ভুত, না? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।'

অনিরুদ্ধ ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠলো। একবার ভাবলো ওর আসল পরিচয়টা নন্দিতাকে বলবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে, নন্দিতা বিশ্বাস করবে না। ও হেসে একটা সিগারেট ধরালো। ভাবলো, নন্দিতা চলে গেলেই ও ছুট দেবে।

নন্দিতা বললো, 'জানি, এসব কথার কোনো মানে হয় না। তবু আপনাকে এরকম সামনাসামনি পেয়ে, আমার কথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে। জীবনে যে এমন সৌভাগ্য হবে কখনো ভবিনি।'

অনিরুদ্ধ বললো, 'এটা কি খুবই একটা বড় সৌভাগ্য?'

'সৌভাগ্য না?' নন্দিতা চোখ বড় করে বললো, 'তবে হ্যাঁ, সমুদ্র তার বিশালত্ব কেমন করে বুঝবে, সে তো নিজেই বিশাল। আমাদের মনের কথা আপনি বুঝবেন না।'

অনিরুদ্ধ নির্বাক, মুখে হাসি। নন্দিতা বললো, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

অনিরুদ্ধ বললো, 'কী?'

নন্দিতা জিজ্ঞেস করলো, 'কাগজে দেখেছি, হিরোইন হীরাদ্যুতির সঙ্গে নাকি আপনার কোর্টশিপের পালা চলছে। কথাটা কি সত্যি?'

কোর্টশিপ! হীরাছ্যুতি! দুটো শব্দই অনিরুদ্ধর জীবনে নতুন লাগছে। ওদের পাশের বাড়ির উকিল দক্ষিণারঞ্জন চ্যাটার্জির মেয়ে রূপার সঙ্গে মাঝে মধ্যে কথাবার্তা হয়। সেটা ঠিক প্রেম কী না, ও জানে না। অনিরুদ্ধর বোন দীপার ধারণা অবিশ্যি প্রেম। কিন্তু হিরোইন হীরাছ্যুতি আর কোর্টশিপ! কী জবাব দেবে অনিরুদ্ধ? ওকে চুপ করে থাকতে দেখে, নন্দিতা বললো, 'বলতে বাধা থাকলে, বলতে হবে না। পত্রিকায় সংবাদটা দেখলাম, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, 'পত্রিকায় তো কতো সংবাদই বেরোয়। কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, তা কি বোঝা যায়?'

'যায় না বলেই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।'

নিজের কথার ফাঁদে পড়ে, অনিরুদ্ধ হেসে ফেললো, এবং পরিষ্কার বলে দিল, 'কোনো হিরোইনের সঙ্গেই আমার কোর্টশিপের পালা চলছে না।'

নন্দিতা কয়েক পলক অনিরুদ্ধর চোখের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা নামালো, জিজ্ঞেস করলো, 'তার মানে আপনি বলতে চান, আপনি ফিল্মের কোনো হিরোইনকে বিয়ে করবেন না?'

অনিরুদ্ধ বললো, 'ঠিক তাই।'

নন্দিতা যেন খুশীই হলো এ কথা শুনে এবং কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপরে চেষ্টা করে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'বিয়ে তো নিশ্চয়ই করবেন। কী রকম বিয়ে করবেন?'

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, 'একটি সাধারণ মেয়েকে, ঘরকন্না সংসার করতে পারবে, এইরকম।'

নন্দিতার চোখে একটু দ্বিধা আর অবিশ্বাস দেখা দিল। অনিরুদ্ধর চোখের দিকে তাকিয়ে, আবার তা অদৃশ্য হলো। বললো, 'কিন্তু আপনার মতো লোক কি একটি সাধারণ মেয়েকে নিয়ে সুখী হতে পারবে?'

অনিরুদ্ধ বললো, 'অসাধারণকে নিয়েই বরং সুখী হওয়া যায় না, তাই না? আপনার কি মনে হয়?'

নন্দিতা লজ্জিত হেসে বললো, 'আমি সাধারণ বলেই বোধহয়, অসাধারণের দিকে টান।' বলে অনিরুদ্ধর দিকে যেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালো।

এ সময়েই একটা প্রচণ্ড হৈ হট্টগোল ভেসে এলো। কান পেতে শোনবার আগেই, অনেক পায়ের শব্দ সিঁড়িতে শোনা গেল, সেই সঙ্গে 'জ্যোতিরূপ' নাম

নিয়ে চিৎকার। তারাপদ ছুটে এসে বললো, 'কলেজের আর শহরের ছেলেরা সব ছুটে আসছে।'

নন্দিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তারাপদদা, তুমি তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে দাদাকে একটা ফোন করে দাও।'

অনিরুদ্ধ অসহায়ভাবে বললো, 'আমি তাহলে কী করবো? আমার মনে হচ্ছে ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকে তাণ্ডব করবে।'

'ঠিকই বলেছেন।' নন্দিতা ঝটিতি অনিরুদ্ধর হাত ধরে বাথরুমে গিয়ে, পিছনের দরজা খুলে দিয়ে বললো, 'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। ওদের বলবো, আপনি বেরিয়ে গেছেন। তারপরে দাদা এসে সব সামলাবে।'

বলেই দরজা বন্ধ করে ফিরে গেল। ঘরের মধ্যে তখন জনতার উত্তাল স্রোত ভেঙে পড়েছে, 'আমরা জ্যোতিরূপকে দেখবো।'

অনিরুদ্ধ বন্ধ দরজার বাইরে থেকে, নন্দিতার কথা কিছু শুনতে পাচ্ছে না, হৈ-হট্টগোল আর উত্তেজনা বাড়ছে, সেটা বুঝতে পারছে। টেবিলে ঘুষি পড়ছে, তাও শোনা যাচ্ছে। অনিরুদ্ধ নীচের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। একটা ঘরের চিমনি থেকে অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে, রান্নার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। নেমে গিয়ে, রান্নাঘরে ঢুকলে কেমন হয়? মনে হচ্ছে, ক্লাব বাড়িটা সবাই ঘিরে ফেলবে। তারপরে যদি টের পায়, ও সত্যি জ্যোতিরূপ না, মারতে মারতে হয়তো মেরেই ফেলবে। কল্পনায় সে দৃশ্য দেখে, ওর শিরদাঁড়া কেঁপে উঠলো। সেই মুহূর্তেই ওর দৃষ্টি পড়লো, গাছের ফাঁক দিয়ে, রাস্তার দিকে। সর্বনাশ! পিল্-পিল্ করে লোক আসছে, ধুলো উড়ছে।

বাথরুমের ভিতরে অনেক গলার স্বর শোনা গেল, 'না এখানেও স্‌সালা জ্যোতিরূপ নেই রে। কোথাও গায়েব করে রেখেছে।'

অনিরুদ্ধ আর দ্বিধা করলো না, দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে, রসুইখানায় ঢুকে পড়লো। সেখানে আবার একটি বউ তার বাচ্চাকে স্তন পান করাচ্ছিল নির্বিঘ্নে। সে লাফ দিয়ে, বাচ্চা কোলে উঠে দাঁড়ালো, চোখে ভয়। আর এক পাল মুরগী কঁক কঁক করে ঝটপটিয়ে উঠলো। অনিরুদ্ধ বউটির দিকে বরাভয়ের হাত দেখালো। সেই মুহূর্তেই বাথরুমের পিছনের দরজা খুলে গেল, এবং সমবেত স্বর শোনা গেল, 'না, এদিকেও নেই।'

অনিরুদ্ধর চোখে আতঙ্ক দেখা দিল। বউটি ওর দিকে তাকিয়ে, নিমেষের মধ্যে

কী বুঝলো, কে জানে, ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো, এবং রসুইঘরের পাশে আর একটি ঘরে ঢোকবার দরজা দেখিয়ে দিল। অনিরুদ্ধ নির্দ্বিধায়, ছুটে গিয়ে সে ঘরে ঢুকলো। খাটিয়ায় বিছানা গোটানো। একটি আলনা, দেওয়ালে ছোট আয়না, ছোটখাটো একটি সংসারের ছবি। বউটি হাতের ইশারায় খাটিয়া দেখিয়ে দিয়ে বসবার ইঙ্গিত করলো, এবং নিজে সরে গেল।

কৃতজ্ঞ অনিরুদ্ধ বসতে পারলে না। এ ঘরের বাইরে, আশেপাশে, চারদিকে প্রবল চিৎকার, আর ছোটাছুটির শব্দ। কেউ বলছে, 'গুল্ মেরেছে, গুজব ছড়িয়েছে।' কেউ বলছে, 'আরে না, যা রটে, তা বটে। জ্যোতিরূপকে লুকিয়ে ফেলেছে। আমাদের দেখতে দেবে না।' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ শোনা যায়, 'দেবে না মানে? জ্যোতিরূপ কারোর বাপের মাল না। জোতিরূপ জনসাধারণের। আলবৎ দেখতে দিতে হবে। আমরা তাকে ভালবাসি, তাকে আমরা চাই।'…

অনিরুদ্ধর গায়ের চামড়া, গরুর গায়ে মাছি বসার মতো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। একি ভয়াবহ খেলা শুরু হলো? যেন বারুদের স্তূপে, একটি জলন্ত শলাকা ছোঁয়ানো। আর সেই শলাকাটি কে? রূপক সমাদ্দার! আহা, স্টেশন থেকেই যদি কোনোরকমে সরে পড়া যেতো! কিন্তু তখন এই পরিস্থিতির কল্পনাও ওর মাথায় ছিল না। থাকলে মরিয়া হয়ে কিছু একটা করতো। রূপক সমাদ্দার যে ওকে জ্যোতিরূপ ভেবে বসে আছেন, চিন্তাই করতে পারেনি। নন্দিতার কথাও ওর মনে পড়লো। নন্দিতাও জ্যোতিরূপ জেনেই ওর সঙ্গে কথা বলেছে, অনিরুদ্ধ ব্যানার্জির সঙ্গে না। একটা দীর্ঘশ্বাস উদ্গত হয়ে গিয়ে, আটকে গেল, রসুইখানায় গলার স্বর শোনা গেল। তারপরেই একটি পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে ঘরের দরজায় এসে থামলো। শরাফত!

শরাফতের চোখে ভয় ও উত্তেজনা। ঘরের মধ্যে ঢুকে ফিসফিস করে বললো, 'বহুত হল্লাগুল্লা চলছে। অফিসের টেবিল চেয়ার ভেঙে ফেলছে, আপনি চুপচাপ বসে থাকেন। সমাদ্দারের বহিন আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ডেকে দেব?'

অনিরুদ্ধ সন্ত্রস্ত ভাবে হাত নাড়লো, বললো, 'না না, ওকে এখানে আসতে দেখলে জানাজানি হয়ে যাবে।'

শরাফত ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'ঠিক বাত।'

এ সময়েই গাড়ির শব্দ শোনা গেল, এবং চিৎকার, 'পুলিশ! পুলিশ এসে গেছে, প্যাঁদাচ্ছে। পালাও পালাও।'…

তার মধ্যে কোথাও স্লোগান শোনা গেল, 'আমাদের দাবি মানতে হবে' গোছের এবং 'জ্যোতিরূপ যুগ যুগ জিও' ধ্বনিও শোনা গেল। অনিরুদ্ধ টের পাচ্ছে, খানসামার ঘরের আশপাশ দিয়েও অনেকে ছুটে পালাচ্ছে। অনিরুদ্ধ তাড়াতাড়ি গমনোদ্যত শরাফতকে ডেকে বললো, 'আমি যে এখানে আছি, এ কথা এখন কারোকে বলো না। সমাদ্দার সাবকেও না।'

শরাফত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সমাদ্দার সাবকেও না?'

অনিরুদ্ধ অনুরোধ করে বললো, 'না শরাফত ভাই, সমাদ্দার সাবকেও না। তোমাকে আমি পরে একটা কথা বলবো।'

শরাফত এক মুহূর্ত চুপ করে ভাবলো, তারপরে বললো, 'ঠিক আছে।'

বলে সে বেরিয়ে গেল। বাইরে হৈ-হল্লা শুনে বোঝা যাচ্ছে, সকলে একেবারে চলে যায়নি, দূর থেকে চিৎকার করছে। কিন্তু ক্লাবের চত্বরে আর বিশেষ গোলমাল নেই, কেবল দু-একজনের ছোটাছুটি করা ছাড়া। হঠাৎ নন্দিতার স্বর শোনা গেল, 'আমি ওঁকে এই দরজার কাছেই দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম।'

'রেখেছিলি তো গেলেন কোথায়?' রূপক সমাদ্দারের হুঙ্কার, 'জ্যোতিরূপের মতো একজন লোক তো হাওয়া হয়ে যেতে পারেন না।'

অন্য পুরুষ স্বর শোনা গেল, 'সে হিসাবে দেখলে এমনিতে কেউই হাওয়া হয়ে যেতে পারে না। কাছেপিঠেই আছেন কোথাও। মবের সঙ্গে নিশ্চয় জ্যোতিরূপ মিশে যাননি।'

'অসম্ভব!' রূপক সমাদ্দারের গলা।

এই সব কথাবার্তা চলাকালীনই, অনিরুদ্ধ শুনলো, রসুইখানায় কেউ ঢুকলো। মুরগীর পাখা ঝাপটানির সঙ্গেই, দরজায় একটা ছায়া পড়লো। নন্দিতা! যে কারণে শরাফতকে বলতে বারণ করেছিল, তা ফাঁস হয়ে গেল। অনিরুদ্ধ ভেবেছিল, এই লুকানোই শেষ লুকানো, সন্ধের অন্ধকার নামলেই স্যুটকেশটা নিয়ে পালাবে। শরাফতকে কিছু টাকা দিয়ে যাবে।

'আপনি এখানে।' নন্দিতা স্বস্তির নিশ্বাসে হেসে বললো। খুশীতে ঝকঝক করছে তার চোখ।

আবার বললো, 'খুব ভালো করেছেন এখানে পালিয়ে এসে। কীভাবে যে আপনাকে খুঁজছিল, উহু! আমাকে তো যাচ্ছেতাই করে অপমান করেছে।'

অনিরুদ্ধ বললো, 'আমি সত্যি দুঃখিত।'

'বারে, আপনি দুঃখ করে কী করবেন।' নন্দিতা হেসে অনিরুদ্ধর কাছে

এগিয়ে এলো, বললো, 'ওরা ভেবেছিল, আমি আপনাকে লুকিয়ে রেখেছি। আসলে ওরা আপনার ওপর নানারকম জুলুম করতো। দল বেঁধে আসার মানে তা-ই।'

অনিরুদ্ধ বলে উঠলো, 'আসলে কী জানেন নন্দিতা, আমি—আমি জ্যোতিরূপ নই।'

নন্দিতা ভ্রূকুটি করে একবার তাকিয়েই হেসে উঠলো, বললো, 'সত্যি, বিপদে পড়লে, এরকমই বলতে ইচ্ছা করে। চলুন এখন আপনার ঘরে। দাদা, থানার ও. সি. আপনার জন্য ভীষণ ভাবছেন।'

'কিন্তু'—অনুরুদ্ধ বলতে গেল, তার আগেই রূপক সমাদ্দার এবং থানার ও. সি. ছুটে এলেন। রূপক একেবারে অনিরুদ্ধর হাত ধরে বলে উঠলো, 'কোনোরকম চোট টোট লাগেনি তো আপনার?'

অনিরুদ্ধ বললো, 'তা লাগেনি। কিন্তু ওরা যদি জানতো, আমি আসলে জ্যোতিরূপই নই, তাহলে বোধহয়, হাতে পেলে মেরেই ফেলতো।'

রূপক আর ও. সি. অবাক চোখে অনিরুদ্ধর দিকে তাকালেন। অনিরুদ্ধ হেসে বললো, 'সত্যি। বিশ্বাস করুন, আমি জোতিরূপ না।'

রূপক আর ও. সি. পরস্পরের দিকে তাকালেন। তারপর রূপক হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'স্যার, সত্যি আপনি জাত অভিনেতা, প্রায় ঘোল খাইয়ে দিয়েছিলেন।'

বলেও হাসতে লাগলেন, এবং তাঁর হাসির সঙ্গে এবার ও. সি-ও যোগ দিলেন, এবং নন্দিতাও।

রূপক সমাদ্দার অনিরুদ্ধর হাত টেনে বললেন, 'আসুন এখন, ঘরে গিয়ে বসা যাক। উহ্, ছোঁড়াগুলো একেবারে মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। ভাগ্যিস্ বড়বাবু তাঁর ব্যাটেলিয়ন নিয়ে এসে পড়েছিলেন!'

বলে ও. সি.র দিকে তাকালেন। ও. সি. বললেন, 'আপনার ফোন পেয়েই আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছি।'

রূপক বললেন, 'মেনি থ্যাঙ্কস্ বড়বাবু। চলুন, একটু শান্ত হয়ে বসে চা খাওয়া যাক। নন্দিতা, তুই শরাফতকে বল্, জ্যোতিরূপবাবুর ঘরে, চার পাঁচ কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।'

নন্দিতাকে বলতে হলো না, শরাফত কাছেই ছিল, বলে উঠলো, 'আপলোগ্ কামরায় যান, আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।'

অনিরুদ্ধ বুঝলো, বিপদ তীব্র এবং ক্রমে জটিল আকার ধারণ করছে।

বলে এই সব পাগলদের বোঝানো যায়, কিছুতেই বুঝতে পারছে না। হাতে পায়ে ধরে কেঁদে উঠলে কেমন হয়? কিছুই না, স্রেফ জাত অভিনেতার অভিনয় মনে করে হাসবে। মুক্তির উপায় ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। ওহ্! ভগবান ওকে সত্যি জ্যোতিরূপ করলো না কেন? তা হলে থি্লটা উপভোগ করতে পারতো। এখন এ যে যম যন্ত্রণার অধিক!

অনিরুদ্ধ সকলের সঙ্গে, পিছন দিয়ে ঘুরে সামনের দিকে যেতেই, দূর থেকে কোলাহল ভেসে এলো, 'ওই যে, ওই সালা জ্যোতিরূপ!'...লাঠি হাতে সেপাইরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে, ক্লাব পাহারা দিচ্ছে। সবাই অনিরুদ্ধর দিকে তাকালো। যা-ও বা এতক্ষণ লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা গিয়েছিল, এবার সবাই ওকে দেখে নিল। ওর আরো অবাক লাগছে, যাকে দেখার জন্য জনতা এতো পাগল, তাকেই আবার সালা বলছে কী করে? এরাই কি আবার অন্যসময় রাজনৈতিক মিছিল টিছিলেও যোগ দেয়? অনিরুদ্ধ কিছুই বুঝতে পারছে না।

দোতলার সিঁড়িতে ওঠবার আগেই, একজন এস. আই. অফিস রুম থেকে ছুটে এসে, ও. সি-কে বললো, 'স্যার। মবের, একটা অংশ শহরে মারামারি আরম্ভ করে দিয়েছে, থানার ইনফরমেশন।'

ও. সি. বললেন, 'তাই নাকি? ঠিক আছে, আপনি কিছু সেপাই নিয়ে এখানে থাকুন, আমি শহরে যাচ্ছি।'

বলেই তিনি অনিরুদ্ধকে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, যাচ্ছি। পরে আসবো। কিছু চিন্তা করবেন না।'

কথা শেষ করেই ছুটলেন। রূপক সমাদ্দার বললেন, 'যা দিনকাল পড়েছে, কিসের থেকে কী হয়, কিছুই বলা যায় না।'

অনিরুদ্ধ তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে। স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিকাণ্ড তো চলছেই। ঘরে গিয়ে দেখা গেল, শোফা টেবিল উল্টে পড়ে আছে। জ্যোতিরূপকে জনতা দেখবার জন্য ঢুকেছিল। চমৎকার! রূপক সমাদ্দার নিজেই ভারী শোফা তুলে বসালো। অনিরুদ্ধ ইচ্ছা করেই হাত দিল না। মনে মনে বললো, 'ব্যাটা কষ্ট পাক।' নন্দিতাও হাত লাগালো। শোফা তোলা হতেই, তারাপদ ছুটে এসে বললো, 'দাদা, তোমাকে ডি. এস. পি. ফোনে ডাকছে।'

ডি. এস. পি.? মানে ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেণ্ট অব্ পুলিস?' বলেই থপ্-থপ্ করে ছুটলো।'

নন্দিতা বললো, 'আপনাকে খুব ডিসটার্বড দেখাচ্ছে।'

অনিরুদ্ধ বিরস হেসে বললো, 'আমার কথাটা বিশ্বাস করলেই, সব ঝামেলা মিটে যেতো।'

নন্দিতা চোখে ঝিলিক দিয়ে হেসে বললো, মানে আপনাকে জ্যোতিরূপ না ভাবা, তাই না?'

বলে, আবার একটু হেসে বললো, 'এরকম অবস্থায়, খুব সাধারণ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে, না?'

'আমি সাধারণই।' অনিরুদ্ধ বলে উঠলো।

নন্দিতা বললো, 'আমি কোথায় পড়েছি, যে সাধারণ হতে পারে, সেই সব থেকে অসাধারণ।'

অনিরুদ্ধ বললো, 'তা জানি না। আমি সাধারণই থাকতে চাই।'

'সেইজন্যই আপনি অসাধারণ। চেষ্টা করে অসাধারণ হওয়া যায় না।' নন্দিতা বললো। জিজ্ঞেস করলো—'আপনার বিয়ের দৃষ্টিটা কি আপনার এই সাধারণ চোখে দিয়ে দেখা?'

অনিরুদ্ধ বললো, 'নিশ্চয়ই।'

নন্দিতা ঠোঁট টিপে হেসে, চোখের কোণে একবার অনিরুদ্ধকে দেখলো, 'আচ্ছা, আপনার সাধারণ দৃষ্টিতে, আমাকে কী রকম দেখছেন?'

অনিরুদ্ধ বললো, 'সুন্দর।'

নন্দিতা যেন লজ্জার ছটায় আরো সুন্দর হয়ে উঠলো, চোখ নামিয়ে নিল। অনিরুদ্ধর ভাবনা চিন্তা কেমন গুলিয়ে গেল। ও নন্দিতার সামনে এগিয়ে এসে বললো, 'আরো যদি শুনতে চান, তা হলে বলি, আমার মতো সাধারণের চোখে আপনার মতো মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত।'

নন্দিতা যেন আবেগে বিভ্রান্ত হয়ে, অনিরুদ্ধের একটা হাত চেপে ধরলো। বললো, 'এরকম বলবেন না। আমার সে যোগ্যতা নেই।'

অনিরুদ্ধ হাত ছাড়িয়ে নিল না, বললো, 'আমি জানি, আপনার সে যোগ্যতা আছে। যদি সাধারণের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করেন।'

নন্দিতা আবেগমথিত স্বরে বললো, 'আমাকে তুমি করে বলুন।'

'তুমি—হ্যাঁ, তোমাকেই আমি একথা বলছি।' অনিরুদ্ধ যেন জেদের সঙ্গে কথাগুলো বললো, 'সম্ভব হলে, আমি তোমাকেই বিয়ে করতাম।'

আবেগে এবং লজ্জায় নন্দিতার শরীর যেন শিথিল হয়ে, অনিরুদ্ধর বুকের কাছে ওর মাথা নেমে এলো। এ সময়েই রূপক সমাদ্দার ঢুকলেন, এবং দৃশ্য

দেখে গলা খাঁকারি দিলেন। নন্দিতা তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালো। রূপক বললেন, 'ডি. এস. পি. আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আপনাকে কিছু চিন্তা করতে বারণ করেছেন।'

তারপর নন্দিতার দিকে ফিরে বললেন, 'তুই ড্রাইভারকে নিয়ে বাড়ি চলে যা এখন। বাড়ি গিয়ে গাড়িটা আবার এখানেই পাঠিয়ে দিস।'

নন্দিতা ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে অনিরুদ্ধর দিকে তাকালো, বললো, 'যাচ্ছি।'

অনিরুদ্ধ ঘাড় কাত করে বিদায় জানালো। ওর মনে তখন ভয়, রূপক সমাদ্দার ওকে কী বলবেন? কিন্তু নন্দিতা চলে যাবার পরে, রূপক সে কথা তুললেনই না। বললেন, 'বসুন স্যার। অনেক ধকল যাচ্ছে আপনার ওপর দিয়ে। খাওয়া দাওয়ার পরে একটু ঘুমোন। আর কেউ আপনাকে ডিসটার্ব করতে আসবে না। আমি বাইরে পাহারা থাকবো, দেখি কে আসে। তা ছাড়া পুলিসও তো আছেই।'

অনিরুদ্ধ দেখলো, এঁর সঙ্গে আর পরিচয় নিয়ে কোনো কথা চলবে না। চা এলো। চা খেতে খেতে ও কথায় কথায় ওর কোম্পানীর নাম করে জানতে চাইলো, কোম্পানীটার কথা রূপক কখনো শুনেছেন কী না। রূপক বললেন, 'শুধু শুনেছি কি মশাই। এখানকার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আমার খুব পরিচিত।'

অনিরুদ্ধ বললো, 'ম্যানেজার মিঃ ঘোষ আমার বিশেষ বন্ধু।'

রূপক অবাক হয়ে বললেন, 'কেমন করে আপনার বন্ধু হলো ঘোষ? ওর সঙ্গে ফিলম্ লাইনের কোনো যোগাযোগ আছে বলে শুনিনি। তাছাড়া, ও তো একটা মস্তবড় জোচ্চোর।'

'জোচ্চোর?' অনিরুদ্ধ অবাক হবার ভান করলো।

রূপক বললেন, 'নিশ্চয়ই। কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে, প্রায় দু'লাখ টাকার মাল হাতিয়েছে। সে সব মাল তো আমার হাত দিয়েই বাজারে ডিসট্রিবিউটেড হয়েছে।'

'আপনার হাত দিয়ে কী রকম?'

'সে অনেক ব্যাপার।' রূপক বললেন, 'লোকটা কেঁদে এসে পড়লো। নেহাত বাঁচাবার জন্যই সেই চোরাইমাল আমি আমার ট্রান্সপোর্ট দিয়ে নানান জায়গায় সরিয়ে দিয়েছি। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পেমেণ্টও করেছি।'

অনিরুদ্ধ জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু খুচরো বিক্রেতাদের মালটা দিলেন কেমন করে। রিসিট নিতে হয়নি ?'

রূপক বললেন, 'চোরাই মালের আবার রিসিট। শতকরা তিরিশ পার্সেণ্ট কম দামে বেচে দিয়েছি।'

অনিরুদ্ধ থ! সর্ষের মধ্যেই ভূত! আর সে ভূত ওর সামনেই বসে রয়েছেন! কিন্তু হাতে কলমে ধরবার উপায় বোধহয় কিছু নেই। ও একটু উদ্বেগ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'যাই হোক, ঘোষ কোনোরকমে বিপদে টিপদে পড়বে না তো ?'

রূপক বললেন, 'কেঁচো খুঁড়লে সাপ বেরোতে পারে, তবে আর বোধহয় সে ভয় নেই। ঘোষের লোভ আছে, বুদ্ধি কম। আপনাকে বলতে পারি, বিশেষ করে সে যখন আপনার বন্ধু। ওর শালীর নাম সুমতি চৌধুরী। স্বামীর সঙ্গে এখন দিল্লীতে আছে। ছিল কোচবিহারে। সুমতি চৌধুরীকে কেউ সুমতি নামে চেনে না, পিয়ালী নামেই চেনে। সুমতি নামটা ইস্কুল কলেজের সার্টিফিকেটে আছে। ঘোষ বোকামি করে, শালীকে ডিলার করে, বিরাট টাকার মাল কোম্পানী থেকে বের করেছে।'

অনিরুদ্ধ জিজ্ঞেস করলো, 'বোকামি কেন ?'

রূপক বললেন, 'বোকামি না ? ভবিষ্যতে যে ডিলারের একজিসটেন্সই তুমি গায়েব করে দেবে, সে ডিলারের সত্যিকারের নাম ধাম কখনো দিতে আছে ?'

'ঘোষ কি তাই দিয়েছিল নাকি ?' অনিরুদ্ধ নির্দোষ বিস্ময় প্রকাশ করলো।

রূপক বললেন, 'তাই তো করেছে। সুমতির স্বামী বাদল চৌধুরীর নামটা পর্যন্ত কেয়ার অফ্-এ দেওয়া আছে, ঠিকানা কোচবিহার। কোম্পানী একবার যদি বাদল চৌধুরীর খোঁজ পায়, নিশ্চয় সুমতিকেও পাবে। তখন সবই ফাঁস হয়ে যাবে।'

অনিরুদ্ধর বুকের মধ্যে, উত্তেজনায় ধক্‌ধক্ করছে, কিন্তু নিজেকে ও নির্বিকার রাখার চেষ্টা করলো। এখন ওর সাময়িক ভাবে জ্যোতিরূপ সাজতে আপত্তি নেই। যে কাজের জন্য কোম্পানী ওকে কলকাতা থেকে পাঠিয়েছে, সে কাজ প্রায় সমাধা হয়ে গেল। সুমতি চৌধুরীর আসল পরিচয় আর ঠিকানাটাই বিশেষ-ভাবে দরকার ছিল। এখানকার ব্রাঞ্চের খাতাপত্রও পরীক্ষা করার কথা আছে। আপাতত সেটা স্থগিত রেখে, কলকাতায় চলে গেলেও ক্ষতি নেই। অস্তিত্ব-হীনের অস্তিত্বকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, হিসাবপত্র পরে দেখলেও চলবে। অনিরুদ্ধ ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু সুমতি চৌধুরী জেনেশুনেই

তো সব করেছেন। তাঁকে তো কোম্পানীর কাছে আবেদনপত্রে সই করতে হয়েছে।'

রূপক হেসে বললেন, 'জ্যোতিরূপবাবু, তবে আর আপনাকে বলছি কী। সুমতি চৌধুরী জানেই না যে সে একজন ডিলার, লাখ টাকার ওপর মাল নিয়ে বসে আছে। অথচ তার নাম ঠিকানা, মায় স্বামীর নামটাও রয়েছে। সুমতির বকলমে সই করেছে অন্য একজন যেটা অ্যাটাচড করেছে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসাবে ঘোষ নিজে।'

অনিরুদ্ধর গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু আপাতত সে উপায় নেই। বললো, 'হ্যাঁ, ঘোষ দেখছি সত্যি বোকামি করে বসে আছে। তবে, বিপদ তো কেটেই গেছে।'

রূপক বললেন, 'বলা যায় না, কোম্পানী হয়তো তলে তলে এখনো খোঁজ-খবর করছে।'

অনিরুদ্ধ আলগোছে আর একটি প্রশ্ন করলো, 'আপনি তো দু' লাখ টাকার মালের কথা বলছিলেন। এ তো গেল এক লাখের ব্যাপার।'

রূপক বললেন, 'সেটাও ভুয়া ডিলারকে দিয়েই করেছে। তবে একেবারে ভুয়া না। কোম্পানীর কাছে প্রমাণপত্র হিসাবে যে ডিলারের নাম দিয়েছে, সে ডিলারের নাম লাইসেন্স নাম্বার সত্যি, কিন্তু সেটা এখন ডেড কনসার্ন। ডিলার মারা গেছে আগেই। লাইসেন্সটা ঘোষ সংগ্রহ করেছে সহজেই। এখানে ব্রাঞ্চ অফিসের এক কেরানী শশধর মালাকারের বাবার নামেই সেই লাইসেন্স ছিল, ঠিকানা রায়গঞ্জ। শশধরই লাইসেন্সটা ঘোষকে দিয়েছিল। কোম্পানী খোঁজ করে, কোনোদিনই বের করতে পারে নি, মৃত লোকের হয়ে, তার লাইসেন্স শো করে, কে মালটা নিয়েছে। কোম্পানীকে ঘোষ কখনো সে লোকের হদিস দিতে পারে নি। অথচ সই সাবুদ সবই রয়েছে। মনে হয়, শশধরই ওর বাবার নাম-টাম সই করেছে। নিন স্যার, সিগারেট খান, এসব ব্যবসা জগতের কথা ছাড়ুন।'

রূপক বিলিতী সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। অনিরুদ্ধ সানন্দে সিগারেট নিয়ে ধরালো। মন মেজাজ যতটা খারাপ হয়েছিল এখন ততটাই ভালো। শুধু মনের পটে ঘটনা নামধামগুলো ঠিকমত গেঁথে রাখা। অনিরুদ্ধ তা রেখেছে, রূপক সমাদ্দারের প্রতিটি সংবাদ, ওর স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। এখন কোনোরকমে এখান থেকেই সোজা স্যুটকেসটা নিয়ে, স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চেপে বসতে পারলেই হয়।

এ সময়েই স্যুটেড বুটেড মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক ঢুকলেন, সঙ্গে এক বিবাহিতা মহিলা ও অবিবাহিতা একজন তরুণী। রূপক সমাদ্দার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আসুন স্যার, আসুন।'

অনিরুদ্ধর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি ডি. এস. পি. মিঃ মিত্র, মিসেস মিত্র, মিস মিত্র।

অনিরুদ্ধ আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু পুলিস সুপারের সামনে অস্বস্তিবোধ করলো। এই সুযোগে কি অনিরুদ্ধ নিজের আসল পরিচয়টা দেবার চেষ্টা করবে? এখন তাতে অন্য বিপদের সম্ভাবনা। পুলিস সুপার মিত্র বললেন, 'বড় খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। আমার তো ছবিটবি বিশেষ দেখা হয় না। আমার স্ত্রী আর কন্যাই আপনার দর্শনলাভের জন্য ছুটে এসেছে।'

অনিরুদ্ধ লজ্জিত হাসলো, সবাইকে বসতে বললো। রূপক তখন মিস মিত্রকে বলছে, 'আসলে জ্যোতিরূপবাবু কিন্তু এখন মেকআপ নিয়ে আছেন, ন্যাচারেল মেকআপ যাকে বলে, ওঁর গোঁফ জুলপি রাখা হয়েছে, নতুন একটা রোলের জন্য।'

সুপার কন্যা বলে উঠলো, 'তাই একটু কেমন কেমন লাগছিল, এখন বুঝতে পারছি।'

ডি. এস. পি. সপরিবারে চলে যাবার পরে, দুপুরের খাওয়ার পাট মিটলো। বিকাল হতে না হতেই, অনেকটা গুরু দর্শনের মতো, থানার ও. সি.-র পরিবার, সরকারী বড় বড় অফিসারদের পরিবার একে একে আসতে লাগলো। আপ্যায়নের দায়িত্বটা রূপক সমাদ্দারই নিলেন, এবং বোঝা গেল, এই সুযোগে তিনি কর্তা ব্যক্তিদের কাছে নিজের নানান আর্জিও পেশ করে রাখছেন। সন্ধের পর রূপক সমাদ্দার ঘোষণা করলেন, রাত্রের খাবার খেতে, অনিরুদ্ধকে তাঁর গৃহে যেতে হবে। গাড়িতে রাত্রের অন্ধকারে, জ্যোতিরূপকে কেউ দেখতে পাবে না। বাড়ির লোককে তিনি বারণ করে দিয়েছেন, কারোকে যেন কিছু না বলা হয়।

অনিরুদ্ধ জানে, আপত্তিতে কোনো ফল হবে না। আপত্তি করলো না। কেবল জানিয়ে দিল ও একটু তাড়াতাড়ি খায় এবং শোয়। রাত্রি ন'টার মধ্যে শুতেই হবে, ডাক্তারের বিশেষ নির্দেশ।

সেই অনুযায়ীই ব্যবস্থা হলো। রূপকের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়েরা ছাড়া, বাবা মা এবং একমাত্র বোন নন্দিতা আছে। নন্দিতাকেই দেখা গেল,

সব থেকে খুশি আর চঞ্চল। তার হাসি দৃষ্টি, সব কিছুতেই মনের ভিতরের রঙের বিচ্ছুরণ, যেটা অনিরুদ্ধর প্রাণেও দোলা দিচ্ছিল। এক সময়ে নন্দিতা অনিরুদ্ধর কাছে জানতে চাইলো, ওকে কলকাতায় চিঠি দিতে হলে, কী ঠিকানায় দিতে হবে। অনিরুদ্ধ অনায়াসে বললো, জ্যোতিরূপ তার নিজের ঠিকানায় চিঠি পায় না, কারণ চিঠি মার যায়। সেজন্য তার বন্ধু অনিরুদ্ধ ব্যানার্জীর ঠিকানাতেই তার সব চিঠি যায়। সেই অনুযায়ী, ও অনিরুদ্ধ ব্যানার্জির নাম ঠিকানা লিখে দিল। আর একটু চালাকি করলো, বললো, 'খামের এক কোণে কেবল ইংরাজীতে বড় অক্ষরে জে লিখলেই তা কার চিঠি বোঝা যাবে।'

নন্দিতার প্রাণে যে সুর বেজেছে, কোনো সন্দেহ নেই, কারণ শেষের দিকে কথা বলতে গিয়ে কেবল লজ্জার আবেগই না, একটা ব্যথার সুর ফুটলো। অনিরুদ্ধর চিঠির জবাবের জন্য তার প্রতিটি তনুমন, প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করে থাকবে। এবং সে কলকাতায় গিয়ে দেখা করবে। নন্দিতার প্রাণের সুরটা যে অনিরুদ্ধর প্রাণেও বাজে নি, তা না, কিন্তু উদ্গত দীর্ঘশ্বাসকে দমন করেই প্রাণকে নিরস্ত করতে হলো।

রাত্রি ন'টার মধ্যেই, অনিরুদ্ধ শোবার অবকাশ পেলো। ও এখন একলা, কেউ নেই। মফস্বল শহর নিঝুম, ইতিমধ্যেই নিশুতির স্তব্ধতা। ক্লাবের একতলায় একপাশে, এখন বার রুমে কয়েকজন মদ্যপান আর তাস খেলায় ব্যস্ত। বেয়ারারাও সবাই ওদিকে। অনিরুদ্ধ ঝটিতি তৈরি হয়ে নিল। কলকাতার গাড়ি পাওয়া যাক বা না যাক, যে কোনো গাড়িতে, এ শহর ছেড়ে, সরে পড়তে হবে। এখন বড় রাস্তায় গিয়ে রিকশায় উঠতে হবে। সেই পর্যন্ত, স্যুটকেসটা বয়ে নিয়ে যেতে হবে। ক্লাব থেকে বেয়ারাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরোতে পারলেই হয়।

অনিরুদ্ধ একবার নীচে নেমে এসে একবার টহল দিয়ে গেল। নিরালা, গেটের কাছে কেউ নেই। আবার ওপরে গিয়ে, স্যুটকেস আর অ্যাটাচি নিয়ে, দ্রুত সন্তর্পণে নেমে এলো, হাঁটতে আরম্ভ করলো রাস্তার দিকে। রাস্তায় পড়ে অনেকটা নিরাপদ বোধ করলো। ক্লাবের উজ্জ্বল আলোর তুলনায়, রাস্তার আলোকে প্রায় অন্ধকারই বলা যায়। তথাপি ওকে স্যুটকেস নিয়ে অনেকখানি হাঁটতে হলো এবং রিকশার সন্ধান মিললো।

স্টেশনে এসে জানলো, রাত্রে একটিমাত্র ডাউন প্যাসেঞ্জার গাড়ি আছে, যাবে সামনের জংশন স্টেশন পর্যন্ত, যার দূরত্ব প্রায় এখান থেকে কুড়ি মাইল। অনিরুদ্ধর কাছে যথেষ্ট, কুড়ি মাইল দূরে যেতে পারলেই হবে। তারপরে আগামীকাল সকালবেলা দেখা যাবে।

প্যাসেঞ্জার গাড়িতে ও যখন উঠে বসলো, তখন সারা দিনের উত্তেজনায় ক্লান্ত। বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে, তথাপি নন্দিতা সমাদ্দারের মুখটি ভেসে উঠলো। মনে মনে বললো, 'আমি নিরুপায়। অপরাধ আমার না। কোনো দিন চিঠি পেলে, সব কথা জানানো যাবে।'…তারপরেই ওর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটলো। রূপক সমাদ্দারের কাছে ও একদিক থেকে কৃতজ্ঞ। তিনিই ওর আসল কাজের সমাধান করে দিয়েছেন। কিন্তু এমন চালাক ব্যবসায়ী, আনরুদ্ধকে নিয়ে এরকম পাগলামি করে ফেললেন কেন? বোধহয়, চালাকরাও অনেক সময় অতি চালাকির ফাঁদে পড়েন। এখানে চালাকিটা বোকামি হয়ে গিয়েছিল।

মুক্ত অনিরুদ্ধ খোলা জানলার কাছে মাথাটা নুইয়ে আনলো। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

ছেলের ম্যাও বাবার ছাপা

'না, এভাবে, তোমাকে আমি চুপ করে থাকতে দেব না।'

গায়ত্রীর স্বরে রীতিমতো ঝাঁজ, মুখে ক্ষুব্ধ উত্তেজনার অভিব্যক্তি। খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, তিনি আবার বললেন, 'ব্যাপারটাকে তুমি গায়ে মাখছো না, কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না। যেখানেই যাই, এক কথা। বাড়িতে যে আসে সেও একই কথা জিজ্ঞেস করে, আর বলে, চারিদিকে ঢিঢি পড়ে গেছে, আমি আর কান পাততে পারি না।'

প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে, গায়ত্রী দম নেবার জন্য থামলেন। মাধবের ফর্কে গাঁথা ডিম পোচের টুকরো, প্রায় মুখের কাছে, কিন্তু মুখে তোলবার অবকাশ পাচ্ছেন না, অর্ধেক হাঁ করে গায়ত্রীর কথা শুনছিলেন। গায়ত্রী কথা থামাতেই তিনি পোচের টুকরো মুখের মধ্যে পুরে চিবোতে চিবোতেই বললেন, 'কিন্তু আসলে ব্যাপারটা।'

'আসল নকল জানি না।' গায়ত্রী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন। 'যে লোক জেগে ঘুমোয়, তাকে জাগানো শিবের বাবারও কম্মো নয়। একথা তুমি বলতে পারবে না যে, তুমি কিছু জানো না, তোমাকে কিছু জানানো হয় নি! ব্যাপার তোমার সবই জানা।'

মাধব বুক খোলা পাঞ্জাবিটার হাতা গুটিয়ে, বাটার টোস্ট হাতে নিয়ে, কামড় বসাবার আগে বললেন, 'সবই জানা মানেটা কী? আমি কী করে সব জানবো? আমার মনে হয়, তুমিও সব জানো না।'

বলে, অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবেই টোস্টে কামড় বসালেন। গায়ত্রী অর্থাৎ মাধবের স্ত্রী যতোটা উত্তেজিত, এবং ওঁর স্বর যতোটা উচ্চ, তুলনায় মাধব অনেকখানি শান্ত, এবং তাঁর গলার স্বর যথেষ্ট অবিচলিত ও নরম। গায়ত্রী ঝাঁজে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

ওঁর চোখে এখন রীতিমতো একটা কুটিল সন্দেহ। এখনো চল্লিশে পৌঁছোননি, পৌঁছোব-পৌঁছোব করছেন। চুল এখনো কৃষ্ণ কালো এবং ঘন। সিঁথি একটু চওড়া হয়ে গিয়েছে, দীর্ঘকাল একভাবে আঁচড়ে এবং সিঁদুর লাগিয়ে। দাঁত সব ক'টি অটুট, এবং শরীরে কিছু মেদের ঢল নামলেও, স্বাস্থ্য খারাপ না। সংসারে কারুর যৌবনই থির বিজুরি না, গায়ত্রীরও যৌবনের সেই ঔজ্জ্বল্য নেই, কিন্তু

একটা ঝলক থাকে। তা প্রখর কিরণ না হোক, একটা লাবণ্য থাকে। গায়ত্রীর এখন সেইরকম দেহসৌষ্ঠব। চোখ নাক মুখ ভালো, একটা ব্যক্তিত্বের ছাপও আছে।

মাধব সেই তুলনায় চুলটা বেশ পাকিয়ে ফেলেছেন। দাঁত দৃষ্টি দেহ অবিশ্যি অটুট রেখেছেন। কিছু মেদ সঞ্চয় করেছেন, জায়গা বিশেষে অর্থাৎ পেটের দিকে। সেটাও দাঁড়ালে বা চলাফেরা করলে, তেমন বোঝা যায় না। বয়স পঁয়তাল্লিশ। একটি বিদেশী বাণিজ্য সংস্থার, তেমন একটা কেষ্টবিষ্টুর পদ না হলেও, পদটি দেবভাগ্যের মতোই। আয়করের রাহুর গ্রাসে যা দেবার, দিয়েও মাসে হাজার তিনেক বেতন পান, কোম্পানীর গাড়িও পেয়েছেন। তিনি দাঁতে জিভে টোস্টের টুকরো সামলাতে সামলাতে বললেন, 'মানে ওরা কী করে, তা কি আমাদের পক্ষে সব জানা সম্ভব? আমরা কি আর দেখতে যাচ্ছি, ওরা কখন কোথায় কী করছে না করছে?'

গায়ত্রীর স্বর আরো তীব্র এবং ঝাঁজালো হলো, বললেন, 'সে কথা হচ্ছে না, ওরা কি না কেন করে। জীবনে যেন আমাকে তা কোনো দিন দেখতেও না হয়, তার আগেই যেন আমি চোখ বুজি।'

তাঁর স্বরে বাষ্পের একটু ভ্যাপসানি টের পাওয়া গেল। মাধব ফর্ক শুদ্ধ হাত নেড়ে সান্ত্বনার স্বরে বললেন, 'আহা, অমন করে বলো না। ভবিষ্যতে কী হয় না হয়, কিছুই বলা যায় না, এখন থেকেই চোখ বোজাবুজির কথা আসছে কেন। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে হবে—মানে যাতে ঠিক মতো ব্যবস্থা করা যায়।'

গায়ত্রী এর মধ্যে, গলার বাষ্পটুকু সামলে নিয়েছেন, অভিযোগের স্বরে বললেন, 'সে তো তুমি অনেক দিন ধরেই করছো? এতদিন ধরে যে বারে বারে বলে আসছি, তুমি একবারও ছেলেকে ডেকে শাসন করেছ? এক ফোঁটা ছেলে, নাক টিপলে দুধ বেরোয়, সবে কলেজের গণ্ডি ছাড়িয়েছে, সে এইসব কেচ্ছা কেলেঙ্কারি করে বেড়াবে, আর তা সইতে হবে? তার মানে, তুমিও ছেলেকে আজকালকার এইসব মড ছোকরার চোখে ত্যাখো, তা না হলে চুপ করে থাকার মানে কী?'

মাধব গায়ত্রীর কথার ফাঁকে একটু ডিম পোচ খেয়ে নিয়েছেন। একটু হাসলেও, তার মধ্যে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললেন, 'আহা, খুকু (ডাক নাম) শোন, তোমার ছেলে অনার্স নিয়ে বি. এস-সি পাস করেছে। যতোই দুধ খাইয়ে

থাকো, নাক টিপলে তা আর এখন বেরোবে না। শাস্ত্রে বলে, ষোড়শ বর্ষেই ছেলে সাবালক, সে তখন বাবা মায়ের সন্তানও যেমন, বন্ধুস্থানীয়ও বটে।'

'তবে আর কী, ছেলেকে নিয়ে এখন বাবা ছেলে মুখোমুখি বসে সিগারেট খাও। আরও যদি কিছু থাকে, তাও করো।' গায়ত্রী বিদ্রূপে ঝাঁজলেন, এবং আবার বললেন, 'কিন্তু দোহাই আমাকে বাদ দাও, আমি তোমাদের মধ্যে থাকতে চাই না।'

গায়ত্রী সরে যাবার উদ্যোগ করতেই মাধব তাঁর একটি হাত টেনে ধরলেন, 'শোন শোন, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো। তোমার ছেলে মড ছোকরা না, রকবাজ টকবাজও না, আমি তা ভাবতে যাবো কেন। আমি চুপ করে থাকি বলে কি সেটা ছেলের প্রতি অবহেলা? মোটেই তা না। কাজকর্মে কী রকম ব্যস্ত থাকি, দেখেছ তো? তেমন খেয়াল থাকে না।'

গায়ত্রী যেন একটু ঠাণ্ডা হলেন, বললেন, 'খেয়াল না করলে কি চলবে?'

'তা কেমন করে চলবে।' মাধব বললেন, 'নিশ্চয়ই খেয়াল করতে হবে। আমার ছেলে, আমি খেয়াল করবো না? আসলে, ব্যাপারটা বেশ গুরুতর, ধরতে পারি নি। আচ্ছা? মেয়েটা কে বলোতো? কার মেয়ে, কোথায় থাকে? আমাদের চেনা-শোনা?'

গায়ত্রী বললেন, 'তোমাকে অনেকবার বলেছি, তুমি কান দাও নি। মেয়েটা থাকে বড় রাস্তায় ট্রাম লাইনের ওপারে। পাকা ঝিকুটি মেয়ে।'

মাধব ইতিমধ্যে খেতে আরম্ভ করেছেন, এবং খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি চেনো নাকি? মানে আলাপ আছে?'

গায়ত্রী বললেন, 'আলাপ-টালাপ নেই, তবে চিনি।'

'কী নাম? পড়াশুনা করে?'

'শুনেছি এ বছর হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে কলেজে ঢুকেছে। নাম বন্যা।'

'বন্যা?' মাধব ডিম চিবোতে চিবোতে যেন বিষম খেয়ে বললেন, 'বাবা! নাম শুনলেই মনে হয়, রোখা যাবে তো?'

গায়ত্রী ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'রোখা যাবে মানে?'

মাধব হেসে বললেন, 'নাম বন্যা বললে কী না, তাই বলছি। তা কার মেয়ে জানো টানো? মানে ভদ্রলোকের মেয়ে তো, না কী?'

গায়ত্রী বললেন, 'ভদ্রলোক কি ছোটলোক জানি না। শুনেছি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট, ইনকাম ট্যাকস্ ল-ইয়ার, নিজের অফিস-টফিস গাড়ি-ফাড়ি আছে। তা থাকুক গে, যাদের মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়, তাদের আমি ভদ্রলোক বলি না।'

'সেটা আর বাবা কী করবে, কিন্তু—।'

গায়ত্রী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'বাবা কী করবে মানে? বাবা মা মেয়েকে শাসন করবে না? খবর রাখবে না, মেয়ে কি করে বেড়াচ্ছে।'

মাধব শান্তভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'তা রাখবে কিন্তু কতোটা বলো। তাদের তো কাজকর্ম সংসার আছে। যেমন তোমার ব' আমার। আমরাই বা আমাদের মেয়ে নীপার জন্য কি করতে পেরেছিলাম। সেই তো অভিজিৎকে বিয়েই করলো, আমরাও হেসে-খেলে দিলাম। কে জানতো আমাদের মেয়ে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে?'

'চুপ করো।' গায়ত্রী প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ছেলেমেয়েদের বিষয়ে কথা বলবার সময় ভাষাটা একটু মার্জিত করো।'

মাধব বললেন, 'ওহ্, তাও তো বটে, ডুবে জল খাওয়া কথাটা—থাকগে, এখন যে কথা হচ্ছিল। লোকটা সি. এ. 'ল' ইয়ার, তার মানে নিশ্চয়ই চশমখোর। এতো কাছাকাছি থাকে, নামটা জানি না?'

গায়ত্রী বললেন, 'অশনি মিত্তির।'

'কায়েত?' মাধবকে যেন আচমকা ঘুম থেকে ঠেলে জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গায়ত্রী বললেন, 'তবে আর তুমি শুনছো কি!'

মাধব প্রায় এক মিনিট নিঃশব্দে চা পান করলেন, তারপরে বললেন, 'এতে অবিশ্যি আজকাল কিছুই এসে যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, বামুনের গোয়ালেই গরু আজকাল বেশি। তার থেকে অনেক কায়েত অনেক বেশি ভালো।'

গায়ত্রী রুষ্টস্বরে বললেন, 'সে সব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার কী। আমরা তো আর আত্মীয়তা করতে যাচ্ছি না।'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই।' মাধব পায়জামা পরা পায়ের ওপর পা তুলে, সিগারেট ধরালেন, এবং বেশ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা খুকু, আমাদের শামু আর-কী বললে নামটা—বান—না, বন্যা, হ্যাঁ, কী করে ওরা বলো তো? ঠিক কী শোনা যায় ওদের নামে?'

গায়ত্রী বললেন, 'কী আবার? মেয়েটার সঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রেস্টুরেন্টে সিনেমায় পার্কে ময়দানে। আমার দাদা সেদিন দেখেছেন, লেকের কাছে তোমার ছেলে, মেয়েটার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর সিগারেট টানছে।'

মাধব বললেন, 'শামু বোধ হয় জানতো না, ওর মামা সে সময়ে লেকে যাবে, তা হলে অন্তত মেয়েটার হাত ধরতো না, সিগারেটও খেতো না।'

'জানি না।' অসীম বিরক্তির ঝাঁজে গায়ত্রী বললেন, 'আমি তো দাদাকে বললাম, 'ধরে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিলে না কেন?'

মাধব হেসে বললেন, 'তা কী করে সম্ভব, তা তো সম্ভব না। গায়ে হাত তোলা কি এতোই সহজ, তাও আবার পাবলিকলি? বাবা হয়ে আমিই পারতাম না, তায় আবার মামা।'

গায়ত্রীর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হলো, বললেন, 'কেন বাবা মামা মারতে পারে না?'

'পারবে না কেন, মারবার একটা বয়স আর স্থান-কাল আছে তো।' মাধব বলেই তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে পিছলে চলে গেলেন, 'যাক গিয়ে, ব্যাপারটা বুঝেছি আমি, আর ব্যাপারটা আমার মোটেই ঠিক লাগছে না। সে কোথায়, শামু?'

বলতে বলতে মাধবের মুখ রীতিমতো গম্ভীর হয়ে উঠলো। গায়ত্রীও যেন একটু সন্ত্রস্তই হলেন। বললেন, 'এই তো একটু আগে বাড়িতে এসেছে, বোধ হয় পড়ছে টড়ছে কিছু।'

'হুম!' মাধবের মুখ আরো গম্ভীর এবং চিন্তিত দেখাচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এখন প্রায় আটটার সময়, মাধব সন্ধ্যাকালীন জলযোগ করলেন, রাত্রের খাবার খেতে প্রায় বারোটা। এসময়ে সাধারণত বাইরে বা বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেন, বা পার্টি-টার্টি থাকলে যান। তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পিছন থেকে গায়ত্রী বললেন, 'তোমার অল্প কথাতেই কাজ হবে, বেশি কিছু বলো না। রাগারাগি করো না, তোমার প্রেসারটা আবার বাড়বে।'

'হুম!' শব্দ করে, মাধব খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গায়ত্রী সঙ্গে যাবেন ভাবলেন, কিন্তু গেলেন না, রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

মাধব এলেন শামুর ঘরের দরজায়, ডাকলেন, 'শামু আছিস?'

শামুর প্রায় চমকানো স্বর শোনা গেল, 'কে বাবা? আছি।' বলতে

বলতে দরজার সামনে এলো। শামু বাবা মেশানো চেহারা পেয়েছে। ঠিক কোমল বলা যাবে না, ইতিমধ্যে যেন যৌবনের প্রখরতা আর গাম্ভীর্য এসে গিয়েছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি গভীর এবং কোমল। জিজ্ঞেস করলো, 'কী বলছো বাবা?'

মাধব গম্ভীর মুখে শামুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে, দরজাটা ভেজিয়ে এসো।'

তুই থেকে তুমি এবং গম্ভীর স্বরে দরজা ভেজানোর নির্দেশ শুনেই শামুর মুখের চেহারা বদলিয়ে গেল। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, বাবার দিকে তাকালো। মাধব খাটের মাথার কাছে, টেবলের সামনে চেয়ারে বসে, আঙুল দিয়ে খাট দেখিয়ে বললেন, 'এখানে এসে বসো।'

শামুর মুখে উৎকণ্ঠার সঙ্গে এবার একটু ভয় দেখা দিল, দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। ও বাবার দিকে মুখ করে খাটে বসলো। মাধব তাকালেন শামুর চোখের দিকে, শামু তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে আবার তাকালো। মাধব জিজ্ঞেস করলেন, বন্যা কে?'

প্রশ্নটা এমনই ঝটিতি এবং আকস্মিক, শামু থতিয়ে গিয়ে, নামটাই কেবল উচ্চারণ করলো, 'বন্যা!'

'হ্যাঁ, বন্যা!' মাধব গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে সে?'

শামুর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো, রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে ঘামতে লাগলো। বললো, 'ইয়ে মানে, একটা মেয়ে।'

'সেটা আমি জানি, একটা মেয়ে।' মাধব একটু ধমকের স্বরে বললেন, 'সে তোমার কে?'

'আমার?' শামুর স্বর একেবারে শুকিয়ে গেল, গলা কাঠ!

মাধব সিগারেটে টান দিয়ে, নিজেই বললেন, 'বোধহয় তোমার বন্ধু?'

'মানে—।' শামু ঢোক গিলছে।

মাধব অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'এর আবার মানে, মানে কী আছে? এ তো সোজা ব্যাপার। মেয়েটি তোমার বন্ধু, তুমি আর সে সিনেমায় যাও, রেস্তোরাঁয়, গঙ্গার ধারে, ময়দানে লেকে ঘুরে বেড়াও। তাই তো, না কী?'

শামু মাথা ঝাঁকিয়ে, সম্মতি জানালো, তারপরে বললো, 'হ্যাঁ।'

মাধব কঠিন চোখে শামুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বন্ধু কি ভদ্রলোকের মেয়ে?'

শামু একটু অবাক হয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

'তুমিও নিশ্চয় ভদ্রলোকের ছেলে?' জিজ্ঞেস করলেন মাধব।

শামু আর একটু অবাক হয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

মাধব ঠোঁট ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা বন্ধু হলে, তারা যে কেবল রাস্তায় ঘাটে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়, তা জানতাম না। কেন, বন্ধুকে বাড়িতে ডাকা যায় না? বাবা মা ভাই বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় না? ঘরে বসে কথা বলা যায় না? এটা কী ধরনের বন্ধুত্ব আমি বুঝি না। লজ্জা করে না, একটা ভদ্রলোকের মেয়ে তোমার বন্ধু, আর তুমি তাকে কোনোদিন বাড়িতে আসতে বলো না?'

শামুর গভীর কোমল চোখ একেবারে গোলাকার হয়ে উঠেছে, চক্ষু তারকা বাবার চোখে নিবদ্ধ। একটি কথাও বলতে পারছে না।

মাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বন্ধুর সঙ্গে কি আমাদের আলাপ হতে নেই?'

শামু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ—থাকবে তো।'

'থাকবে তো, তা করো নি কেন?' মাধব ধমকে উঠলেন, 'যতো বাজে লোকের মুখে সব বাজে কথা শুনতে হয়? লেখাপড়া শিখে একটা বাঁদর হয়েছিস, না? জানিস না, না দেখলে জানলে, খালি লোকের মুখে শুনলে মেজাজ খারাপ হয়। তোর মায়ের মেজাজ কি সাধে খারাপ হয়েছে? তা ছাড়া, আমাদেরও তো ইচ্ছে করে, আমাদের ছেলে কাদের সঙ্গে মিশছে, তারা কেমন, সেটা জানি। তুই কখনো বন্যাদের বাড়ি গেছিস?'

শামু লজ্জা পেয়ে বললো, 'গেছি?'

'তুই একটা আত্যন্ত অসভ্য!' মাধব বলে উঠলেন, 'নিজে গেছিস ওদের বাড়িতে, আর নিজেদের বাড়িতে আসতে বলিস নি!'

মাধব উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলেন, 'শুধু শুধু একটা সহজ ব্যাপারকে জটিল করে তোলা। লোকজনের কাছে যেন আর কিছু শুনতে না হয়, বলে দিলাম।'

বলে বেরিয়ে গেলেন। বারান্দা দিয়ে, জামাকাপড় বদলাবার জন্য নিজের ঘরে গেলেন। গায়ত্রী সেখানে রীতিমতো উৎকণ্ঠিত মুখে বসেছিলেন। মাধব ঘরে ঢুকতেই তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বললে? খুব রাগারাগি করোনি তো?'

মাধব বললেন, 'না না, রাগারাগি করবো কেন? তা বলে বকা ঝকা একটু না করলে হয়? একটু বকুনিও দিলাম, ব্যাপারটাও বুঝিয়ে দিলাম। এর পর থেকে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গায়ত্রীর মুখের উদ্বেগ কাটলো, তিনি হাসলেন, 'এবার বুঝেছ তো, কেন

তোমাকে বলতে বলেছি ? হাজার হলেও, ছেলেদের কাছে, মা-ও মেয়েই। বাপের কথা আলাদা। মা বললে যা হয় না, বাপ বললে তা হয়।'

মাধব বললেন, 'চলো তা হলে আজ দুজনে একটু বেরোই।'

গায়ত্রী বললেন, 'চলো। আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।'

বোঝা গেল, গায়ত্রী শামুর ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন। এখন মন বেশ নিরুদ্বেগ, প্রফুল্ল, অতএব স্বামীর সঙ্গে বেরোতেও আপত্তি নেই।

মাধব পরের দিন বিকালে পাঁচটার সময় অফিসের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এ সময়ে একটা টেলিফোন এলো। রিসিভার তুলে, তিনি কিছু বলবার আগেই, গায়ত্রীর উত্তেজিত গলা শুনতে পেলেন, 'আমি গায়ত্রী বলছি। তুমি শামুকে সেই মেয়েটাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসতে বলেছ ?'

মাধব কথাটা শুনেই থমকে গেলেন, এবং নিজেকে প্রস্তুত করে বললেন, 'কেন, কী হয়েছে ?'

গায়ত্রীর উত্তেজিত স্বর প্রায় কান্নারুদ্ধ শোনালো। 'শামু সেই মেয়েটাকে নিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, এতো বড় সাহস ! এখন কী না আবার, ঘরে বসে মেয়েটার সঙ্গে গল্প করছে ! তুমি বাড়ি এলে, তোমার সঙ্গেও নাকি আলাপ করিয়ে দেবে ! কী আস্পর্ধা !'

গায়ত্রীর স্বর কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল। মাধব টেলিফোনে কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলেন। তিনি বুঝতে পারেন নি, ব্যাপারটা এরকম হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। অথচ তিনি ভালো ভেবেই, শামুকে উপদেশ দিয়েছিলেন। বললেন, 'শোন খুকু—।'

'না শুনবো না।' গায়ত্রী টেলিফোনে ফুঁসে উঠলেন, 'আমি শামুকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছি, ও বললো, তুমিই নাকি মেয়েটাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসতে বলেছ। সত্যি ?'

মাধবের মনে হলো, জিজ্ঞাসাটা উদ্যত খড়্গের মতো তাঁর মাথার ওপরে ঝুলছে। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, 'মানে, আমি—হ্যাঁ—আমি—।'

'হ্যাঁ ?' গায়ত্রীর প্রায় আর্তনাদ শোনা গেল, 'তুমি তা হলে বলেছ ?'

'শোন খুকু—।'

'কিছু শুনবো না। এই তোমার শিক্ষা, ছেলেকে একটা মেয়ের সঙ্গে—।'

'খুকু—।'

'চুপ! উহু ভগবান, বাপ ছেলেকে এই শিক্ষা দেয়? আমি দাদার বাড়ি যাচ্ছি। এখুনি এই মুহূর্তেই। তোমার সংসারে আমি আর নেই।'

টেলিফোনের লাইন কেটে গেল। মাধব কয়েকবার ডাকলেন, 'খুকু খুকু!' কোনো জবাব না পেয়ে, মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে ভাবতে বসলেন। অফিসের কাজকর্ম মাথায় উঠে গেল, ভাবতে লাগলেন, কোথায় তাঁর ভুল হয়েছে। কোনো ভুলই খুঁজে পাচ্ছেন না। যা বলা উচিত ছিল তা-ই বলেছেন। মনে মনে তিনি শামুর ওপরে চটে উঠলেন। ভাবলেন, হতভাগাটা গোড়াতেই ভুল করে বসেছে। ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে, এখন তাঁকে খেসারত দিতে হচ্ছে।

এমন সময়ে তাঁর সহকর্মী অবনী সমাদ্দার দরজা ঠেলে চেম্বারে ঢুকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মাধবদা, আর কতক্ষণ? বাড়ি যাবেন না?'

মাধব বললেন, 'বাড়ি তো যাবো, এদিকে এক কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে।'

'কী ব্যাপার?'

'বসো, বলছি।'

অবনী চেয়ারে বসতে, মাধব তাঁকে ঘটনাটা সব বললেন। অবনী সব শুনে, হেসে বললেন, 'দাদা ছেলের মতো আপনিও গোড়ায় গলদ করে বসে আছেন।'

মাধব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রকম?'

অবনী বললেন, 'আসলে তো ব্যাপারটা বৌদিকে নিয়ে। আপনি ছেলেকে সুনীতি শেখাতে গেলেন, বৌদিকে ঠাণ্ডা করবেন বলেই তো?'

মাধব বললেন, 'হ্যাঁ।'

অবনী বললেন, 'সেইজন্যই আপনার উচিত ছিল, বিষয়টা আগে বৌদিকে বলা, আর তাঁকে কন্‌ভিনস্‌ করা। সব মায়েরাই, যেকোনো মেয়ের সম্পর্কে সন্দিহান, এটাও সেই চিরন্তন, বুঝেছেন তো, বিশেষ করে সে যদি আবার ছেলের বৌ বা বান্ধবী হয়, তাঁর সুপ্রিমিটি, তাঁর এগো তিনি কিছুতেই নষ্ট হতে দেবেন না। তাঁর কাছে এসে সবাইকে নত হতে হবে।'

মাধব বললেন, 'সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছিল!'

অবনী বললেন, 'হচ্ছিল, কিন্তু ওই গোড়ায় গলদ! বৌদির অনুমতি না নিয়ে, তাঁকে না জানিয়ে, হঠাৎ ছেলের বান্ধবীকে দেখে ক্ষেপে গেছেন। ক্ষেপে তো আগেই ছিলেন।'

মাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে এখন কী করা যায় বলো তো?'

অবনী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভাবতে হবে। যে ভাবেই হোক, বৌদিকে বোঝাতে হবে, আপনি ভুল করেন নি, কিন্তু বৌদিকে আগে না বলাটা খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। এখন এটা খুব কঠিন টাস্ক।'

দুই সহকর্মী গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে, অবনী বললেন, 'আচ্ছা দাদা, বাড়িতে সবাই আপনাকে কী রকম লোক বলে জানে?'

'কী রকম লোক মানে?' মাধব ভ্রূকুটি করলেন।

অবনী বললেন, 'মানে আপনার মেজাজ সম্পর্কে সবাই কীরকম ভাবে। বাড়িতে কি আপনি খুব রগচটা?'

'মোটেই না।'

অবনী বললেন, 'সেটা আমি জানি। আপনি বেশ খোশ্ মেজাজের ঠাণ্ডা মানুষ। কিন্তু রাগটাগ করেন না?'

মাধব বললেন, 'করি বৈকি। আমি একবার রাগলে সবাই থরহরি কম্প।'

'বৌদিও?'

'নিশ্চয়, তখন তোমার বৌদিরও কাঁপ্ ছুটকে যায়।'

অবনী চোখে ঝিলিক দিয়ে বললেন, 'তা হলে দাদা, বৌদির কাঁপ্ ছুটকেই দিতে হবে। এখন আর নরম হলে চলবে না। গরমে গরম তাল দিতে হবে। মানে আপনাকে একটু অভিনয় করতে হবে। বৌদিকে খালি শুনিয়ে দিতে হবে, আপনি যা বুঝেছেন, তা করেছেন, তিনি কোন্ সাহসে অবুঝের মতো ব্যবহার করছেন—এই সব। ঠিক মতো বলতে হবে, যাতে বৌদি ফীল করেন, আপনার ওপর দিয়ে তাঁর যাওয়া উচিত হয়নি। তারপরে তো পরে দেহিপদপল্লব মুদারম্ আছেই।'

মাধব একটু ভাবলেন, এবং মনে মনে শক্তি সঞ্চার করার চেষ্টা করলেন, বললেন, 'ছেলের ম্যাও সামলাতে গিয়ে, বাপের হ্যাপাটা একবার ভ্যাখো।'

অবনী বললেন, 'সবই ঠিক ছিল, একটুখানি ভুল হয়ে গেছে।'

মাধব বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথানুযায়ী কাজ করে দেখি। আমার সম্বন্ধী প্রিয়নাথের বাড়িতে গেছেন তোমার বৌদি! সেখানে একটা টেলিফোন করি।'

'কিন্তু দাদা, খুব সামলে।'

মাধব রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। ওদিকে রিঙ্ করার শব্দ হলো,

তারপরেই রিসিভার তোলার শব্দ হলো, এবং মহিলা স্বর শোনা গেল, 'হ্যালো।'

মাধব প্রথমেই চড়া স্বর ধরলেন, 'কে বলছেন, গায়ত্রীর বৌদি ?'

জবাব এলো, 'হ্যাঁ, আপনি—?'

'আমি মাধব বলছি।' মাধব যেন হুমকে ওঠার মতো বললেন, 'ওখানে গায়ত্রী গেছে ?'

মহিলার ভীরু উৎকণ্ঠিত স্বর, 'হ্যাঁ।'

'ডেকে দিন এখুনি।'

সঙ্গে সঙ্গে ওপারে 'দিচ্ছি' বলেই চিৎকার শোনা গেল, 'ঠাকুরঝি, শীগ্‌গির এসো। মাধববাবু তোমাকে ডাকছেন।'

কিছুক্ষণ নীরব। মাধব অবনীকে চোখ টিপলেন। ওপার থেকে গায়ত্রীর গম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'হ্যালো।'

মাধব ঝলকে উঠে বললেন 'কে, গায়ত্রী ?'

ইচ্ছা করেই 'খুকু' বললেন না। একটু ত্রস্ত জবাব এলো, 'হ্যাঁ।'

'তুমি কি মনে করো নিজেকে, অ্যাঁ ?' মাধব বললেন হুমকানো স্বরে, 'তুমি কি মনে করো, তুমি যা বোঝ, তার উপরে আর কিছু বোঝার নেই ? (গায়ত্রী কিছু বলবার চেষ্টা করলেন।) থামো, তোমার কথা আমি পরে শুনবো। তোমার ছেলের জন্য তোমার দুশ্চিন্তা আছে। তেমনি আমার ছেলের জন্য আমারও আছে। বোঝ না কিছুই, আবার রাগ করে বাড়ি ছেড়ে দাদার বাড়ি গিয়ে বসে আছো ! (গায়ত্রী আবার কিছু বলবার চেষ্টা করলেন)। চুপ করো, আমাকে বলতে দাও। তুমি আগে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করবে, তারপরে যা খুশি তাই করো গে, আপত্তি নেই। আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি, আর কেন করেছি, তা যদি বুঝতে, তুমিও ছেলের মতো ছেলেমানুষি করে এভাবে বাড়ি থেকে চলে যেতে না। মনে রেখো, আমারও আত্মসম্মান বলে একটা কথা আছে। যাই হোক, আমি অফিস থেকে বেরোচ্ছি। তোমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবো। আমি তোমার দাদার বাড়িতে ঢুকবো না, গাড়ির হর্ন শুনে চলে আসবে, বুঝেছ ?'

গায়ত্রীর স্তিমিত আবার রুদ্ধস্বর শোনা গেল, 'আচ্ছা।'

মাধব রিসিভারটা জোরে শব্দ করে নামিয়ে দিলেন। অবনী ব্যগ্র জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন। মাধব বললেন, 'মনে হয় ঢিলটা ঠিকই লেগেছে।'

অবনী হেসে বললেন, 'এখন পাটকেলটা না ফিরে আসে, সেটা দেখুন। আড়াল থেকে টেলিফোনে একরকম, সামনাসামনি খুব সাবধান।'

মাধব চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'দেখা যাক, এখন বেরোই।'

মাধব গাড়ি নিয়ে, তাঁর সম্বন্ধী প্রিয়নাথের বাড়ির সামনে গিয়ে জোরে জোরে কয়েকবার হর্ন বাজালেন। কয়েক সেকেণ্ড পরেই, গায়ত্রী বেরিয়ে এলেন। দরজায় প্রিয়নাথের স্ত্রীর চোখে উৎকণ্ঠার ছায়া। গায়ত্রীর চোখে উৎকণ্ঠা, অথচ অভিমানের ছায়া। তিনি এসে দরজা খুলে বসলেন। মাধব গাড়ি স্টার্ট করলেন। গম্ভীর মুখ থম্‌থম্‌ করছে।

গায়ত্রী নিচু বিমর্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদার বাড়ি কী দোষ করেছে, একবার নামলেই হতো।'

মাধব গম্ভীর স্বরে বললেন, 'দাদার বাড়ি কিছু দোষ করেনি, কিন্তু মানুষের মনের অবস্থা সব সময় একরকম থাকে না। তুমি কি বুঝবে, আমার মাথায় এখন কী দুশ্চিন্তা?'

গায়ত্রী একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, কিসের দুশ্চিন্তা?'

'কিসের দুশ্চিন্তা।' মাধব প্রায় ধমকে উঠলেন, 'আমি কোথায় ভেবেছি, ছেলে যা করুক, আমাদের চোখের সামনে থাক। আর তুমি কী না, তাদেরই একসঙ্গে বাড়িতে রেখে চলে এলে? এর যদি কোনো ব্যাড কনসিকোয়েন্স হয়, কে দায়ী হবে?'

গায়ত্রীর মুখ যেন উদ্বেগে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'জানি।' মাধব যেন চাপা গর্জন করলেন, এবং গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলেন।

ওঁরা যখন বাড়ি এসে পৌছুলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। বাইরে গাড়ি রেখে বাড়িতে ঢুকে, ভৃত্যের সঙ্গে দেখা হতেই মাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'শামু কোথায়?'

ভৃত্য বললো, 'ঘরে।'

'আর কে আছে সেখানে?'

'এক নতুন দিদিমণি আর রামু ভাই।'

রামু শামুর ছোট, বছর দশেক বয়স। মাধব শামুর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন, শামু ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে বসে, জল রঙ দিয়ে ছবি আঁকছে, বন্যা আর রামু তা-ই গভীর অভিনিবেশে দেখছে। তাঁর জুতোর শব্দে

সবাই ফিরে তাকালো। শামু বলে উঠলো, 'ওই বাবা, তুমি এসেছ? এর নাম বন্যা।'

বন্যা নামে মেয়েটাকে এখনো কিশোরী বলা যায়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল স্নিগ্ধ একহারা মেয়েটির চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, মুখখানিও মিষ্টি। ও উঠে এসে মাধবকে প্রণাম করলো। মাধব বললেন, 'থাক থাক, বসো। তুমি কী পড়ো?'

বন্যা বললো, 'ফিজিকস্ অনার্স, ফার্স্ট ইয়ার।'

মাধব বললেন, 'বাহ্, সায়েন্স পড়ছো? ভেরি গুড!'

গায়ত্রীও এসে মাধবের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। শামু জিজ্ঞেস করলো, 'মা, তুমি হঠাৎ কোথায় গেছলে?'

মাধব জবাব দিলেন, 'তোর মাকে টেলিফোন করে ডেকেছিলাম। একটু দরকার ছিল। নে, তোরা যা করছিস কর।'

বলে তিনি নিজের ঘরের দিকে গেলেন। শামু বললো, 'মা, আমাদের কিছু খেতে দেবে?'

গায়ত্রী বললেন, 'দেব। দিচ্ছি, তোরা বোস।'

গায়ত্রী মাধবের ঘরে এলেন। মুখ এখনো অন্ধকার, ছলছল চোখে অভিমান। মাধব বললেন, 'এবার বুঝতে পেরেছ, আমি কী চেয়েছি? বাইরে দশ জায়গায় যাবার থেকে, আমাদের চোখের সামনে বাড়িতেই থাকুক, তাতে ওদেরও মন স্বাভাবিক থাকবে, আমরাও নিশ্চিন্ত। এটাই ভালো না?'

গায়ত্রী রুদ্ধ স্বরে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি কি এসব জানতাম? তা বলে তুমি আমাকে এরকম করে বকলে?'

মাধব গায়ত্রীকে হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন। গায়ত্রীর চোখ জলে ভরে উঠলো। মাধব বললেন, 'অবিশ্যি তোমাকে আমার আগে বলা উচিত ছিল। কাজকর্মে ছাই কিছু মনে থাকে নাকি?' বলে তিনি গায়ত্রীকে বুকের কাছে নিয়ে, তাঁর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে এলেন। গায়ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, 'বুড়ো বয়সে আর এসব ভালো লাগে না, ছাড়ো, আমি ওদের খেতে দেবো।'

বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন। মাধব বললেন, 'বন্যা মেয়েটি তো দেখছি ভালোই।'

গায়ত্রী মাধবের দিকে তাকালেন। মাধব তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না, আমি কিছু ভেবে বলিনি।'

গায়ত্রী বেরিয়ে গেলেন। মাধব মাথায় হাত দিয়ে বসে বললেন, 'বাব্বা! খুব জোর সামলানো গেছে।'

খাঁচাকল

মফস্বল শহরের ঘিঞ্জি দোকানপাট এলাকায়, বেমানান ভাবে, ঝকঝকে প্রকাণ্ড গাড়িটা ঢুকল। রাত্রি সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কেবল খাবারের দোকান বা যেগুলোকে রেস্টুরেণ্ট বলে, সেগুলো এখনো খোলা। এর ফাঁকে, এখনো দু একটা অন্য দোকানও, দোকান-আইনকে কলা দেখিয়ে, খুলে রেখেছে।

গাড়িটা এসে দাঁড়াল রাস্তার ধারে, একটা দরজা বন্ধ দোকানের কাছে। রাস্তার ওপরে, বাজারের যত ওঁচলা ছড়ানো। রাস্তার ষাঁড় আর কুকুর, একসঙ্গে সেগুলো ঘাঁটছে। গাড়ির আরোহী, দরজা বন্ধ দোকানের দিকে তাকিয়ে একটু ভুরু কোঁচকালেন। ড্রাইভারের দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে, গলা খাঁকারি দিলেন। ড্রাইভার সামনের দিকে ফিরে, পাথরের মতো চুপচাপ বসে আছে।

আশেপাশের লোকেরা গাড়ির আরোহীকে একবার দেখল। সকলেরই চেনা লোক। উনি ঘোষ অ্যাণ্ড সন্স এঞ্জিনীয়ারিং ফ্যাক্টরীর মালিক গঙ্গারাম ঘোষ। বয়স বছর ষাট। ফরসা দোহারা চেহারা। মাথার চুল সবই প্রায় সাদা। নাক চোখ মুখ বেশ ভাল। যৌবনে হয়তো খুবই সুন্দর ছিলেন। এই বয়সকালে, এখন সবই একটু ভারী, ভাঁজ পড়া শিথিল। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, দামী পাথরের বোতাম, মোটা ফরসা আঙুলে মোগলাই দুটো আংটি, কবজিতে মূল্যবান ঘড়ি। চুনোট করা কোঁচানো ধুতির নিচে, নাগরা নাক উঁচিয়ে আছে। 'আতরের গন্ধে মৌ মৌ। সব মিলিয়ে, বোঝা যায়, গঙ্গারাম ঘোষ বেশ শৌখীন এবং বিলাসী।

গঙ্গারাম আবার দরজা বন্ধ দোকানটার দিকে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে লক্ষ করে দেখলেন, তালা বন্ধ নেই। ভিতর থেকে বন্ধ. এবং দরজার ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে। যেন নিশ্চিন্ত হলেন। ছড়ি ভর দিয়ে ওঠবার উদ্যোগ করতেই, ড্রাইভার ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে নামতে গেল, ওঁর নামবার জন্য দরজা খুলে দেবে বলে। উনি বললেন, 'থাক, তোমাকে আর নামতে হবে না।'

গঙ্গারাম দোহারা মোটা শরীরটা নিয়ে বেশ কসরত করে নামলেন। বললেন, 'ব্যাগটা দাও।'

ড্রাইভার সামনের সীট থেকে, চামড়ার একটা বড় ব্যাগ ওঁর হাতে তুলে দিল। উনি বললেন, 'তুমি বাড়ি চলে যাও।'

ড্রাইভার হুকুম পেয়ে চলে গেল। গঙ্গারাম ছড়ি দিয়ে বন্ধ দরজায় ঠুক ঠুক করে ঠোকা দিয়ে নিচু স্বরে ডাকলেন, 'কই গ, খুলবে নাকি?'

কোনো সাড়াশব্দ নেই। গঙ্গারাম দরজার আরো কাছে গিয়ে ঠোকা দিলেন, ডাকলেন, 'কই, দরজা খোল। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

ভিতরে ঘটাং করে শব্দ হল, তারপরেই দরজা খুলে গেল। দেখলেই বোঝা যায়, একটি ছোট লোহার দোকান। স্ক্রু নাট বোল্ট ইত্যাদি নানা জিনিসের বাক্স থাকে থাকে সাজানো। সামনের চৌকাটের কাছে একটা ড্রয়ার-ওয়ালা সরু টেবিল, অর্থাৎ কাউণ্টার। বসবার জন্য একটি ছোট টুল। এত ছোট জায়গা, ভিতরে একটি লোকের পক্ষে নড়াচড়া করাও যেন মুশকিল। কিন্তু তার মধ্যেই, এক কোণে একটা মিনি টেবিল ফ্যান।

দরজা খুলে যিনি সামনে দাঁড়ালেন, তাঁর বয়সও গঙ্গারামের মতোই প্রায়। তবে চেহারা সম্পূর্ণ বিপরীত। রোগা বেঁটেখাটোর ওপরে, বেশ শক্ত মানুষ বলেই মনে হয়। রঙ ময়লা। মাথায় সুবিস্তৃত টাক। ঘাড় আর কানের কাছে অল্প পাঁশুটে বর্ণের চুল। চোখে চশমা। গায়ে মোটা কাপড়ের হাফশার্ট। কোঁচাটা পেটের কাছে তুলে গোঁজা, তাই সেখানটা ফুলে আছে। ইনি এই 'অমৃত আয়রন শপ'-এর মালিক হরলাল গোস্বামী।

হরলাল দরজা খুলে দাঁড়ালেন। রাগে আর বিরক্তিতে, তাঁর ঠোঁট ওল্টানো, নাকের পাটা ফোলা, চোখের কোণ কোঁচকানো। প্রথমেই খেঁকিয়ে ওঠার মতো করে বললেন, 'কেন ঘুমোব কেন? এটা কি ঘুমোবার জায়গা? আমার কি বাড়িঘরদোর নেই?'

গঙ্গারাম নিরীহ ভঙ্গিতে বললেন, 'না তা না, তোমার সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না, তা-ই। নাও, এটা ধর।'

বলে ব্যাগটা বাড়িয়ে ধরলেন। হরলাল রুষ্ট ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, 'না। দোকান আমি অনেকক্ষণ বন্ধ করেছি, এখন আমি বাড়ি যাব।'

বলে হরলাল ঠোঁট কুঁচকে, ওপরের দাঁত দিয়ে, নিচের নকল দাঁত চেপে দেবার চেষ্টা করলেন।

গঙ্গারাম কবজিতে ঘড়ি দেখে বললেন, 'রাত্রির তো মাত্তর সাড়ে ন'টা হলো, এর মধ্যে বাড়ি যাবে কোথায়? দেখি, সর ঢুকি।'

উনি ছড়ি দিয়ে চৌকাঠে ভর দিলেন। হরলাল একইভাবে বললেন, 'না, রোজ রোজ এত রাত আমার পোষাবে না। এত রাত্রে, ধিনি কাত্তিকটি সেজে, উনি যেন এখন ইয়ের বাড়িতে এলেন, ন্যাকামো!'

গঙ্গারাম ইতিমধ্যে চৌকাঠে উঠেছেন। কাউণ্টারের টেবিলের পাশ দিয়ে ঢোকবার জন্য ঠেলাঠেলি করছেন। ফাঁক এত অল্প, ওঁর পক্ষে গলে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। বললেন, 'টেবিলটা একটু টানো না, দেখছ তো ঢুকতে পারছি না।'

হরলাল টেবিলটা ঠেলে দিতে দিতে বললেন, 'পারতে বলেছে কে তোমাকে? তার চেয়ে, তোমাদের সেই কেলাব টেলাবে কী সব আছে, সেখানে গেলেই পার।'

গঙ্গারাম ভিতরে ঢুকে তখন হাঁফ ছাড়লেন। টুলের ওপর বসতে বসতে বললেন, 'ক্লাবের কথা বলছ তো? কেলাব আবার কিসের?'

'থাক, তুমি আর এখন আমায় শিক্ষে দিতে এস না।'

হরলাল ধমকে উঠলেন, আরো রেগে গেলেন। মুখটা বিকৃত করে বললেন, 'যারা চাঁছাছোলা কথা বলতে পারে, তাদের কাছে গেলেই পার। আমাদের মতো গরীব মুক্‌খুদের কাছে আসার জন্য কেউ মাথার দিব্যি দেয় নি।'

গঙ্গারাম প্রায় গোটা ঘরটা জুড়ে বসেছেন। পাখার দিকে ঘাড়টা হেলিয়ে বললেন, 'আহা, তাই বলেছি নাকি! তোমার আবার—।'

'না, না, তোমাকে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আজই শেষ। রোজ রোজ কারোর মুখ চেয়ে, দরজা আগলে থাকতে পারব না। তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন বসব না।'

হরলাল দড়াম করে দরজাটা টেনে, ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। টেবিলের তলা থেকে একটি বেতের মোড়া বের করে তাতে বসলেন। দুজনের হাঁটুতে হাঁটু ঠেকে যাচ্ছে। হরলাল মুখ ফিরিয়ে রইলেন অন্যদিকে। গঙ্গারাম তখন তাঁর পাঞ্জাবি খুলতে ব্যস্ত। ভিতরে গেঞ্জি নেই। ঘর্মাক্ত থলথলে ফরসা শরীরটা যেন জুড়লো। পাঞ্জাবিটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'যেন বাঘের গুহা। বড্ড গরম।'

চুনোট করা কোঁচা দিয়ে গা মুছতে লাগলেন। হরলাল নড়বড়ে দাঁত বের করে, বিকৃত মুখে গঙ্গারামের দিকে তাকালেন। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'বাঘের গুহা না হলেও তো চলে না।'

গঙ্গারাম হেসে এক চোখ টিপলেন, বললেন, 'সেই সঙ্গে বাঘটিকেও।'

হরলাল চোয়াল শক্ত করে, আওয়াজ করলেন, 'ন্যাকামি। বুড়ো হয়ে মরতে চলল, এখনো ইয়ে গেল না।'

গঙ্গারাম টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগ নিয়ে খুলতে খুলতে বললেন, 'আর হরো গোঁসাই বুড়ো হয়ে বাঁচতে চলেছে, গঙ্গারামের সঙ্গে ওইখেনেই তফাত।'

বলে ব্যাগের ভিতর থেকে একটি বোতল বের করলেন। চকচকে কালো বোতল, গায়ে কুকুরের ছবিওয়ালা লেবেল আঁটা। ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট, স্কচ হুইস্কির বোতল। দস্তার মোড়ক ছিঁড়ে ছিপি খুলে গন্ধ শুঁকলেন। ভুরু কাঁপিয়ে বললেন, 'বেশ সুপক্ক বস্তু।'

হরলাল অত্যন্ত বিরক্তিতে অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন। কোনো কথা বললেন না। গঙ্গারাম বললেন, 'আজ তুমি এটা টেস্ট কর।'

হরলাল বললেন, 'হরো গোঁসাই কোনোদিন বিলিতি চোনা খায় না। যে এনেছে, সেই খাক।'

গঙ্গারাম ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'উটি হবে না বাবা, এ হল দিশি চোনার শরীর।'

'তবে ন্যাকামো করে রোজ রোজ একটা বোতল আনবার দরকার কী?'

'জিনিসটা তো খারাপ না। এত নাম দাম, কোনোদিন যদি তোমার ইচ্ছে টিচ্ছে হয়—।'

কথার মাঝেই হরলাল লোহার মালপত্রের ফাঁক থেকে একটি মদের বোতল টেনে বের করলেন। এই মুহূর্তে তাঁকে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন দেখাল। 'বেঁচে থাক আমার কালীমার্কা এক নম্বর। এর তুল্য জিনিস হয়?'

গঙ্গারাম হুইস্কির বোতল সরিয়ে রেখে বললেন, 'সত্যি। কী স্বাদে যে লোকে বিলিতি মদ খায়!'

হরলাল ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আলমারির তলায় হাত গলিয়ে দুটো পরিষ্কার কাঁচের গেলাস বের করলেন। বোতলের গালা ভেঙে ছিপি খুললেন। গঙ্গারাম ততক্ষণে ব্যাগ থেকে একটি প্যাকেট টেনে বের করেছেন। প্যাকেট থেকে মাংসের গন্ধ বেরোচ্ছে। বললেন, 'এখনো বেশ গরম আছে। তোমার বন্ধুপত্নী নিজেই প্যাকেট করে দিল, মুরগীর শুকনো দোপেঁয়াজি।'

হরলাল টান দিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুললো। বললো, 'গিন্নীকে বলো,

কর্তাকে কোলে বসিয়ে যেন ওসব খাওয়ায়, কর্তার বেশ পেঁয়াজি হবে। ওসব দিয়ে মুখের রস কাটানো যায় না।'

বলে, ড্রয়ার থেকে একটি বের করলেন বড় পাটনাই পেঁয়াজ, বেশ খানিকটা আদা, একটি পাতিলেবু, আর একটা ধারালো ছুরি।

গঙ্গারাম নাক ফুলিয়ে বললেন, 'বিলিতি মদ খেতে শেখোনি, সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এটার মানে কী?'

'মানে আবার কী। আমি বুঝি, যার সঙ্গে যা।'

বলে, ঝোল টানার শব্দ করে, হরলাল ছুরি দিয়ে কচকচ করে আদা পেঁয়াজ কুচোতে লাগলেন।

গঙ্গারাম বললেন, 'তুমি আর চিকেন দোপেঁয়াজির কী বুঝবে। রাস্তার ধারে শুঁড়িখানায় বসে খাওয়া শিখেছ, ওসবই তোমার সইবে।'

হরলাল ছুরি সুদ্ধু হাতটা তুলে, খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আর তুমি সগগে বসে অপ্সরার নাচ দেখতে দেখতে খেতে শিখেছ। তবু যদি না সব জানতাম।'

গঙ্গারাম বললেন, 'আমার কথা ছাড়, আমি কোনোদিনই এসব চিকেন মটন খেয়ে মদ খেতে পারি না। গরম চানা চটপটিতে দু ফোঁটা লেবুর রস থাকবে, এক চিমটি করে মুখে দেব, এক ঢোক মদ খাব। তোমার তো তা না। শুঁটকো শরীর, এদিকে গিলতে তো পার খুব।'

হরলাল ভীষণ রেগে উঠলেন, 'সে যখন গিলি তখন গিলি, মদের সঙ্গে বড়লোকি ঠাট আমার ভাল লাগে না।'

গঙ্গারাম বললেন, 'ডাঁটা চচ্চড়ির লোক যে।'

হরলাল আদা পেঁয়াজ কুচনো থামিয়ে, প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'ছাখ, খাবার খোঁটা দিও না। যা খাই, তা নিজের রোজগারে খাই, কোনো ফ্যাকটরি-ওয়ালার পয়সায় খাই না।'

গঙ্গারাম বললেন, 'যাকগে বাবা, চেঁচিও না। আমি একটু গলা খুলে গান ধরলে তোমার আশেপাশে সবাই শুনতে পায়, নিজে চেঁচালে কিছু না।'

হরলাল তখন দাঁতে দাঁত পিষে, আদা কুচোতে কুচোতে আপন মনে বলছেন, 'কী রকম ঝামেলা বল দিকিনি। আমার যদি ভাল না লাগে, তাতে তোমার কী। সবতাতে বড়লোকি। বড়লোক আছ, নিজের জায়গায় গিয়ে দেখাও, হরো গোঁসাইয়ের কাছে কেন।'

গঙ্গারাম তখন দেশী বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢেলেছেন। বললেন,

'যাক বাবা, থাম। সারাদিন খাটাখাটনির পর, একটা মজুরও শান্তিতে থাকতে চায়।'

'থাক, তুমি আর মজুরের নাম করো না। মজুরদের রক্ত শুষেই তো তোমার যত ওস্তাদি।'

গঙ্গারামের মুখের কথাও টোল খেল না। ঢক করে পাত্র উপুড় করে গলায় ঢাললেন। বললেন, 'তোমার যেমন খদ্দেরের পকেট কেটে। চানা চটপটি কোথায় ?'

হরলাল ড্রয়ার টেনে চানা চটপটির ঠোঙা বের করে দিলেন। লেবু কেটে কুচনো আদা পেঁয়াজের রস দিয়ে, ছুরি দিয়ে ঘেঁটে দিলেন। গঙ্গারাম হরলালকে গেলাসে মদ ঢেলে দিয়ে, আদা পেঁয়াজের কুচো মুখে দিলেন। জিভ দিয়ে টকাস করে শব্দ করলেন, 'মাইরি হরো, এ জিনিসে তোমার জুড়ি নেই। হাতটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবার মতো।'

হরলাল সে কথায় কান না দিয়ে মদ্যপানে মন দিলেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পানীয়ের বোতল, সুস্বাদু গরম শুষ্ক কুক্কুটের মাংস একপাশে পড়ে রইল। চারদিকে ঠাসা মালপত্র, এই ঘুপচি ঘরের মধ্যে ছোট পাখার হাওয়া ইতিমধ্যেই গরম হয়ে উঠেছে। ভেন্টিলেশন বলতে একমাত্র দরজার তক্তার ফাটল। কিন্তু গঙ্গারাম আর হরলাল বেশ বহাল তবিয়তেই, দেশীয় মদ এবং আদা পেঁয়াজ কুচোর সঙ্গে চানা চটপটি চিবিয়ে চলেছেন। খানিকক্ষণ কোনো কথা না বলে, পর পর দুটি পাত্র দুজনে শেষ করলেন। গঙ্গারাম অবিশ্যি কুলকুল করে ঘামছেন। ব্যাগের মধ্যে হাতড়ে তিনি বর্মী চুরুট আর সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্‌টা খাবে ?'

হরলাল বিড়ি বের করে বললেন 'কোনোটাই না।'

কানের কাছে বিড়ি টিপে টিপে, তামাকের করকর শব্দ শুনলেন। আবার বললেন, 'ওতে আমার জমে না।'

গঙ্গারাম মুখের মধ্যে জিভটা নাড়াচাড়া করে বললেন, 'দাঁতগুলো কিছুতেই সেট হচ্ছে না। তোমারগুলো ঠিক আছে ?'

হরলাল মুখ বিকৃত করে বললেন, 'কোথায় ? এই ছাখো না।'

বলে নিচের দাঁত জিভ দিয়ে ঠেলে, নাড়িয়ে নাড়িয়ে দেখালেন। গঙ্গারাম দেখে, ঘাড় নাড়লেন। আবার মদের পাত্র ভরলেন। তারপরে বললেন, 'সংসারটা বুঝলে, বড় অশান্তির জায়গা। এক তো ছেলেদের কারোর সঙ্গে মতে

মেলে না। তার ওপরে আজ এই নাতিটার অসুখ, ওই মেয়েটার ব্যামো। কোথাও যে যাব, তারও উপায় নেই।'

হরলাল বললেন, 'ওসব কাকে বলছ। আমাকে এই বুড়ো বয়সেও দোকানে বসতে হচ্ছে। বাবুরা সব চাকরি করবেন, দোকানে বসবেন না। শুয়োর ব্যাটারা ব্যবসা বুঝল না কোনোদিন। আর অসুখ বিসুখ? তা যদি বল—।'

গঙ্গারাম হাত জোড় করে বললেন, 'বাবা, তুমি অমন ফলাও করে শুরু করো না। মাল খাওয়াটি একেবারে বরবাদ করে ছাড়বে।'

হরলাল রাগে গরগর করে উঠলেন, 'তার মানে?'

গঙ্গারাম মুখের কাছে গেলাস তুলে বললেন. 'অসুখের ফিরিস্তি শুনতে ভাল লাগে না।'

হরলাল খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'নিজের বেলা আঁটিশুঁটি, পরের বেলা দাঁত-কপাটি? নিজে যে সাত কাহন ফিরিস্তি দিচ্ছিলে?'

'ফিরিস্তি তো দিই নি। তুমি যেরকম কোমর বেঁধে শুরু করতে যাচ্ছিলে—।'

'থাক, আর ন্যাকামো করতে হবে না। বুড়ো হয়ে মরতে চলল, এখনো ইয়ে গেল না।'

গঙ্গারাম সে কথার জবাব না দিয়ে, গেলাসে চুমুক দিলেন। হরলাল যেন রাগ বশতঃ হাঁ করে গেলাসের সবটুকু গলায় ঢেলে দিলেন। তারপরে গোঁজ হয়ে বসে রইলেন।

গঙ্গারাম গুনগুন করে একটু টপ্পার সুর ভাঁজলেন। হরলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হল, রাগ করলে?'

হরলাল কোনো জবাব দিলেন না। গঙ্গারাম ঝুঁকে পড়ে, হরলালের পেটে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিলেন। হরলাল তড়াক করে সোজা হয়ে বসে, গঙ্গারামের হাত চেপে ধরলেন, 'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

গঙ্গারাম সে কথা না শুনে, পেটে খোঁচাবার জন্য হাত টানাটানি করতে লাগলেন। হরলালও ছাড়বেন না। গঙ্গারাম বললেন, 'তোমার প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে থাকা দেখাচ্ছি।'

'তবে রে গঙ্গা ঘোষ।' বলেই হরলাল তাঁর কালো রোগা রোগা আঙুল দিয়ে, গঙ্গারামের ভুঁড়িতে খোঁচা দিলেন। দশাসই গঙ্গারাম সারা শরীর কাঁপিয়ে খ্যালখ্যাল করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'হরো, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি, কাতুকুতু লাগছে।'

গঙ্গারামের হাসি দেখে, হরলালের মুখেও একটু হাসি ফুটল। বললেন, 'আর আমার বুঝি লাগে না?'

হাসতে হাসতে হাত টানাটানি করে দুজনেই হাঁপিয়ে পড়লেন। একটু চুপচাপ থেকে, হরলাল আবার দুই গেলাস মদ ঢাললেন।

গঙ্গারাম জিজ্ঞেস করলেন, 'হরো, সেই ফুলকির কথা মনে আছে? রামনগিনের বউ হে, মাথাভাঙার সেই ঘাটমাঝির বউ, যে-মাঝির ঘরে প্রায়ই আমরা মালপত্তর রাখতাম?'

হরলালের ভাঙাচোরা রেখাবহুল মুখে পুরনো দিনের স্মৃতির অন্যমনস্কতা ফুটল। ইতিমধ্যেই তাঁর চোখ কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ হয়েছে। চোখে একটি স্বপ্নিল ছবি যেন ভেসে উঠল। আবেগ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'মনে নেই আবার। দুজনে তখন কাঁধে মাল বয়ে বয়ে কত জায়গায় সাপ্লাই দিতে গেছি। নবদ্বীপ, কুষ্টিয়া, মাজদিয়া, ওদিকে বর্ধমান, হাওড়া। কিন্তু তুমি আজ কোথায়, আর আমি কোথায়।'

গঙ্গারাম আদা পেঁয়াজের কুচো চিবোচ্ছিলেন। বললেন, 'সেজন্য তোমাকে বামনগিনের বউয়ের কথা বলিনি।'

হরলাল গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'সেটা বুঝেছি। ফুলকির সঙ্গে, আমাদের সেই যাকে বলে, ভাব ভালবাসার কথা বলছ তো? শুধু কি তা-ই। যেমন স্বাস্থ্যখানি, ঢলঢলে টলটলে, তেমনি ছিল হাসিটি। একবার তাকালেই মনে রঙ ধরে যেত। মেয়েছেলেটি আমাদের যেন কী চোখে দেখেছিল, তাই না?'

গঙ্গারাম গেলাসে চুমুক দিলেন, চানা চটপটি মুখে দিয়ে, একটু চিবিয়ে নিলেন। বললেন, 'তুমি তখন থেকে, "আমাদের আমাদের" করে বলছ কেন বুঝতে পারছি না। তোমার সঙ্গে আবার তার ভাব ভালবাসা হল কবে?'

হরলাল গেলাসে চুমুক দিতে উদ্যত হয়ে থামলেন। কোঁচকানো মুখে, নিচের দাঁত একবার জিভ দিয়ে ঠেলে, জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মানে?'

গঙ্গারাম বললেন, 'তোমার অই খেঁকুরে চেহারার দিকে তাকিয়ে ফুলকি কোনোদিন ভাবের হাসি হেসেছে বলে তো মনে পড়ছে না।'

হরলাল রাগে রি রি করে উঠলেন, গেলাসে আর চুমুক দেওয়া হল না। তর্জনী দিয়ে গঙ্গারামের আপাদমস্তক দেখিয়ে ভ্যাংচানো সুরে বললেন, 'অ,

ফুলকির যত ভাবের হাসি ঝরত বুঝি এই—ঢ্যাপসা ভোঁদকা গঙ্গা ঘোষকে দেখেই ?'

গঙ্গারাম একটু অসহায়ভাবে নিজের খালি গা শরীরটার দিকে তাকালেন। বললেন, 'কিন্তু সেই অল্প বয়সে আমি এরকম মোটা ছিলাম না।'

'আর অই বয়সে আমি বুঝি খেঁকুরে ছিলাম? শক্ত ছিপছিপে শরীরকে বুঝি তাই বলে ?'

'ছিপছিপে শক্ত! আজকাল যাকে স্লিম বলে? বাব্বা, হরো তুমি নিজের প্রশংসাও করতে পার বাপু। তা সে কথা যাক গে, তোমার পকেটে সে কোনোদিন ছুটে এসে লিট্‌ঠি গুঁজে দিয়েছে? চামচের বাঁট দিয়ে, চা ঘুঁটতে ঘুঁটতে, রসের গানের কলি শুনিয়েছে? হরিণীর মতো তাকিয়ে কোনোদিন জিজ্ঞেস করেছে, ফির কব আওয়েগে বাবুজী ?'

হরলাল ইতিমধ্যে গেলাসে চুমুক দিয়েছিলেন। বললেন, 'কী করেছে আর কী বলেছে, তা তুমি জানবে কী করে। আমাকে যখন একলা পেয়েছে, তখন ওরকম অনেক কিছুই হয়েছে। তোমাকে কোনোদিন ভুট্টা পুড়িয়ে, নুন কাঁচালঙ্কা দিয়ে খাইয়েছে ?'

'বহুবার। তোমাকে আমাকে দুজনকে একসঙ্গেই খাইয়েছে।'

'আমাকে একলাও খাইয়েছে। অনেক কিছুই খাইয়েছে।'

গঙ্গারাম একবার আরক্ত চক্ষু বড় বড় করলেন, তারপর এক চোখ বুজে বললেন, 'সে সব অনেক-কিছু জিনিসের নাম কী হরো ?'

হরলাল সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে গঙ্গারামের দিকে তাকালেন। পরমুহূর্তে প্রশ্নের গূঢ় অর্থ বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, 'বজ্জাতি করো না গঙ্গা, ওসব খারাপ কথা আমি মোটেই বলি নি। অনেক কিছু মানে, আচার পুরি ছোলাভাজা, এইসব। তোমাকে আর কী খাইয়েছে সে কথা তুমিই বলতে পার।'

বলে, হরলাল ত্যারছা চোখে তাকালেন। গঙ্গারাম জিভ কেটে বললেন, 'না না, ফুলকির নামে আমি মিছে কথা বলতে পারব না। সে রকম মেয়ে ছিল না। আমাকে যে তার খুব ভাল লাগত, সেটা বুঝতে পারতাম।'

'সেটা আমার বেলা, আমিও পারতাম। কিন্তু নিজের মনের কথাটা বল গঙ্গা ঘোষ।'

গঙ্গারাম একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'সে কথা বলে আর কী লাভ। বে থা'র পরেও ফুলকিকে স্বপ্ন দেখেছি।'

হরলালের গলাটা এবার কোলা ব্যাং-এর মতো শোনাল, 'আমি তো এই বুড়ো বয়সেও তাকে ভুলতে পারলাম না। মেয়েছেলেটির মনটা বড় ভাল ছিল।'

গঙ্গারাম বললেন, 'মাঝি রামনগিনকে সে কোনোদিন ঠকায়নি, কিন্তু তার মনে একটা খেদ ছিল।'

দুজনেই খানিকক্ষণ কথা বললেন না। বোতলের শেষাংশ দুই গেলাসে ঢেলে, আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগলেন। চুরুট আর বিড়ির ধোঁয়ায় এবং গন্ধে, খুপরি ঘরটা আবর্তিত হচ্ছে। চানা চটপটি আর আদা পেঁয়াজের কুচো শেষ। এখন দুজনে কেবল আঙুল বুলিয়ে চুষছেন। তারপরে হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় আবার ব্যাগ খুললেন গঙ্গারাম। এখন হাতের অবস্থা কিঞ্চিৎ অসাব্যস্ত। ব্যাগের ভিতর থেকে একটি নতুন দেশী মদের বোতল বের করে হরলালের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'আজকে তুমি খাওয়ালে, ধর কালকের বরাদ্দ।'

হরলাল বোতলটি নিয়ে এক জায়গায় ঢুকিয়ে দিলেন। গঙ্গারাম বললেন, 'তাহলে এই হুইস্কি আর দোপেঁয়াজির কী হবে।'

হরলাল বললেন, 'যেখানকার জিনিস, সেখানে নিয়ে যাও। রোজ রোজ ধ্যালাং করতে নিয়ে আসাই বা কেন, বুঝি না!'

গঙ্গারাম বোতল আর প্যাকেট ব্যাগের মধ্যে পুরলেন। জামাটা কাঁধে নিয়ে, গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে, ছড়িটা তুলে নিলেন। বললেন, 'উঃ, একেবারে ইঁদুরের গর্ত। কোথায় একটু ছড়িয়ে বসে আরাম করে খাব, তা না—।'

হরলাল বলে উঠলেন, 'অই দশাসই চেহারা নিয়ে, কুড়ি বছর ধরে তো এই ইঁদুরের গর্তেই কাটালে। অন্য কোথাও যাবার নাম তো শুনি না। ইঁদুরের গর্ত! বলতে লজ্জা করে না?'

বলে তিনি গেলাস বোতল সব সরিয়ে ফেললেন। গঙ্গারাম গুনগুন করে উঠলেন, 'কী কারণে কারণবারি করি পান ···।'

হরলাল ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর, আশেপাশের লোক শুনতে পাবে।'

'আমার থেকে তো তোমার গলার জোর বেশী, সেটা বুঝি কেউ শোনে না? আসলে আমি একটু গাইতে পারি বলে তোমার হিংসে হয়।'

'আহা, একেবারে কে মল্লিক আর কানাকেষ্টর মতন গলা।'

হরলাল দরজা খুলে দিলেন। ঘরে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল। গঙ্গারাম ছড়ি আর ব্যাগ নিয়ে বেরোলেন। কাঁধের ওপর পাঞ্জাবি। হরলাল তালা-চাবি নিয়ে পেছনে। দরজা ঠেলে, গোটা ছয়েক ভারি ভারি তালা তিনটে কড়ায় আটলেন। তারপর দুজনেই হাঁটতে লাগলেন। রাস্তা বেশ ফাঁকা। রাত প্রায় এগারোটা।

হরলাল হঠাৎ থামলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আবার এদিকে চললে ?'

গঙ্গারাম বললেন, 'চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'না না, রোজ রোজ এসব ভাল লাগে না। তোমাকে দেখলে আমার বউ আরো চটে যায়।'

'বউয়েরা সব ওরকমই। কিন্তু তোমার বউ আমাকে দেখতে পাবে না, সে থাকবে ঘরে।'

'ঘরে ? ঠিক কোথাও অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে দেখলে সে বেশি চটে যায়।'

'সেটা আমি বড়লোক বলে। আমার বউও তোমাকে দেখলে চটে যায়।'

'তা আর জানি না। তোমার বউ যে ভাবে, আমি গঙ্গা ঘোষের পকেট মারছি। তেলে জলে কোনোদিন মিশ খায় না বুঝলে।'

হরলাল একবার গঙ্গারামের মুখ দেখবার চেষ্টা করলেন। মফঃস্বল শহরের ভিতরের রাস্তা দিয়ে, দুজনে হেঁটে চলেছেন। টিমটিমে বিজলি আলোয় তাঁদের ছায়া দুটো অতিকায় দেখাচ্ছে। মলপোঁতা পাড়ার কাছে এসে, গঙ্গারাম থমকে দাঁড়ালেন। পাড়াটা একেবারে নিস্তব্ধ বলা যায় না। তবে বিখ্যাত ঘোষালদের রক্ষিতারা এ পাড়াতেই বেশি ছিল। ঘোষালদের সেদিন আর নেই, রক্ষিতারা অনেকটা অর্ধগৃহস্থ জীবন নিয়ে এ পাড়াতেই মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসে আছে। এখন আশেপাশে অনেকে বাড়ি করছে।

হরলাল বলল, 'দাঁড়ালে কেন ?'

গঙ্গারাম চুপিচুপি বললেন, 'আস্তে। ওই টালির ঘরটা হরু ঘোষালের রাঁড়ের না ?'

হরলাল বললেন, 'হ্যাঁ। সে বুড়ির কাছে এখন যাবে নাকি ?'

'আরে না না। সেই মজাটা একটু করলে হয় না ? বহুদিন তো করা হয়নি।'

হরলাল বললেন, 'না বাবা, আমি ওসবের মধ্যে নেই। আর কি সে বয়স আছে?'

গঙ্গারাম তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, 'দাঁড়াও না। রাত হয়েছে, জায়গাটাও ফাঁকা। অনেকদিন অমন চণ্ডীপাঠ শোনা হয়নি।'

বলে, তিনি নিচু হয়ে, আশপাশ থেকে কয়েকটা ঢিল তুলে নিলেন। দুজনেই আরো কিছুটা এগোলেন, একটা গাম্বিল গাছের কোল আধারে দাঁড়ালেন। গঙ্গারাম দুটো ঢিল হরলালকে দিয়ে বললেন, 'নাও, তুমি দুটো নাও, এবার মার।'

বলে তিনিই প্রথমে টালির ঘরের জানালা লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়লেন। হরলাল ছুঁড়লেন টালির চালে। কয়েক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই, জানালা খুলে গেল। কাঁসাভাঙা গলায় চিৎকার শোনা গেল, 'কোন্ গুয়োর ব্যাটারে, অ্যাঁ, রাতদুপুরে মরণ নেই, ঢিল মেরে বুড়ি মাগীটাকে ডাকছিস? অরে মা-মেগো বোন-মেগোরা, ওরে বাপ ভাতারি, ভাই-ভাতারি ব্যাটারা···।'

ক্রমেই চিৎকার এবং ভাষা অতি উগ্র আর অশ্রাব্য হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু হরলাল আর গঙ্গারাম তখন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পেটে হাত চেপে হাসি সামলাচ্ছেন। সামলাতে সামলাতেই গঙ্গারাম অন্ধকার থেকে আবার একটা ঢিল ছুঁড়লেন টালির চালে। এবার বুড়ির গলার সঙ্গে, যুবির গলা মিলল এবং গালাগালির ভাষা আরো ভয়াবহ। সম্ভবত বুড়ির মেয়ে বা নাতনী, যারা পেশায় একই। এদিকে গঙ্গারাম আর হরলাল, সেই গালাগালির ভাষা শুনতে শুনতে পেটে হাত দিয়েও আর হাসি সামলাতে পারছেন না। দুজনেই তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। খানিক দূর গিয়ে, গলা খুললেন।

হরলাল বললেন, 'তোমার ফিচলেমি কোনোদিন গেল না।'

গঙ্গারাম বললেন, 'কিন্তু কতদিন বাদে এমন মধুর কথা শোনা গেল। একটু যেন হালকা হওয়া গেল।'

প্রায় হাসতে হাসতেই, দুজনে হরলালের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছুলেন। গলির মধ্যে, সেকালের দোতলা বাড়ি। গজাল পোঁতা দেউড়ি ভিতর থেকে বন্ধ। অন্ধকার চুপচাপ। হরলাল ঠোঁটে আঙুল চেপে, গঙ্গারামকে কোনোরকম শব্দ করতে বারণ করলেন। দেউড়ির কাছে কান দিয়ে কিছু শোনবার চেষ্টা করলেন। তারপরে বললেন, 'চল?'

'কোথায়?'

'তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না। রোজ রোজ তোমার ওই এক বাতিক, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। আজ আমিই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। চলি।'

গঙ্গারাম হাঁটা ধরলেন। হরলাল পিছন ছাড়লেন না। গঙ্গারাম বললেন, 'কী হল, আবার আসছ কেন?'

হরলালের এক কথা, 'তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'না।'

'হ্যাঁ।'

'বলছি না।'

গঙ্গারামের ধমক শুনেও, হরলাল নিরস্ত হলেন না। হাঁটতে লাগলেন। গঙ্গারাম খেঁকিয়ে উঠলেন, 'যত মাতালের গোঁ।'

হরলাল বললেন, 'তোমার দাঁতালের জেদ।'

গঙ্গারাম সে কথার জবাব না দিয়ে, হঠাৎ গুনগুনিয়ে উঠলেন, 'কে বিদেশী, মন-বিলাসী—।'

হরলাল ধমকে উঠলেন, 'চুপ চুপ, মনে রেখ পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ।'

'যাচ্ছি তো কী হয়েছে, গান গাইতেও মানা?'

'রাত অনেক।'

'হোগগে, আমি এখন গাইব।'

'তুমি না গঙ্গা ঘোষ, যাট বছরের বুড়ো। রাত দুপুরে পাড়ার ভেতর গান গাইতে গাইতে যাবে?'

কথাটা বোধহয় গঙ্গারামের মনে ধরল, কিন্তু বিরক্তও হলেন। হরলালের কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন, 'একটু যে প্রাণ খুলে আমোদ করব, তার উপায় নেই। হয় কারখানার ঝকমারি, নয় ইনকাম ট্যাকসের খবরদারি, তার ওপরে সংসার তো আছেই।'

হরলাল বললেন, 'কেন মলপোঁতা পাড়ার মেয়েমানুষের অমন চণ্ডীপাঠ শুনেও হল না?'

গঙ্গারাম খ্যালখ্যাল করে হেসে উঠলেন। হরলালও। গঙ্গারাম বললেন, 'যা বলেছ। রাত্রে শুয়ে যতবার মনে পড়বে, ততবার হাসতে হবে।'

দুজনেই হাসতে হাসতে, গঙ্গারামের প্রাসাদোপম অট্টালিকার কাছাকাছি হলেন। গঙ্গারাম হরলালের হাত চেপে ধরলেন। চুপিচুপি বললেন, 'গেট

দিয়ে ঢুকব না। দারোয়ানটা রোজ রোজ কী মনে করে। বাড়ির লোকেরাও জেগে যায়। আজ পাঁচিল টপকে ঢুকব।'

'পাঁচিল টপকে?'

'হ্যাঁ। খুব উঁচু তো না। যে দিকটায় শোবার ঘর, সেদিক দিয়ে টপকাব।'

'ওরে বাবা, আমি ওর মধ্যে নেই ভাই গঙ্গা।'

গঙ্গারাম তাঁর হাত ছাড়লেন না। বললেন, 'আহা, আমি পাঁচিলে উঠলে ব্যাগটা আর ছড়িটা তুমি আমার হাতে তুলে দিয়ে চলে যেও।'

হরলাল চেষ্টা করেও হাত ছাড়াতে পারলেন না। গঙ্গারাম তাঁকে পাঁচিলের কোল আঁধার জায়গায় টেনে নিয়ে গেলেন। হরলাল বললেন, 'কী রকম বিপদ বলদিকিনি। দাঁতালমার সঙ্গে না এলেই হত আজ।'

গঙ্গারাম তখন পাঁচিলের উচ্চতা মাপছিলেন। বললেন, 'ভাই হরো, তুমি উপুড় হয়ে বসো, আমি তোমার পিঠে পা দিয়ে—।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই হরলাল এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে খানিকটা ছিটকে গেলেন। অবাক ভয়ে বলে উঠলেন, 'ওই লাশ আমার পিঠে? কথাটা বলতে পারলে? তার চেয়ে রেল লাইনে মাথা দিয়ে মরাও সোজা।'

গঙ্গারাম চুপি স্বরে ডাকলেন, 'আরে শোন না।'

'না না না, খুন করতে চাও তুমি আমাকে?'

অগত্যা গঙ্গারাম বললেন, 'তবে ঠিক আছে, নাও ব্যাগ আর ছড়িটা ধর, আমি উঠি।'

হরলাল ভয়ে এবং অনিচ্ছায় এগিয়ে এসে ব্যাগ আর ছড়ি ধরলেন। গঙ্গারাম দু'হাত তুলে পাঁচিল চেপে ধরলেন। ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে, শরীরের কোথাও একটু নড়াতে পারলেন না। বললেন, 'হরো, একটু ঠ্যালা দাও তো।'

ঠিক এই মুহূর্তেই পাঁচিলের কাছে, দোতলা ব্যালকনিতে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। বারান্দায় একজন যুবককে দেখা গেল। সে খুব শান্ত স্বরেই বলল, 'বাবা, তুমি গেট দিয়ে ঢুকে এস। এখান দিয়ে আসা সম্ভব নয়।'

দুই বন্ধুতেই এত হকচকিয়ে গিয়েছিলেন যে, হরলাল পাঁচিলের অন্ধকারে ঝুপ করে বসে পড়লেন, আর গঙ্গারাম ভ্যাবাচাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

'আমি শিবু।'

'অ।' গঙ্গারাম গলা খাঁকারি দিলেন, 'হ্যাঁ অ, আচ্ছা, তাই যাচ্ছি।'

শিবু আবার বলল, 'আর হরো কাকাকে এবার বাড়ি যেতে বল। অনেক রাত হয়েছে।'

হরলাল অন্ধকারেই জিভ কাটে, চোখ বুজে ফেললেন। গঙ্গারাম বলে উঠলেন, 'এই হরোর জন্যই তো এসব। দাও, ব্যাগ আর ছড়ি দাও।'

হরলাল প্রথমে বজ্রাহত পরে ক্রুদ্ধ। কিন্তু মাথা তুলে আলোর সামনে উঠতে পারছেন না। শিবু দেখে ফেলবে। চুপি চুপি চিবিয়ে বললেন, 'নচ্ছার বজ্জাত বুড়ো, মাতাল মিথ্যুক···।'

সেসব না শুনে গঙ্গারাম ব্যাগ ছড়ি নিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। হরলাল জ্বলন্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে, মনে মনে গালাগাল দিয়ে, নিচু হয়েই পাঁচিলের সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। বাড়ি ফেরার সারাটা পথই মাথায় যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল। এ সময়ে কেউ তাঁর মুখ দেখলে, ভয়ে আঁতকে উঠত। উত্তেজনায় নিচের নকল দাঁতগুলো ঠেলে বাইরে বের করে নিয়ে এসেছেন। আরক্ত চোখ দপদপ করছে। রেখাবহুল কোঁচকানো মুখটা যেন ফুলে উঠেছে।

কিন্তু বাড়ি যত কাছে এল, মুখের ভাবের পরিবর্তন হতে লাগল। একেবারে দেউড়ির সামনে এসে, প্রায় স্বাভাবিক। এমন কি একটা চেষ্টাকৃত অমায়িকতা আনবার চেষ্টা করলেন। খুব আস্তে কড়া নাড়লেন, প্রায় চুপিস্বরে বড় নাতির নাম ধরে ডাকলেন, 'ন্যালা, ভাই নেলু, ওরে নেলু!'

নেলু দেউড়ির পাশে বাইরের ঘরে শোয়। ভিতরে শব্দ হল ঘটাং, দরজা খুলল, আলো জ্বলল ক্লিক করে। সুমুখে দশাসই হরলাল গিন্নি। এখনো চোখে বাঘিনীর দপদপানি, নাকছাবিতে ঝলকানি। পানদোক্তা খাওয়া ঠোঁট ব্যাদান করে, ভেংচি কেটে বললেন, 'রাত দুপুরে মাতলামি, ভাই নেলু, ভাই নেলু! কেন, নেলুকে নিয়ে এখন মদ টানতে যেতে হবে নাকি।'

হরলাল অসহায়ভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলবেন, 'ছি ছি, কী যে বল, একটু আস্তে, সবাই শুনতে পাবে।'

জবাব হল আরো উচ্চগ্রাম ও বিকৃতস্বরে, 'যেন জানতে কারোর বাকী আছে। বুড়ো হয়ে মরতে চলল, এখনো খোকামী গেল না। সেটা কই—সেই গঙ্গা ঘোষটা, তাকে আমি—।'

'ও তো বাড়ি চলে গেছে।'

'কেন, আবার তোমাকে পৌঁছুতে আসে নি ? তুমি তো গেছলে।'

হরলাল এবার থমকে গেলেন। স্ত্রী বললেন, 'মনে কর কিছু দেখি নি। অন্ধকার ছাদের আলসেয় দাঁড়িয়ে সব দেখছি। তখনই চেঁচিয়ে ডাকি নি, গোঁসাই বংশের ভাগ্য।'

হরলাল বলে উঠলেন, 'তা ঠিক।'

'চুপ! চুপ করে থাকবে, মুখ নাড়বে না, বুড়ো মিনসে—।'

হরলাল যত হাত তুলে স্ত্রীকে চুপ করাতে চাইলেন, তিনি ততোধিক চিৎকার করে বলতে বলতে উঠোন পেরিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে গেলেন। হরলাল অসহায়ের মতো শুনলেন, ছেলেদের কার কার ঘরে যেন কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ জানতে আর কারোরই বাকী নেই, যে-ভয়টা তিনি পাচ্ছিলেন। তিনি দেউড়ি বন্ধ করে অতিমাত্রায় লজ্জিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে, আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতর দিকে চললেন। এ সময়ে চকিতে একবার গঙ্গারামের মুখটা মনে পড়তে আর একবার তাঁর মনে আগুন জ্বলে উঠল। মনে মনে বললেন, 'অই মাতালটার জন্যই এইরকম হল। নিজের ছেলেটার কাছে মিথ্যে বদনাম দিল। আর রোজ রোজ বাড়িতে—না, কাল থেকে আর নয়।'

কিন্তু মহাকালের খাঁচাকলে যাঁরা বাঁধা, তেলে জলে মিশ খায় না এই আপ্তবাক্য বলার বা কালাকালের ব্যবস্থা করবার তাঁরা কে!

প্রেমঢাকের বোল

'শ্রবণী'র পাঠকদের জন্য যে কী গল্প লিখবো ভেবে পাচ্ছি না, অথচ লিখবো বলেই আসর জাঁকিয়ে বসেছি। যদিও ইচ্ছে থাকলেও, তেমন নিটোল গল্প আর খুঁজে পাই কোথায়। নিটোল গল্পের রাজ্য দাবড়ে, তছনছ করে, যখন গল্পের কানাকড়িটিও খুঁজে পাই না, তখন অবিশ্যি পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে ছলাকলা করে থাকি, এবং কখনো কখনো হয়তো বা ছলার জায়গায় কলা-ও মিলে যায়। সে কলা অবিশ্যি কদলী নয়, আর্টের উপলক্ষেই বলছি। কিন্তু ভাগ্যে তা কতোটুকুই বা মেলে।

যাই হোক, প্রথমেই স্বীকার করি, জটিল চিন্তা, সূক্ষ্ম ভাবনা, মনস্তত্ত্ব বা গভীর গাঢ় কোনো রোমান্টিক প্রেমের গল্প আমার মোটেই আসছে না। আকাশ ভরা মেঘ ছাওয়া এই বর্ষার দিনে রবীন্দ্রনাথের চিরস্মরণীয় সেই 'একরাত্রি'-র মতো গল্প, নির্বাক দুটি মানব-মানবীর মৌন বেদনার হাহাকার, আকাশভরা মেঘ, চারিদিকে প্লাবন—পড়তে পড়তে বুক টনটনিয়ে ওঠা উদাস ব্যথা—না, সেরকম কোনো গল্পও আমার মনে আসছে না। যা আসছে তা অনেকটাই রিমঝিম বৃষ্টিতে ছুটির দিনের হালকা মেজাজের আসর জমানো গল্প, তাও অনেকটা আলো কালোর ধন্দে ভরা।

গল্পটা বলার আগে একটি কাহিনী মনে এসেও আসছে না। খুব ছেলেবেলায়, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ নিয়ে, ছোট দৈর্ঘ্যের একটি ছায়াছবি যেন দেখেছিলাম। কাহিনী মনে নেই এখন, খুব হেসেছিলাম, মনে আছে। বড় হয়ে আমার এক বন্ধুর মায়ের মুখে একটি গল্প শুনেছিলাম। বর্ধমানের কোনো এক গ্রামের তিনি ব্রাহ্মণগিন্নি। তাঁদের বাড়ির পাশে থাকতো এক গোপ দম্পতী। যদিও পেশায় গোপ ছিল না। দরিদ্র কৃষক পরিবার, তাদের গুটিকয় সন্তান। স্বামীটির নাম কেতুচরণ। কিন্তু দম্পতীর দাম্পত্য কলহ যেমন উচ্চস্বরে বাজতো, তেমনি কলহটি ছিল প্রায় প্রাত্যহিক। আর কলহ লাগলেই স্বামী ছুটে যেতো বাড়ির পিছনে কল্‌কে ফুলের গাছের কাছে। পটাপট কতগুলো কল্‌কে ফুলের বিচি ছিঁড়ে নিয়ে এসে, হামনদিস্তায় ছেঁচতে বসতো উঠোনের মাঝখানে। উদ্দেশ্য আর

কিছু না, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা। কারণ স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা অসহ্য। তখন স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ শোনা যেতো এইরকম :

স্ত্রী : হুঁঃ, মুরোদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান।

স্বামী : পাতালেশ্বর শিবঠাকুর সাক্ষী। আত্মঘাতী হব হব হব।

এই সংলাপের সঙ্গে হামনদিস্তার ঠং ঠং বেজেই চলতো। আবার :

স্ত্রী : হুঁ, অমন তিন সত্যির মুখে আগুন।

স্বামী : শিবঠাকুরের বাবা এলেও ঠেকাতে পারবে না। মরবো মরবো মরবো।

স্ত্রী : ভাতের হাঁড়িতে হাতা নাড়তে নাড়তে আওয়াজ দিতো 'হাড় জুড়োয়।'

স্বামী : বিধবা করবো।

স্ত্রী : শান্তিতে থাকব।

এই সময়েই ব্রাহ্মণগিন্নির আবির্ভাব হতো। জিজ্ঞেস করতেন, 'ও কী করছো কেতু ?'

কেতু কাঁদো কাঁদো গলায় বলতো, 'কলকে ফুলের বিচি ছেঁচছি বামুন খুড়ি। বিষ খেয়ে মরবো। ইস্তিরির খোয়ার আর সইতে পারি না।'

কেতুগিন্নিও সমান তালে বাজতো, অমন সোয়ামীর খোয়ার থেকে যেন বাঁচি।'

ব্রাহ্মণগিন্নি বলতেন, 'কেতু বৌ, তুই চুপ কর। তা হ্যাঁ বাবা কেতু—সব কিছুরই একটা দিনক্ষণ থাকে। আজ আর বিষ খেও না।'

কেতু : না বামুনখুড়ি, আজ আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। বৌমানুষের এত চোপা ?

ব্রাহ্মণগিন্নি : তা ঠিক, তবে এই ভর দুপুরবেলা রান্নাবান্না হয়েছে। এখন খাওয়া-দাওয়া কর। সময় তো আর চলে যাচ্ছে না। নেহাত বিষ খেতে হয়, ওবেলা খেও।

কেতুচরণ চুপ। কিন্তু হামনদিস্তার ঠং ঠং বেজে চলেছে। ব্রাহ্মণগিন্নি আর একটু অনুনয় করে বলতেন, 'ওভাবে কি মুখের ভাত ফেলে যেতে আছে ? অন্ন বলে কথা।'

তখন হামনদিস্তার ঠং ঠংও থামতো। কেতু হতাশ স্বরে বলতো, 'বলছো বামুন খুড়ি ?'.

ব্রাহ্মণগিন্নি : বলছি বৈকি বাবা। এখন ওসব তুলে রেখে পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসো।

আমার বন্ধুর মা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণগিন্নির কাছে এ গল্পটা যে কতোবার শুনেছি। শুনে জিজ্ঞেস করতাম, 'মাসীমা, তারপর ?'

মাসীমা বলতেন, 'তারপরে আবার কী। ঝগড়ার খোয়ারি কাটাবার জন্য, সাঁজবেলায় দুজনের হাসি আর কলকলানি শুনে, আমাদেরই লজ্জা করতো। প্রেম ঢাকের বোল্ কখন কী তালে বাজে কেউ বলতে পারে না।'

এই গল্পের ভূমিকার পরে যে গল্পটি বলতে যাচ্ছি, বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে আমি শুনেছি। এবং ঘটনার সঙ্গে নিজেও একটু জড়িয়ে পড়েছিলাম।

ঘটনাস্থল ছোট একটি মফঃস্বল শহর। রাত্রি দশটা বেজে গিয়েছে। ঝুপঝুপ বৃষ্টি। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠলো। বাড়ির কুকুরটির সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার। ভৃত্য গিয়ে দরজা খুলে দিল। দেখি, আমার এক বন্ধু মাখন এসে উপস্থিত, যদিও সে আমাকে দাদা বলে ডাকে। জামা ট্রাউজার ভেজা। উসকো খুসকো চুলও ভেজা। পায়ের স্যাণ্ডেলে কাদা। চোখে অসহায় উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। ঘরে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার ?'

মাখন এতোই বিমর্ষ, প্রথমে কোনো কথাই বলতে পারলো না। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি ?'

মাখন বিমর্ষ মুখে, ক্ষীণস্বরে বললো, 'তা ঘটেছে।'

'কী ঘটেছে ?'

মাখন যেন হতাশায় ভেঙে পড়ে বললো, 'কী আবার, যা ঘটে থাকে।'

বলে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। ওর এই ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারলাম, আর কিছুই না, ওর স্ত্রী মালতীর সঙ্গে নিশ্চয়ই ঝগড়া করে এসেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'মালতীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি ?

মাখন যেন হতাশায় আরো বেশি ভেঙে পড়লো। সোফায় এলিয়ে পড়ে বললো, 'আর পারি না।'

এরকম না পারার ঘটনা মাখনের জীবনে এতো ঘটেছে যে আমি তেমন বিচলিত বোধ করলাম না। তার আগে মাখন সম্পর্কে কয়েকটি সংবাদ দিয়ে

নেওয়া যাক। জুটমিলে ও একটা ভালো চাকরিই করে। বছর আটেক আগে মালতীকে প্রেম করেই বিয়ে করেছে। সম্প্রতি একটি বাড়ি করেছে, এবং বাড়ির দলিলটি মালতীর নামে আছে।

মাখন একহারা রোগা রোগা, কিন্তু স্বাস্থ্যটি ভালো। ওর মুখের ভাবটা সব সময়েই চিন্তিত, অসহায়, উদ্বিগ্ন এবং সব সময়েই যেন ব্যস্ত। সেই তুলনায় মালতী মোটামুটি দেখতে ভালোই। একটা আলগা চটক আছে। কথাবার্তা আচার আচরণে একটু খরো বলা যায়। ওদের এখন দুটি সন্তান। বড়োটি মেয়ে, ছোটটি ছেলে। মেয়েটি মাখনেরই ভক্ত বেশি, ছেলেটি মা ন্যাওটো।

যাই হোক, মাখন-মালতীর ঝগড়ার কথাতেই আসা যাক। কী নিয়ে যে প্রায়ই ওদের ঝগড়া লাগে, তা আমরা তো দূরের কথা, ওরা নিজেরাও সঠিক জানে কী না সন্দেহ। কিন্তু মাখন মালতীর ঝগড়া লেগেই আছে। একটা কারণ, সম্ভবতঃ মাখনের বাড়ির সামনেই, ওর শ্বশুরবাড়িটা থাকার জন্য। মাখন প্রায়ই বলে, 'এই কানের কাছে কানাইয়ের বাসা, এটাই আমাকে জ্বালালে।'

ওর ধারণা, ওর শ্যালক শ্যালিকারা সব সময়েই ওর বিরুদ্ধে মালতীকে রাগিয়ে রাখে! কথাটা যে সবটা সত্যি না, তা আমরা ভালোই জানি। মাখনের শ্যালক শ্যালিকারা সেরকম মানুষ না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা কী ঘটেছে?'

মাখন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'আদতে কী ঘটেছে তা এখন আর মনে করতেই পারছি না। তবে কিছু একটা নিয়ে খিটির মিটির লেগেছিল।'

আমিও সেটা জানি, মাখনের এখন আর ওসব খেয়ালেই নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা এই বৃষ্টি মাথায় করে, এত রাত্রে বাইরে বেরিয়েছ কেন?'

মাখন একটু মাথা নেড়ে, করুণ স্বরে বললো, 'কিছুক্ষণ আগে ক্লাবে তাস খেলে বাড়ি গিয়েছিলাম। মালু আমার মুখের ওপর কোলাপসিবল গেটে তালা বন্ধ করে দিয়ে বললো, "আবার এমুখো কেন? সব তো ঘুচেই গেছে। এখন যেখানে খুশি সেখানে যাও।" বলে লাইট অফ করে অন্ধকার করে দিল। আমারও রাগ হল। এখানে চলে এলাম।'

আমি একটু বিরক্তভাবে বললাম, 'তার মানে কি? মালতী শুধু শুধু ওরকম করবে কেন? তুমি কী করেছ?'

মাখন উদাস বিষণ্ণ চোখে খানিকক্ষণ আমার বইয়ের আলমারির দিকে তাকিয়ে

রইলো। তারপরে সনিশ্বাসে বললো, 'দুপুরে যখন ঝগড়া হয় তখন বলেছিলাম, ওকে আমি ডিভোর্স করবো।'

গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর?'

মাখন বললো, 'তারপরে বিকেলবেলা মিল থেকে ফেরার সময়, কোম্পানীর একটা ছাপানো চার্জশীট ফর্ম নিয়ে মালতীর সামনে ধরে বললাম, "এই নাও ডিভোর্সের কাগজ, এতে সই করে দাও।" তুমি তো জানো, ও তেমন লেখাপড়া জানে না। কাগজটা হাতে নিয়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। মনে হল, মালুর তখন কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু আমি কিছু না বলে, জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুতে চলে গেলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলাম, আমার চা আর খাবার টেবিলে রাখা। মেয়ে এসে বললো, "বাবা, মা রান্না ঘরে বসে কাঁদছে। তুমি কি মাকে বকেছ?" আমি কোনো জবাব না দিয়ে, মেয়ের মুখে একটা খাবার পুরে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, ওষুধ ধরেছে। এতদিনে মালুকে একটু ঘায়েল করা গেছে। আমি চা জলখাবার খেয়ে ক্লাবে চলে গেলাম। সত্যি বলতে কি মনটা বেশ খুশি খুশিই ছিল।'

মাখন থামলো। আমি চুপ করে ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে আছি, আর ভাবছি চার্জশীটের ফর্মকে ডিভোর্সের দলিল বলে চালানোর কূট বুদ্ধির কথা।

মাখন বললো, 'তারপর খেলে-টেলে ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরেছি। মালতী যেন মুখিয়েই ছিল। আমি যেতেই আমার মুখের ওপর সেই কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে বললো, "নাও, তোমার বিয়ে ভাঙার কাগজ সই করে দিয়েছি।" কাগজটা নিয়ে আমি ঢুকতে গেলাম, তখনই দরজায় তালা দিয়ে—বলতে গেলে তাড়িয়েই দিল।'

আমি হাসবো না রাগবো বুঝতে পারছি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'মালতী কি সই করেছে নাকি।'

মাখন পকেট থেকে ভেজা ভেজা দোমড়ানো একটা কাগজ বের করে দিল। কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রতি চার্জশীটের ছাপানো ফর্ম। তার নিচে, মালতীর বাংলা হস্তাক্ষরে সই, 'মালতী দেবী'। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি ধারণা, মালতী এটা ডিভোর্সের কাগজ ভেবেই সই করেছে?'

মাখন বললো, 'সেই ভেবেই তো আমার মাথাটা আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মালু তো পরিষ্কার বলেই দিল, "সব তো ঘুচেই গেছে।" তার মানে কী?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'তা এখন কী করবে?'

মাখন অতি অসহায়ভাবে বললো, 'তুমি দাদা আমাকে একটু ঘরে তুলে দিয়ে এস।'

এরকম একটা আর্ত প্রার্থনাই আমি আশা করেছিলাম। তা ছাড়া কোনো উপায়ও নেই; ভৃত্যকে ছাতা দিতে বললাম। ছাতা নিয়ে সাইকেল রিকশায় চেপে মাখনের বাড়ি গেলাম। তখনো সমানে বৃষ্টি হচ্ছে। ভাবছি, কার খোয়ারি কে ভাঙছে, মাখনের বাড়ি পৌঁছে রিকশাকে অপেক্ষা করতে বলে দরজায় গিয়ে মালতীর নাম ধরে ডাকলাম। এক ডাকেই সাড়া পেয়ে বুঝলাম, সে জেগেই ছিল। আলোও জ্বললো। মালতী কিন্তু খুব ব্যস্ত না। খুব গম্ভীর এবং শীর্ণ। দেখলেই বোঝা যায়, খায়নি। গেটের তালা খুলে দিয়ে বললো, 'কী ব্যাপার, আপনি এত রাত্রে? আসুন।'

আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি মাখন নেই। অন্ধকারে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। আমি অনুনয়ের স্বরে বললাম, 'বুঝতেই পারছো, কেন এসেছি। আর ঝগড়াঝাটি করে কী হবে ভাই, মিটমাট করে নাও। মাখনকে ঘরে ডেকে নাও।'

মালতী গম্ভীর মুখে বললো, 'কেন, ও তো আমাকে ডাইভোর্স করেছে, জানেন না? আমি তো কাগজে সই করে দিয়েছি।'

আমি হেসে বললাম, 'দূর পাগল, ওটা কি ডিভোর্সের কাগজ নাকি? ওটা তো—।'

মালতী বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'জানি, ওটা মিলের একটা বাজে কাগজ। কততো মুরোদ জানা আছে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে জানলে মিলের বাজে কাগজ?'

মালতী বললো, 'কেন, বাবার বাড়ি গিয়ে আমার দাদাকে দেখালাম। দাদাই বলে দিল।'

সঙ্গে সঙ্গে মাখনের গর্জন শোনা গেল, 'ওই, ওই জন্য বলি, কানের কাছে কানাইয়ের বাসা। তা না হলে তোমার মুরোদ হত ওই কাগজে সই করা?'

মালতীও তেড়ে উঠলো, 'তোমারই কী মুরোদ ছিল, আসল কাগজ এনে দেওয়া? মিথ্যুক প্রবঞ্চক।'

মাখন আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি হুকুমের স্বরে বললাম, 'এই মাখন, ঢোকো ভেতরে ঢোকো। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।'

মাখন মালতী দু জনেই কয়েক পলক চুপচাপ। মালতী মাখনকে আড়

চোখে একবার দেখে নিয়ে বললো, 'বৃষ্টিতে ভিজে আবার ন্যাকামি করছে। তারপরে সারারাত্তির আমাকে গরম তেল মালিশ করতে হবে। ঢুকবে কী না বলো।'

মাখন একবার আমাকে দেখলো। তারপরে কিছু না বলে ভেজা বেড়ালের মতো ভিতরে ঢুকে গেল। আমি মালতীর দিকে তাকালাম। ওর চোখে হাসি চিক্‌চিক্ করছে, ঠোঁটের কোণেও। আমিও হেসে বললাম, 'চলি।'

মালতী বললো, 'একটু বসবেন না?'

আমি হাসতে হাসতেই বললাম, 'সেটা কি এখন উচিত হবে?'

মালতী মুখে আঁচল চেপে হেসে উঠলো। আমি বিদায় নিলাম। আর ভাবলাম, প্রেমের ঢাকে কখন যে কী বোল্ বাজে কে জানে!

কীর্তিনাশিনী

ওকে মহিলা বলবো, মেয়ে বলবো, তা বুঝতে পারছি না। একটা বয়সের যে কোন নারীকেই, ভদ্রলোকের মতো উল্লেখ করতে হলে, মহিলা বলাটা প্রচলিত। প্রচলন যাঁরা করেছেন তাঁদের মতিগতি সহজে বোঝবার নয়। মহিলার ইংরেজি কী? কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রচলন যাঁরা করেছেন, তাঁরা খুব একটা ভারতীয় মনোভাব নিয়ে করেননি। মহিলা বললেই একটি সমীহের ভাব ফুটে ওঠে। কিন্তু মহিলা শব্দের ইংরেজি কি, লেডি? লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন—ভদ্রমহিলাগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণ, এই রকম বোঝায়। আর মেয়ে? কন্যা অর্থেও মেয়ে বোঝায়। একটি মেয়ে বা মেয়েটি কি এ উওম্যান দ্য গার্ল?

সচরাচর মহিলা বললে, একটা দূরত্ব সমীহ এবং একটু বেশী বয়সের চিন্তাটাই যেন মনে আসে। মেয়ে বললেই যেন বয়স কমে আসে। মনে হয়, অবিবাহিতা-দের মেয়ে বললে তেমন কটু শোনায় না। কিন্তু একটি আঠারো বছর বয়সের বিবাহিত তরুণীকে মহিলা বললে, কেমন যেন শ্রবণে বাজে। আসলে সব ব্যাপারটাই, চরিত্র ও পরিবেশের শিক্ষাদীক্ষা ধ্যানধারণার ওপর নির্ভরশীল। আমার মনে আছে, ঢাকায় এক অভিজাত মুসলমান মহিলা, 'যুবতী' শব্দে আপত্তি করে। পরিবর্তে 'তরুণী' শব্দ ব্যবহার রুচিকর বলেছিলেন। অবিশ্যি তিনি শিক্ষিতাও। আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, তিনি 'নারী বা রমণী' কোনটা বেশি রুচিকর জ্ঞান করেন। করিনি, আমি জানতাম, তিনি 'নারী'কেই ভোট দেবেন। যুবতীর সঙ্গে যৌবন শব্দের যেমন একটা নৈকট্য আছে, তেমনি রমণীর সঙ্গে সম্ভবত রমণের। মহিলাটির মানসিক জগতের কিঞ্চিৎ হদিস এতে মিলে যায়। তারপর ভাবুন বাঙালী হিন্দুদের নাম যদি হয় রমণীমোহন; কী লজ্জা কী লজ্জা! যুবতীমোহন হলে তো কথাই ছিল না। ঢাকার সেই মহিলার কথা শুনে বাঙালী ব্রাহ্মণদের কথা মনে হয়ে যায়।

কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীতের মতো হয়ে যাচ্ছে। আমি যা বলতে চাই তা-ই বলি। এবং আমার মতো করেই বলি। যাঁর কথা আমি বলতে যাচ্ছিলাম তাকে আমি প্রথমেই মহিলাই বলি, কারণ প্রথম দর্শনেই ও পরিচয়ে তাঁকে

আমার তা-ই মনে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় একটি ক্লাবে। নাম সুচেতা অধিকারী।

আমারই এক বন্ধু। ক্লাবে নিমন্ত্রণ করেছিল। নিতান্ত তাস খেলা বা আড্ডার জন্য না, রাত্রের খাবার ব্যাপারও ছিল। তা ছাড়া আমি তাস খেলতেও জানি না। আমার বন্ধু সুচেতা অধিকারীর সঙ্গে শুধু পরিচয় করিয়ে দেয়নি, সকলের অলক্ষে সুচেতাকে দেখিয়ে একটি ইঙ্গিতসূচক কথা বলেছিল, যা থেকে আমাকে বুঝে নিতে হয়েছিল। সুচেতার সঙ্গে তার সম্পর্কটা আমরা যাকে বলে থাকি নিষ্পাপ তা নয়। বন্ধুটি আমার মোটামুটি ঘনিষ্ঠ, অতএব সে বিবাহিত হলেও, তার জীবনের এরকম একটি গুপ্ত কথা বলতেই পারে। সুচেতা তখন চোখের পাতা নিবিড় করে একটু অপ্রস্তুত লজ্জায় হেসে বলেছিলেন 'কী বলা হচ্ছে, শুনি ? বাজে কথা একটাও বলো না।'

বন্ধু হেসে বলেছিল, 'যা বলছি, সবটাই কাজের, জিজ্ঞেস করে দ্যাখো।'

বলা বাহুল্য, সুচেতা আমাকে তা জিজ্ঞেস করতে পারে না, করেনও নি, কারণ, ওর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় উনি বুদ্ধিমতী। আমার বন্ধু কী বলে থাকতে পারে, সে অভিজ্ঞতা ওর আয়ত্তে আগেই ছিল। উনি শুধু হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'ওর কথা একদম বিশ্বাস করবেন না।' বলে এমনভাবে হেসেছিলেন, যেন আমাকে বিশ্বাস করবার অধিক কিছু জানিয়েছিলেন, এবং পরে আমার সঙ্গে যেরকম ঘনিষ্ঠভাবে সুচেতা কথাবার্তা বলেছিলেন, বোঝা গিয়েছিল আমার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্বের কোন বাধা নেই। কথাবার্তায় মনে হয়েছিল, সুচেতা অধিকারী অশিক্ষিতা নন। জানা গিয়েছিল, তিনি একটি চাকরিও করেন এবং অবিবাহিতা।

বন্ধুর ভাগ্যটি প্রায় ঈর্ষা করবার মতোই। চাকুরিজীবী, শিক্ষিতা, অবিবাহিতা এবং তারপরেই হাউইয়ের জলে ওঠার মতো, একটি প্রজ্বলিত বর্ণাঢ্য আলোর মালার মতোই পাত্রী চাইওয়ালাদের কাছে দারুণ সংবাদ, উজ্জ্বল শ্যামা, স্বাস্থ্যবতী, নাক সামান্য বোঁচা, কিন্তু কালো ডাগর চোখ। বয়স ? এখানে একটু গোলমাল আছে, কারণ সত্যি বললে আটাশ বলতে হয়, অন্যথায় মধ্যবিত্ত বাঙালীর সমাজে যেটা প্রচলিত, আঠারো বলতেই বা অসুবিধা কী ? একটা কথা তো জানতেই হবে। বয়সের ছাপ যাদের ফুটে ওঠে, তারা নিতান্ত গ্রাম্য আর নিজের সম্পর্কে অচেতন। আজকাল অনেক চল্লিশ চতুর্দশীর মতো চঞ্চলা বালিকা। হাসিতে খুশিতে ছুটতে দৌড়ুতে প্রগল্‌ভতা এমনই, বয়সের ছাপ-টাপ আপনা থেকেই ঝরে যায়।

আমাদের অগ্রজপ্রতিম এক বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানী একদিন বলেছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি, মেয়েরা অকালেই বুড়িয়ে যেতো, আজকাল প্রত্যেকটি মেয়েকেই মনে হয় ফিটফাট সুন্দর। আমার স্ত্রীকেই তো দেখি, তিনি যেন দিন দিন যুবতী হচ্ছেন। একটা কী রহস্য ওরা আবিষ্কার করেছে!

কথাটা শুনে হেসেছিলাম, কিন্তু মনে মনে তাঁর কথা অনেকখানি মেনে নিয়েছিলাম। যাই হোক, সুচেতা অধিকারীর রূপ আর স্বাস্থ্যের জন্য এত কথা বলার দরকার নেই। তার সবই ভালো, বক্ষ, কটি এবং নিতম্ব বেশ মানানসই, কিন্তু মেদের ব্যাপারে বিপদ সংকেতের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছেন। মেদ একটু বাড়লেই ওঁর এই সুঠাম শরীরের রূপ পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মনে হয়, সুচেতা অধিকারী সে বিষয়ে নিশ্চয় সচেতন আছেন, কারণ দেখে শুনে মনে হয়েছিল তিনি নিজের সব বিষয়েই সচেতন। পোশাক প্রসাধন বিষয়েও। আমার বন্ধুর সঙ্গে প্রথম যে দিনটিতে তাঁকে ক্লাবে দেখেছিলাম, সেদিন তিনি রঙ মেলানো শাড়ি জামা স্লিপার সাণ্ডেল কপালের ফোঁটা, কানে ফুলের এবং গলায় পাথরের মালা পরেছিলেন, এবং বলাই বাহুল্য, ওঁর স্লিভলেস জামার গলা আর কাঁধের হ্রস্বতা নিটুট বক্ষের আপাতঃ উদাসীনতায় আসলে একটি সর্বনাশের সংকেতই জাগিয়ে রেখেছিলেন, তদুপরি নির্লোম নিভাঁজ মেদহীন শ্রোণীদেশ, নাভির নিচের শাড়ি বন্ধনীতে যেন রীতিমতো একটা উস্‌কে দেবার চ্যালেঞ্জ।

সুচেতা অধিকারীর ঠোঁট, অনেকটা পানকৌড়ী পাখির মতোই স্কচ্‌ অন্‌ রকের পাত্রে ডুব দিচ্ছিল। অকল্পনীয় নয় কী? বরফ গলা জলটুকু বাদ দিলে, নীট্‌ হুইস্কিতে ওরকম নিবিড় চুমক, এক কথায় কলিজায় জোর থাকা দরকার এবং তা ওঁর ছিল। হতে পারে একটু প্রগল্‌ভ হয়েছিলেন, দ্রব্যগুণ বলে একটা কথা তো আছে। গালে আর চোখে রক্তাভাও লেগেছিল ওঁর। যৌবনের আগুন আরো লেলিহান ক'রে তুলেছিল। কারণ সেই রক্তিম কটাক্ষ অনেকটা মিছরির ছুরির মতোই। কাটলেও মিষ্টি। কিন্তু ওঁর কথা ছিল স্পষ্ট, শালীন এবং ল্যাস ছাড়া কোনো বিকৃত ভঙ্গি দেখিনি।

মুগ্ধ না হবার কোনো কারণ নেই। ক্লাব, তাস খেলা, সুরা তার মাঝখানে সুচেতা অধিকারীর মতো, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায়, যোবতী নারীর সান্নিধ্য কার না ভালো লাগে? ঘরসংসারের কথা আলাদা, ক্লাবে এমনটিই তো মানানসই। অবিশ্যি কেউ কেউ ঠোঁট বাঁকাবেন, কিন্তু আসলে আমরা তো অন্তরে চরিত্রে বিশ্বাসে পুরো ফিউডাল। জানি অনেকেই চীৎকার করবেন, করছেনও, কিন্তু আমরা তো

আর দেশ-গাঁ ছাড়া ভুঁইফোঁড় না। ভাববাদী থেকে বস্তুবাদী, সকলের কীর্তিকলাপ আচার-আচরণই দেখছি। সারা ভারতে আধ ডজন ইনডিভিজুয়ালের কথা আলাদা, কোটি কোটি মধ্যবিত্তের মধ্যে সেটা এমন কিছু না। সেই আধ ডজনের মধ্যে কেউ লেনিন মাও সে তুং-এর পদনখকণার যোগ্য কী না তা-ও বিচার্য।

যাই হোক, আবার সেই শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে। আমার বন্ধুর নামটা বলেই ফেলি, সত্যশরণ—আমরা সত্য বলেই ডাকি, তার সঙ্গে প্রথম সুচেতা অধিকারীকে দেখেছিলাম। রাত্রি এগারটা পর্যন্ত ভালোই কেটেছিল। পরে সত্যর কাছে শুনেছি। সুচেতা অধিকারীকে নিয়ে ও গভীরভাবে চিন্তা করছে। ওর স্ত্রী সুচেতার কথা জানতে পেরেছে, তা নিয়ে সংসারে প্রতিদিন অশান্তি লেগেই আছে। সে অশান্তি মারাত্মক। জিনিসপত্র ভাঙাচোরা, চীৎকার চেঁচামিচি, এমন কি হাতাহাতি মারামারি পর্যন্ত। সত্যর স্ত্রী নাকি ওর টাই ধরে একদিন এমন টেনেছিল গলায় রীতিমত ফাঁস লেগে গিয়েছিল। নিতান্ত পরমায়ু ছিল বলেই দম বন্ধ হয়ে মারা যাননি। সত্যর বিরুদ্ধে পাড়ায়ও জানাজানি হয়েছে।

শেষ সংবাদ পেয়েছিলাম, সত্য আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছে, পরিবারের সঙ্গে আর থাকে না। বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার সম্ভাবনা। সত্য পশ্চাদপদ না। ও স্বীকার করতে রাজী আছে, সুচেতার সঙ্গে ওর অ্যাফেয়ার আছে, অতএব বিচ্ছেদ অনিবার্য।

এই সব সংবাদের মধ্যে, সুচেতার কথা আমার মনে পড়ে যায়। আমি ওঁর বাইরেটা দেখেছি, যা নিশ্চিতরূপেই পুরুষকে মুগ্ধ করে। ভিতরের সংবাদ জানা নেই, অর্থাৎ ওর হৃদয়বৃত্তির সংবাদ যাকে বলে প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি। তবে সত্যের মতো পুরুষের এতোখানি অগ্রসর হওয়ার মধ্যে, নিশ্চয়ই সুচেতার হৃদয়াবেগও কাজ করছে।

তবু খারাপ লেগেছিল, কষ্ট পেয়েছিলাম। বন্ধুর সংসার ভেঙে যাওয়া কে আর চায়! বুঝতে পারি আমরা অনেক সময়ই পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের শিকার হয়ে পড়ি। তথাপি আমি সুচেতার দোষ দিতে চাই না এই কারণে, যেহেতু তাঁর মহত্ত্ব নেই, কিন্তু ভালোবাসার টান তো আছে। মহৎ মহীয়সী কজনই বা আছেন, সাধ্বী চরিত্রই বেশি। সব জেনেশুনে একটি বিবাহিত এবং ওঁর থেকে একজন বয়স্ক লোককে নিয়ে এমন ভেসেই বা যাবে কেন? বিশেষ করে যে, মেয়ে নিজে উপার্জনশীলা। সত্যর কাছেই জেনেছিলাম, সুচেতা অধিকারী টাকাপয়সার ব্যাপারে খুব নির্লোভ। এমন কি উপঢৌকনেও বিব্রত আর অস্বস্তি

বোধ, আসলে সুচেতা চান, দুটি প্রাণের আবেগ ভরা, নিবিড় একটি সংসার। অতএব কী-ই বা আর বলা যায়!

ছ'মাসের মধ্যের সত্যর ঘটনাগুলো ঘটে যায়, এবং ছ'মাসের মধ্যে সুচেতা অধিকারীকে আমি আর দেখিনি। অপেক্ষায় ছিলাম সত্য একদিন ওর আর সুচেতার নতুন সংসারে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু সুচেতাকে হঠাৎ দেখে আমাকে নতুন করে ভাবতে হলো।

এবার দেখা হলো এক হোটেলের ক্যাবারে রুমে। দেখলাম সুচেতার ঠোঁটে সিগারেট ঈষৎ কাঁপছে। গালে এবং চোখে রক্তাভা। পোশাক-প্রসাধনে কোন ত্রুটি নেই। মদিরেক্ষণা বলতে যা বোঝায়, চোখ দুটি সেই রকম দেখাচ্ছিল, এবং সেই চোখের দৃষ্টি যাঁর প্রতি নিবদ্ধ, তিনি সত্য না, অন্য একজন, আমার অপরিচিত। আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসেছিলাম, তারা কেউ সুচেতাকে চেনে না। আমি ভারী অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সত্যের ঘটনা জানার পরে আর একজন ব্যক্তির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সুচেতাকে বসতে দেখে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। ও'র গায়ে গা ঠেকানো ভদ্রলোকটিকে, আপাততঃ যতোই আবেগপ্রবণ দেখাক, বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলেই মনে হচ্ছে। বয়সও চল্লিশের ঊর্ধ্বে'ই দেখাচ্ছে, এবং পোশাক-আশাকে ছাড়াও মানুষের চোখে-মুখেই তার বিদ্যাবুদ্ধির ছাপ পাওয়া যায়। আমার চোখে ভদ্রলোককে বেশ সম্ভ্রান্ত মনে হলো। সুচেতা অধিকারী ভদ্রলোকের সঙ্গে এমনই নিবিড় আলাপনে, এবং হয়তো আরো কিছুতে মগ্ন, আমি তো দূরের কথা নাচের দিকেও তাঁদের বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না।

পরের দিন অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে; সত্যকে ওর কারখানায় (ওর নিজের একটা ছোটখাটো কারখানা আছে) টেলিফোন করলাম। সত্যর গলার স্বর যেন স্খলিত আর মোটা শোনালো। আমি এমনি খবরাখবর জিজ্ঞেস করলাম, সত্যও সেই রকম জবাব দিল। তারপরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ও ওর নতুন ফ্ল্যাটেই এখনো আছে নাকি! জানালো, তা-ই আছে। ওর গলার স্বরে তিক্ততার ঝাঁজ, পরিষ্কার জানিয়েই দিল, সুচেতার সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই। ওর বিবাহ-বিচ্ছেদ আপাততঃ স্থগিত আছে, তবে আর কখনোই পুরনো সেই সংসার ফিরে আসবে না। সেটা ভেঙে গিয়েছে।

আমি ওর ওপর দিয়েই জানতে চাইলাম, সুচেতাকে ও ভালো চিনতো,

দুজনের মধ্যে বোঝাপড়াও হয়েছিল, তবে এরকম হলো কেন? জবাবে ওর বিষণ্ণ স্বর শুনতে পেলাম, 'সুচেতাকে আমি চিনতে পারিনি, আজও না। কেন যে ও আমাকে ছেড়ে গেল, আমার কাছে তা স্পষ্টই না।'···

আমি অবিশ্যি খুব আশ্চর্য হলাম না। সুচেতা অধিকারীর মতো স্বৈরিণীর অভাব কলকাতায় নেই, এবং যারা এরকম স্বেচ্ছাচার করে, তারা টাকাপয়সার জন্য নাও করতে পারে। স্বেচ্ছাচারিতাই পর আনন্দ এবং সুখ। কিন্তু পুরুষের পক্ষে সব সময় এসব চরিত্র বুঝে ওঠা কঠিন, তখন ভেসেই যেতে হয়। সত্যের কথা ভাবলে, ভয় আর কষ্ট দুই-ই হয়। ওর সব দিকই গেল। সংসার, স্ত্রী, পুত্র গেল, সুচেতাও ছেড়ে গেল।

অতঃপর গত ছ' বছরে, প্রায় আধ যুগ ধরে সুচেতাকে আমি আরো কয়েকবার দেখেছি। প্রত্যেকবারই ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ, কিন্তু সবাইকেই প্রতিষ্ঠিত সম্পন্ন ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছে। কখনো অল্প বয়সের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে দেখিনি, রঙ্গিণীদের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক। ধরে নিয়েছিলাম সুচেতা অধিকারীর স্বৈরিণীবৃত্তির ওটাও একটা বৈশিষ্ট্য বোধ হয়। যতোবারই ওকে আমি দেখেছি, যার সঙ্গেই থাক, খুব নিবিড়। কখনো ওর সঙ্গে আমার দৃষ্টিবিনিময় বা কথা হয়নি।

এ নিয়ে ভাববার কিছু ছিল না।

তথাপি ভাবতে হলো। যাচ্ছিলাম বম্বেতে। দমদম এয়ার পোর্টে এসে জানা গেল, সন্ধ্যের ফ্লাইট আধ ঘণ্টা বিলম্বে ছাড়বে। আজকাল এটা নিয়মেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে আবহাওয়া ভাল খারাপে কিছু আসে যায় না, ফ্লাইট সব সময়েই বিলম্ব।

লাউঞ্জের এদিক ওদিকে ঘোরাঘুরি করতে করতে, ডাইনিং হলে গেলাম। তেমন ভিড় নেই। একটু চা-পানের ইচ্ছে নিয়ে যে টেবিলে বসলাম, দেখলাম তার দুটো টেবিলের পরেই অন্য টেবিলে সুচেতা অধিকারী বসে। পাশে, আশ্চর্য, আমারই অত্যন্ত চেনা এক বন্ধু, রতীশ হালদার, বেসরকারী ফার্মের বড় চাকুরে। বেশ অবস্থাপন্ন, কলকাতায় নিজেদের বাড়ি গাড়ি এবং ওর সংসারও বেশ সুখের বলেই জানতাম। ও সুচেতার সঙ্গে এখানে কি করছে?

রতীশকে দেখছি, মুখে কয়েক দিনের গোঁফদাড়ি। চোখের কোল বসা, জামাকাপড়ও তেমন পরিচ্ছন্ন না, চোখ লাল, মুখ বসা। সে করুণ কাতরভাবে

কিছু বলছে। আর সুচেতা শক্ত মুখে মাঝে মাঝে একটু ঘাড় নাড়ছে। সুচেতার যেমন সাজগোজ থাকার কথা তেমনি আছে। রতীশ একবার সুচেতার হাত চেপে ধরলো, সুচেতা হাতটা জোরে ছাড়িয়ে নিল, রীতিমতো বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ।

আমার মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। চা-পানের তৃষ্ণা আর বোধ করলাম না, উঠে বেরিয়ে গেলাম। ভাবলাম রতীশটা আবার এই স্বৈরিণীর পাল্লায় পড়লো কি করে? এরা কি কেউ কোনো খবরই রাখে না? রতীশের সংসারের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো।

যথাসময়ে প্লেনে উঠে গিয়ে দেখলাম, সেই প্লেনের যাত্রী সুচেতা অধিকারীও, এবং সে আমার আগেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। ওকে বেশ খুশি ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আমি প্লেনের ভিতরে গিয়ে মনের মতো জায়গা খুঁজছি, তখনই সুচেতা আমাকে পাশ দিয়ে ডেকে বলে উঠলো, 'আরে আপনি! বম্বে যাচ্ছেন নাকি? আসুন, এখানে বসুন।'

প্রথমটা একটু থমকে গেলাম, তারপরে আত্মধিক্কারেই মনে মনে একটু হাসলাম। দেখা যাক সুচেতা অধিকারীর দৌড়। আমি ওর পাশেই বসলাম। প্রথমে নিতান্তই বার্তা বিনিময়, ভদ্রতা, সামাজিকতা। তারপরে ওর দিক থেকে অনেকদিন পরে দেখা হওয়ার কথা উঠতেই আমি বললাম, 'আপনাকে আমি অনেকবার অনেক জায়গাতেই দেখেছি।'

সুচেতা যেন একটু বিব্রত আর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাই নাকি?'

বললাম, 'হ্যাঁ, এবং প্রত্যেকবারই আপনার সঙ্গে থাকতো নতুন সংগ্রহ।'

কথাটা বলেও মনে মনে ঘাবড়ে গেলাম, যদি অন্যভাবে কথাটা নিয়ে আমাকে যাত্রীদের সামনে অপমান করে? ও জিজ্ঞেস করলো, 'সংগ্রহ মানে?'

হেসে বললাম, 'আপনার সংগৃহীত বন্ধুদের কথা বলছি।'

সুচেতা খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, 'ওহ্! কিন্তু বন্ধু আপনাকে কে বললো? সব তো আমার শিকার।'

স্বৈরিণীর এরকম স্পষ্টবাদিতায় বিস্ময়ের থেকে বিক্ষুব্ধই হলাম বেশি, বললাম, 'সেটা আমি উচ্চারণ করতে চাইনি কিন্তু জানতাম। একটু আগে রতীশকেও দেখলাম।'

'রতীশ! রতীশকে চেনেন নাকি?' ও অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

বললাম, 'সত্যর মতো রতীশ আমার বন্ধু।'

তীব্র স্বরে কথাটা বলে বেশ তৃপ্তি বোধ করলাম। কিন্তু সুচেতা সুন্দর করে হেসে বললো, রতীশের বিবাহবিচ্ছেদ পরশু হয়ে গেছে।'

আমি চমকে উঠলেও অত্যন্ত ঘৃণা-প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিতে সুচেতার চোখের দিকে তাকালাম। সুচেতাও তাকালো। প্রায় মিনিট খানেক চেয়ে থাকার পরে আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। কারণ সুচেতার ঠোঁট বেঁকে উঠছে, নাসারন্ধ্র ফুলছে, একটা উত্তেজনার ঝলক ওর চোখে-মুখে। ও হঠাৎ বললো, 'জানি কি ভাবছেন! ভাবুন, কিছু যায় আসে না। কিন্তু কীর্তিনাশার যা কাজ সে তাই করবে।'

'কীর্তিনাশা!' অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

সুচেতা বললো, 'হ্যাঁ, লেখক মশাই এক্ষেত্রে কীর্তিনাশীও বলতে পারেন। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটাতে আর সংসার ভাঙার খেলা খেলতে আমি খু-উ-উ-ব ভালবাসি। এটাই আমার জীবনের ব্রত।'

আমি বিস্ময়াকুল অসহায় জিজ্ঞাসু চোখে সুচেতার দিকে তাকালাম। সমস্ত ব্যাপারটার সুর আর ধ্বনি যেন অন্য রকম বাজছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন? এমন মর্মান্তিক ব্রত কেন আপনার?'

'খুবই সহজ।' সুচেতা একটু হেসে বললো, 'আমি এরকম একটি মর্মান্তিক খেলারই শিকার কিনা। এক সময়ে আমারও সবই ছিল।'

আমি নির্বাক। সুচেতার হাসিতে একটা ছায়া নেমে এলো, একবার কাঁধের ভিতর দিয়ে বাইরের আকাশ দেখলো, তারপর বললো, 'আমার জীবনের মূল যেখানে প্রোথিত ছিল, আমার স্বামী আর সংসার—বড় ভালবাসার। পূজা করে পাওয়া স্বামী আর সংসার। সেখান থেকে যখন আমাকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল তখন আমার চারপাশে সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা ঘিরে ছিলেন কিন্তু কী দেখলাম জানেন? কারোর কিছু এলো গেল না, নির্বিকার সমাজ আর বন্ধুরা চেয়ে দেখলো মাত্র। তাই আমিও দেখাচ্ছি আর দেখছি। সত্যি এ খেলার মধ্যেও দারুণ থ্রিল আছে।

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। দেখলাম সুচেতা অধিকারীও নীরবে বাইরের আকাশের দিকে দেখছে। এক সময়ে, যখন এয়ার হোস্টেস ঘোষণা করল প্লেন ল্যাণ্ড করছে, তখন আমি তাড়াতাড়ি সুপ্তোত্থিতের মতো জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু এতে কি শান্তি পেয়েছেন?'

সুচেতা ঘাড় নেড়ে বললো, 'না। শান্তি অমূল্য বস্তু, খানিক সুখ পাই।'

বললাম, 'কতোদিনই বা এভাবে চালিয়ে যাবেন? একদিন তো থামতেই হবে।'

'নিশ্চয়, যখন থামবার থামবো।' সুচেতা বললো।

আমি বললাম, 'অনেক তো হলো, এবার থামুন না।'

সুচেতা হেসে বললো, 'দেখুন অনেক কিছু শুরু করা যায় থামানোটা বোধ হয় নিজের হাতে থাকে না। আমি শুরু করেছি, থামতে শিখিনি। কিভাবে থামে দেখি!'

আমি বললাম, 'আমি জানি।'

সুচেতা অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'জানেন? কিভাবে বলুন তো?'

হেসে বললাম, 'বলবো না।'

সুচেতার চোখে নতুনতর বিস্ময়ের ঝিলিক ও আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালো। আমি হেসে বললাম, 'প্লেন ল্যাণ্ড করলো।'

'কিন্তু—?' সুচেতার দৃষ্টি তেমনি। কথা বলতে পারছে না।

আমি বললাম, 'কিছু না, ঠিক আছে। আমি জানি কিন্তু কখনোই বলবো না।'

আমি যাত্রীদের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। আমার পিছনেই সুচেতা অধিকারী।

নায়িকা

মেয়েটির মধ্যে নায়িকা-লক্ষণ, ঠিক কী ছিল, আমি জানি না। সঠিক নায়িকা-লক্ষণই বা কাকে বলে, সে বিষয়েও আমার কোন ধারণা নেই। অবিশ্যি শাস্ত্রীয় মতে যাকে নায়িকা-লক্ষণযুক্তা বলা হয়ে থাকে, তার বিষয়ে একটা কেতাবী ধারণা আছে। না, ভুল হল। নায়িকা-লক্ষণ বলে, বিচার করা হয় নি। বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর রূপ দেখে নানা শ্রেণীতে তাদের ভাগ করা হয়েছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে যে-রকম শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে, আমি ঠিক তার কথা বলছি না। হিন্দুশাস্ত্রমতে 'নারীর বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে শরীরের বর্ণ, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং কেশ ইত্যাদি থেকে নানান্ বিশেষণে নারীদের ভূষিত করা হয়েছে। তার মধ্যে সতী-অসতীর বিচারও আছে।

নায়িকা-লক্ষণ বললে বোধ হয় অন্য কিছু বোঝায়। সতী-অসতীর বিচার এক কথা। নায়িকা-বিচার বোধ হয় আর এক কথা। এসব কোনটাই আমার নিজের কথা, নিজের বিশ্বাসের কথা না। নিতান্ত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার কথা বলছি।

হিন্দুমতে সর্বগুণ সুলক্ষণা, স্নেহশীলা, প্রেমব্যাকুলা কান্তা বা দয়িতা, সুলক্ষণার মধ্যেও সামান্য কয়েকটি রেখা ও রোমরাজির জন্যই যে-নারী গৃহাঙ্গন ও বহিরাঙ্গনের মধ্যপথে বিচরণশীলা, কিংবা সুবর্ণচ্ছটা ও সুদেহিনী নারীর বস্তিদেশ থেকে উদ্‌গত কেশরেখা নাভিস্থলগামী, একমাত্র এই কারণেই সে সুভোগা গণিকা-লক্ষণা—ইত্যাদির বিচার এরকম। নায়িকা লক্ষণের কথা উঠলেই চিন্তা ধাবিত হয় তন্ত্র ও শাক্ত ধারার দিকে। সেখানে তো নটী, ডোম্বিনী, বেশ্যা, যবনী, শূদ্রাণী, ব্রাহ্মণী অনেকেই নায়িকা।

নায়িকা তো, সম্ভবতঃ হিন্দুশাস্ত্র মতে, প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাও। অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী স্তথা। যাঁরা সকলেই একাধিক পুরুষের অঙ্ক-শায়িনী হয়েছিলেন। কিন্তু সেইজন্যই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া নন, আরো গভীরতর কারণ ও ব্যাখ্যা আছে।

আমি আসলে সিনেমার হিরোইনের কথা বলতে যাচ্ছিলাম। এত কথার পরে এ কথাটা, একটু অ্যাণ্টি-ক্লাইম্যাক্স মনে হতে পারে। না, আমি কোন প্রতিষ্ঠিতা মুভি হিরোইনের কথা বলছি না। আমার স্বল্প-পরিচিতা এক মহিলা, এখন থেকে বছর চারেক আগে, তাঁর কন্যাকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য কন্যাটিকে তিনি চিত্রজগতের একটি তারকা করতে চান, সেজন্য আমার সাহায্য চাই। চলতি কথায় আমরা যাকে 'ফিল্মে নামা' বলি তা-ই। এই 'নামা' কথাটাকে অবিশ্যিই 'অবতীর্ণ' অর্থে ধরতে হবে।

আমার কাছে কেন?

কারণ আছে। আমার দু'চারটি গল্প অবলম্বনে ছবি হয়েছে। তা থেকেই অনেকে সেই মহিলার মতই ধরে নেন, চিত্রজগতের চিচিং ফাঁক মন্ত্রটা আমার জানা আছে। তার আগে, চিত্রজগতে, আমার অস্তিত্বের স্বরূপ তো তাঁরা জানেনই না, এমন কি যার জন্য ওকালতি করেন, তার রূপ-স্বাস্থ্যের দিকেও বোধ হয় একবারটি ভালো করে তাকিয়ে দেখেন না। অবিশ্যি এ কথাটা বলা হয়তো ঠিক হল না। তারকা, তা মহিলা বা পুরুষ, যে-ই হোক, সকলের কাছে এক রকম অনিন্দনীয় সুন্দর না। অতএব রূপের বিচারে আমার না যাওয়াই ভালো। সত্যিই তো, কোন্ মেয়ে বা ছেলেকে যে কোন্ ভূমিকায় কাজে লেগে যায় তা কে বলতে পারে। আমরা যখন লিখি, আমাদের নারী-চরিত্র মাত্রেই রূপবতী এবং স্বাস্থ্যবতী হয় না। পুরুষরাও না কন্দর্পকান্তি। তবু ওই মন্দের ভালো বলে একটা কথা আছে তো। দশজনের পাতে দেবার

একটা ব্যাপার আছে। সেই ভেবেই কথাটা বললাম। কিন্তু তাতে কী যায় আসে! আসলে এ ব্যাপারে, সাহায্যকারী হিসেবে, একেবারেই অক্ষম।

ভদ্রমহিলার অবস্থার কথা যত দূর জানি, ভালো না। আর্থিক অবস্থার কথা বলছি। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের নীচে। স্বামী কোথাও চাকরি করতেন, কী এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়স কুড়ি-একুশ। সে ছোটখাটো একটি কারখানায় কাজ শিখছে। বেতন সামান্য। তারপরেই এই কন্যা। আঠারো-উনিশ বছর বয়স। আরো দুটি আছে, সে দুটিও কন্যা। ভদ্রমহিলা নিজেও সামান্য বেতনের একটি চাকরি করেন। নিতান্তই সামান্য, এক বালিকা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান বলা যায়।

ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্য জানবার পরে তাঁর কন্যার দিকে ভালো করে তাকিয়ে, কেন যেন মনে হল, এ মুখ আমার চেনা। কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারি না। হয়তো আশেপাশে পথে-ঘাটেই দেখেছি। মেয়েটি দেখতে মোটামুটি সুশ্রীই। স্বাস্থ্য তেমন উজ্জ্বল না, খারাপও না, একহারা, গঠনও দীর্ঘই। অ্যাভারেজ বাঙালী মেয়েদেরই চোখ একটু বড় হয় বলে আমার ধারণা এবং এরও তা-ই। মেয়েটি সলজ্জা হেসে আমার দিকে তাকাল। আবার মুখ নামিয়ে নিল।

আমি হেসে ভদ্রমহিলাকে বললাম, 'কিন্তু ফিল্মের ব্যাপারে আমি তো কিছু করতে পারব না।'

উনি আমার উক্তিকে বিনয় মনে করে বললেন, 'তা-ই আবার কখনো হয় নাকি! আপনার এত গল্প সিনেমা হচ্ছে, সিনেমার কত লোকের সঙ্গে আপনার জানাশোনা, আপনি ইচ্ছা করলেই নামিয়ে দিতে পারেন।'

অবাক হবার কিছু নেই, এরকম কথা অনেকবার শুনেছি। কথা ফেরাবার জন্যই মেয়েটিকে একবার দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও পড়াশোনা করে না?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ইস্কুল ফাইনাল পাস করেছে।'

বললাম, 'কলেজে দিচ্ছেন না কেন?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'কলেজে পড়বার টাকা কোথায় পাই বলুন?'

সহজেই বললাম, 'তা হলে বিয়ে দিয়ে দিন।'

ভদ্রমহিলা যেন আমাকে করুণা করেই হেসে বললেন, 'বিয়ে দেবার মত টাকা যদি থাকত, তা হলে তো কলেজেই পড়াতাম।'

অকাট্য যুক্তি। আমারই ভুল। সত্যিই, বিয়েই যদি দিতে পারবেন

তাহলে তো কলেজেই পড়াতেন। সমস্যা তো সে-ই একটাই, টাকা। আর টাকা না হলে বিয়ে? অধিকাংশ মধ্যবিত্তের মানসিকতাই সকলের জানা আছে। সকলেই জানে মধ্যবিত্তের জীবনের বাস্তবতা, আর তার আদর্শ, সংস্কৃতি অনেকটাই ঘোড়া আর গাধার মিশ্রিত এক সংকরবর্ণের পশুর দ্বারাই চিহ্নিত। মনে আর মুখে, ভিতরে আর গাধার বাইরে দুস্তর অমিলের এমন নজিরটি আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

তা না হয় হল, কিন্তু কন্যাকে 'সিনেমাতেই নামাতে' হবে কেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, 'নিজের মেয়ে বলে বলছি না, অভিনয়ে ওর বেশ ন্যাক্ আছে।'

'ন্যাক্' একটি শব্দ, ইচ্ছা করে শিব্রাম চক্রবর্তীর কাছে পাঠিয়ে দিই। ন্যাক্ থেকে পান্ করে, কী শব্দ বের করা যায়, তিনিই ভালো বলতে পারবেন। আজকাল কথাটার প্রচলনও সর্বত্র। ভদ্রমহিলা আরো বললেন, 'কয়েকটা নাটকে অভিনয়ও করেছে, সবাই ভালো বলেছে। তাছাড়া নাচ-গানও ভালো জানে।'

আমি মেয়েটির সলজ্জ হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তাই নাকি? কোথায়, কার কাছে শিখেছে?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমাদের ওদিকেই, একটা নাচ-গানের ইস্কুলে।'

সেখানে কারা নাচ-গান শেখালে, ভদ্রমহিলা তাও বললেন। শুনে আমার মনে হল, যে রকম শিক্ষালয়ের কথা তিনি বলছেন সেখানে নিশ্চয়ই টাকা দিতে হয়। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করতে আমার বাধল। উনি নিজেই তার একটা ব্যাখ্যা আমাকে শুনিয়ে দিলেন, 'আসলে মেয়ের যেদিকে ঝোঁক। আমি ওকে সেদিক দিয়েই শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে চাই। লেখাপড়া শিখলেও, আজকাল চাকরির যা বাজার, কোন ভরসা নেই। এদিক দিয়ে যদি উঠতে পারে, সেটাই দেখি।'

এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা ভালো। কিন্তু ভরসা কি খুব আছে? তা ছাড়া আজ যাঁরা নামকরা চিত্রতারকা, তাঁদের চিত্রাবতরণের ব্যাকগ্রাউণ্ড আমার ঠিক জানা নেই। মাঝে মাঝে নানান্ গল্প-টল্প শুনি। আমি বললাম, কিন্তু দেখুন, সত্যি এ বিষয়ে আমার কিছু করার নেই। পরিচয় হয়তো কারো কারো সঙ্গে আছে, তাঁদের জগতে নাক গলাবার মত ঘনিষ্ঠতা নেই।'

ভদ্রমহিলা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তা বললে শুনছি না। আপনার এত গল্প ছবি হচ্ছে, আপনি বললে নিশ্চয়ই নেবে।'

আমি তাঁকে কিছু বলবার আগেই, শর্মিষ্ঠা, (মেয়েটির নাম) বলে উঠল, 'আপনি আমাকে একবার চান্স করে দিয়ে দেখুন, আমি ঠিক পারব।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমার মেয়ের এটা একটা ছেলেবেলার স্বপ্ন। আপনাকে সাহায্য করতেই হবে।'

কী বলি! কী বলেই বা বোঝাই! আমার অসহায়তার কথাই আরো স্পষ্ট করে বললাম, 'দেখুন, ও জগৎটা একেবারে আলাদা। ওঁদের যখন যেমন মেয়ে বা ছেলে দরকার, ওঁরা নিজেরাই যোগাড় করে নেন।'

শর্মিষ্ঠা বলে উঠল, 'তা ঠিক। কিন্তু সব সময় তো তাঁরা দরকার মত খুঁজে পান না। হয়তো আমাকে দেখলে, তাঁদের মনে হতে পারে, আমাকে দিয়ে হবে। আপনি কেবল একবারের মত চান্স করে দিন।'

আরো কিছু যুক্তি-তর্ক বিনিময় করে বুঝলাম, মা-মেয়ের সঙ্গে আমি পারবো না। এর আগেও অনেকের সঙ্গে পারিনি। অথচ সত্যি সত্যি কোন পরিচালক বন্ধু যখন কোন ছেলে বা মেয়ের জন্য ক্রাইসিসে পড়ে, তখন পছন্দমত ছেলে-মেয়ে চোখে পড়ে না। অগত্যা শর্মিষ্ঠার জন্য আমি আমার একে ঘনিষ্ঠ চিত্র পরিচালক বন্ধুকে একটি চিঠি লিখে দিলাম, 'পত্রবাহিকা ছবিতে অভিনয় করতে চায়। আপনার কোন ছবিতে যদি একে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়, একটু বিবেচনা করে দেখবেন।' ইত্যাদি।

অবিশ্যি একটিমাত্র চিঠিতে ভদ্রমহিলা খুশি হননি। এক পরিচালক না নিলে, আবার অন্য পরিচালকের জন্য তিনি আসবেন সে কথা শুনিয়ে গেলেন। যাই হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পরিণতি কী হয় আমার কিছু কিছু জানা আছে। সে বিষয়ে আমি বিশদ বলতে চাই না। শর্মিষ্ঠা যদি চিত্রতারকা হতে পারে, আমি খুশিই হব। না হতে পারলে সে যেন সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে, এটাই প্রার্থনা।

তারপরে শর্মিষ্ঠার কথা আমার আর মনে থাকার কথা না। ছিলও না। কিন্তু যে কারণে আমার মনে হয়েছিল, শর্মিষ্ঠার মুখ যেন আমার চেনা-চেনা, সেই কারণটা জানা গিয়েছিল। যত দিন শর্মিষ্ঠা আমার কাছে আসেনি, ওর কোন পরিচয় আমার কাছে ছিল না, তত দিন ও আমার আশেপাশে আর দশটা মেয়ের মতই ঘোরাফেরা করেছে, বিশেষভাবে চোখে পড়ার কারণ ছিল না। আমার সঙ্গে দেখা করার কিছুদিনের মধ্যেই শর্মিষ্ঠাকে আমি নানান্ জায়গায়, নানান্ ধরনের লোকের সঙ্গে দেখতে পেয়েছি। যাদের সঙ্গে দেখতে

পেয়েছি, ওরা যে সবাই ওর আত্মীয় ব্যক্তি তা আমার মনে হয় নি। না হওয়ার কারণও ছিল। ওর সঙ্গে আমি এমন দু'একজনকে দেখেছি, যাদের আমিও একটু-আধটু চিনি। যেমন একজন মধ্যবয়স্ক উকীল ভদ্রলোকের সঙ্গে ওকে আমি গাড়িতে দেখেছি। একটু অবাক হয়েছি, মনে প্রশ্ন জেগেছে, আবার আপনা থেকেই তা মিলিয়ে গিয়েছে। কারণ আর কিছুই না, সেই আইনজীবী ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা বা যোগাযোগের সূত্রটা কিছুই অনুমান করতে পারি নি। সেজন্যই বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

শর্মিষ্ঠাকে যখন যুবক বয়সের কারোর সঙ্গে দেখেছি, তখন তেমন অবাক হই না। অনেকটা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিই। তবু তার মধ্যে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে যায়। ও যাদের সঙ্গে যে সব জায়গায় ঘোরে, গোটা চেহারাটার সঙ্গে ওর পারিবারিক অবস্থাকে মেশানো যায় না। যেমন অভিজাত রেস্তোরাঁয় বা বিভিন্ন ক্লাবে ওকে আমি দেখেছি। যাদের সঙ্গে দেখেছি তাদের সবাইকে চিনি না, কিন্তু তারা যে অবস্থাপন্ন সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কেননা শর্মিষ্ঠাদের অবস্থার লোকদের সেখানে যাবার সঙ্গতি নেই। আমি জানি না, শর্মিষ্ঠা আমাকে কখনো দেখেছে কী না! দেখে থাকলেও জানতে দিতে চায় নি। আমিও কখনো আমার উপস্থিতিকে জানাবার বা দেখাবার কোন চেষ্টা করি নি। বরং ওকে দেখে অস্বস্তি বোধ করেছি, পাছে ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়, সেই লজ্জাতেই মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি। অথচ শর্মিষ্ঠাকে মনে হয়েছে, বেশ স্বাভাবিক, সাবলীল। এমন কি খিলখিল হাসিতে ওর সর্বাঙ্গ হিল্লোলিত হতে দেখেছি।

আমার বাড়িতে যে শর্মিষ্ঠাকে দেখেছিলাম, বাইরের শর্মিষ্ঠা তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হাস্যে লাস্যে কৌতুকে কটাক্ষে, বেশবাসে, চলনে কথনে এ শর্মিষ্ঠা অন্য এক মেয়ে, যাকে নায়িকাই বলতে ইচ্ছা করে। বালিকা বিদ্যালয়ের হতদরিদ্র সেই লাইব্রেরিয়ান ভদ্রমহিলার মেয়ে বলে মোটেই মনে হয় না।

আমার বাড়িতে শর্মিষ্ঠাকে দেখার পরে বছর দুয়েক কেটে গিয়েছে। স্বস্তির সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে ও বা ওর মা আর কখনো আমার কাছে আসে নি। ইতিমধ্যে শর্মিষ্ঠার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, এবং বলতে হয়, ও দেখতেও আগের থেকে সুন্দর হয়েছে। কিন্তু এই সব ছবি থেকে সাধারণত আমরা একটা সিদ্ধান্তেই আসতে পারি এবং সেই সিদ্ধান্তের কথা ব্যাখ্যা করে বলারও দরকার নেই।

আপাততঃ এই চিত্রের মধ্যে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করেই এ পরিচ্ছদের ইতি টানতে চাই। তারপরে পরবর্তী পরিচ্ছেদ।

একদিন দুপুরে আহারের জন্য আমি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তোর"ায় গেলাম। দিনের বেলাতেও আধো-অন্ধকার পরিবেশটি শান্ত, আমার প্রিয় জায়গা। দুপুরে বাইরে খেতে হলে আমি এখানেই আসি। বেয়ারা সকলে আমার পরিচিত। আমি একটি কোণ নিয়ে বসলাম। বেয়ারা খাবার অর্ডার নিয়ে গেল। এই পরিবেশে সহসা একটু হাসির নিক্কণ, হঠাৎ একটু সুরের ঝংকার বেজে উঠলে খারাপ লাগে না। আমারও লাগছিল না। রক্ষে এই এখানে কোনরকম মিউজিক নেই।

একটি মেয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল, চিনলাম, শর্মিষ্ঠা। ও বেশ সুন্দর করে বলল, 'আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।'

রেস্তোর"ায় ঢুকে ওকে আমার চোখে পড়ে নি। বললাম, 'কী ব্যাপার, তুমি এখানে ?'

শর্মিষ্ঠা বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'আমি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এসেছি, তিনি একজন ফিল্ম প্রোডিউসার। উনি অবাঙালী, কিন্তু আপনার খুব ভক্ত, বাংলা পড়তে পারেন। আমি আপনাকে দেখিয়ে দিতেই উনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। আসবেন একটু আমাদের টেবিলে ?'

অস্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু আমি শর্মিষ্ঠাকে আমার টেবিলে বসতে বলতে চাই না। আমি উঠেই দাঁড়াই নি। লোকের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহারও আমি করতে পারি না বা চাই না। ইচ্ছা না থাকলেও আমি বললাম, 'তুমি যাও আমি যাচ্ছি।'

শর্মিষ্ঠা ওর টেবিলের দিকে গেল, আমি লক্ষ্য করলাম। সেখানে স্যুটেড-বুটেড, চোখে চশমা মাঝবয়সী একজন বসেছিলেন। আমার চোখ তাঁর দিকে পড়তেই তিনি দূর থেকে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। আমাকেও নমস্কার ফিরিয়ে দিতে হল। আঙুলের ইশারায় বেয়ারাকে ডেকে একটু দেরিতে খাবার পরিবেশনের নির্দেশ দিয়ে আমি শর্মিষ্ঠাদের টেবিলে গেলাম। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, 'দাঁড়াচ্ছেন কেন, বসুন !'

উনিও বাংলাতেই বললেন, 'আপনি বসুন।'

আমি বসলাম। শর্মিষ্ঠা বলল, 'ইনি সুরেন্দ্রকুমার জৈন, ফিল্ম প্রোডিউসার।'

সুরেন্দ্রকুমার বললেন, 'না না, ওটাই আমার পরিচয় না, আমার অন্য বিজনেস্

আছে। ফিল্ম লাইনে আমি নতুন। দাদা সব ফিল্ম প্রোডিউসারকেই চেনেন।'

'দাদা মানে আমি। বললাম, 'তা ঠিক বলতে পারি না। কলকাতায় বোধ হয় কয়েক হাজার প্রোডিউসর আছে।'

এমনি দুচার কথা পরে জানা গেল সুরেন্দ্রকুমার বর্তমানে একটি ছবি করছেন যার নায়িকা শর্মিষ্ঠা এবং পরবর্তী ছবির জন্য তিনি আমার একটি গল্প চান। খেতে এসে ব্যবসার কথাবার্তা আমি পছন্দ করি না। কিন্তু সে কথা বলা যায় না। আমি ওকে বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে একদিন আসতে বললাম। শর্মিষ্ঠাকে খুবই খুশি আর গর্বিতা মনে হল। ও যেন আমাকে খানিকটা বুঝিয়ে দিতে চাইল, নিজের চেষ্টাতেই ও চিত্রতারকা হতে পারে। এবং ও আমাকে নাম ধরে দাদা বলে বেশ আদরের সঙ্গে বলল, 'একটা খুব ভালো গল্প দিতে হবে, আমাকে যাতে ভালো স্যুট করে।'

এ সব কথা অত্যন্ত বিরক্তিকর, যদিও শুনতেই হয়। ওদের সঙ্গে খেতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আমি হাসিমুখেই ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে, আমার টেবিলে গেলাম।

পরবর্তী পরিচ্ছেদটা কিন্তু একেবারে ভিন্ন। না, আমি কাগজ-পত্রে কোথাও শর্মিষ্ঠার ছবি বা নাম দেখি নি। সুরেন্দ্রকুমারও কোন দিন আমার কাছে আসেন নি। বেশ কিছুদিন আমি শর্মিষ্ঠাকে দেখতেও পাই নি। সিদ্ধান্তগুলো মিলে যাচ্ছে মনে করে মনে মনে ঠোঁটের কোণে হেসেছি। মেয়েটির প্রতি যে করুণা হয় নি, তাও বলতে পারি না। বেচারী কোথায় ভেসে গিয়েছে কে জানে। কোন্ অন্ধকারে কে জানে।

কিন্তু আমার হাসিটা অনেকটা চপেটাঘাতের মতই আমার মুখে ফিরে এল। বেশ কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। আমি উত্তর কলকাতায় আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। বন্ধুর বাড়ির সামনেই ছোট একটা পার্ক আছে। সেখানে একটা সভা চলছিল। পতাকা আর ফেস্টুন ইত্যাদি দেখেই বোঝা যায় রাজনৈতিক সভা এবং আশ্চর্য, মঞ্চে বক্তৃতা করছে শর্মিষ্ঠা।

এক নতুন শর্মিষ্ঠা। ও ডান হাতে মাইক চেপে ধরে, বাঁ হাত তুলে আক্রমণের ভাষায় বক্তৃতা করছে। ওর মুখে দীপ্তি, চোখে ঝলক, ওকে যেন একটি অগ্নিশিখার মত দেখাচ্ছে। বক্তৃতার বচনভঙ্গি যেমন স্পষ্ট, তেমনি তীব্র।

আমি কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তুবার পার্ক করতালিতে মুখর হয়ে উঠল, ধ্বনি উঠল, 'শেম্ শেম্!'

সত্যি, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না শর্মিষ্ঠা এরকম অ্যাজিটেটিং বক্তৃতা দিতে পারে। শ্রোতাদের চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তারা কী রকম উত্তেজিত। বন্ধুর বাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাবলাম, যাক্, শর্মিষ্ঠা এবার নিজের জন্য একটা পথ খুঁজে পেয়েছে। ওকে আজ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। ওর রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে হয়তো আমার মিল নেই, তবু ভালো লাগে না. আর মনে মনে ভাবলাম, আমাদের পুরনো সিদ্ধান্তগুলো বাতিল করা উচিত। আমি আজকের যুগ আর যুগের তরুণ-তরুণীদের গতিপ্রকৃতি বোধ হয় বুঝতে পারি না। যেন খেই হারিয়ে ফেলছি। তা না হলে শর্মিষ্ঠাকে করুণা করে হাসতে যাব কেন!

না, শর্মিষ্ঠাকে আর রেস্তোরাঁয় হোটেলে ক্লাবে নানান্ লোকের সঙ্গে কখনো দেখতে পাই নি। শর্মিষ্ঠা অন্য জগতে চলে গিয়েছে।

একদিন দেখলাম, শর্মিষ্ঠা একটি দুরন্তগতি-গর্জিত মোটরবাইকের পিছনে বসে যাচ্ছে। ওর চুল উড়ছে, শাড়ি উড়ছে। মোটরবাইকের চালক একটি যুবক, যার ট্রাউজারের ওপর গুরুপাঞ্জাবি, মাথায় বড় বড় চুল, গালপাট্টা জুলফি, চোখে সানগ্লাস। বোধ হয় ওর দলেরই কোন বন্ধু। কিন্তু কিছু আন্দাজ করতে যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। কেননা মেলে না।

শেষ পর্যন্ত সত্যি মিলল না।

কয়েক দিন আগে একটি বিশেষ সভায় আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। যেহেতু সভার আয়োজনটা মূলতঃ রাজনৈতিক এবং কিছুটা সরকারী, সেজন্য আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু এক অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক দাদা কিছুতেই ছাড়লেন না, নিয়ে গেলেন। সেই মহতী সভায় মন্ত্রীরাও দু'একজন এসেছেন। এবং আমি অবাক হয়ে দেখলাম, শর্মিষ্ঠা একজন মন্ত্রীকে তাঁর নাম ধরে দাদা বলে তাঁকে মঞ্চের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে হেসে কথা বলছে। আরো অনেক মান্য ব্যক্তির সঙ্গেও ওকে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখলাম এবং দেখলাম ওরও যথেষ্ট খাতির। তারপরেই লালপাড় শাড়ি পরা শর্মিষ্ঠা মঞ্চের সামনে মাইকের দিকে এগিয়ে এল। এ শর্মিষ্ঠা সেই পার্কের নেত্রী না। এখন সে শান্তগম্ভীর দীপ্তিময়ী।

কিন্তু আমি হকচকিয়ে যাচ্ছিলাম অন্য কারণে। পার্কের সভায় যে রাজনৈতিক

দলের নেত্রী হিসাবে বক্তৃতা শুনেছিলাম, আজকের এই দল তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আগের দলের তুলনায় একেবারে বিপরীত! একেবারে আদা থেকে কাঁচাকলায়! শর্মিষ্ঠা এখানে এ দলে এল কেমন করে? বিচিত্র পরিবর্তন!

তবে কিছু আন্দাজ করতে যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না, কারণ মিলবে না। কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে আজ আমার সত্যি নায়িকা বলে মনে হচ্ছে। শান্ত কিন্তু ওর স্বরে তথাপি নিহিত আছে উত্তেজনা। ও শত্রুপক্ষের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায়। কথাগুলো সকলেরই জানা। পুনরুক্তি সম্ভাবনায় আর উল্লেখ করলাম না।

একটি রূপকথা

আমার রূপকথার গল্পটি শোনাবার আগে, আমি অন্য একটি রূপকথার কাহিনী আপনাদের সংক্ষেপে শোনাতে চাই, কারণ আমার রূপকথাটির সূত্র সেখানেই। অন্য রূপকথাটির বক্তা দিদিমা, শ্রোতা নাতি, এবং গল্পটি এই রকম : এক যে ছিলেন রাজা, তার ছিলেন এক রাণী। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ধনরত্নে হীরাজহরতে ভরা ভাণ্ডার, প্রচুর শস্য, প্রজারা সুখী, কিন্তু রাজারাণীর মনে সুখ নেই, কারণ তাঁদের কোন পুত্রকন্যা নেই। তাই রাজা বনে গেলেন তপস্যা করতে, এবং তপস্যায় ভগবান তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিলেন, বৎসরান্তের মধ্যেই তাঁর একটি সন্তানলাভ হবে।

হলোও তাই, বছর না ঘুরতেই রাজার একটি সুন্দর ফুটফুটে কন্যা হলো। রাজ্যময় উৎসবের ধুমধাম লেগে গেল। তারপরে কন্যাটি ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগলো, রূপের আলোয় যেন ফিনিক ফুটতে লাগলো তার শরীরে, দেখতে দেখতে বিয়ের বয়েস হয়ে গেল। ঘটকেরা ছুটল নানা রাজ্যে, কন্যার একটি যোগ্য পাত্রের সন্ধানে। কিন্তু যোগ্য পাত্র আর পাওয়া যায় না। এদিকে কন্যার বয়স হয়ে যাচ্ছে। তাই রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন, পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যার মুখ দেখবেন তার সঙ্গেই কন্যার বিয়ে দেবেন। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যাকে প্রথম দেখলেন, সে একটি শিশু বালক, তালপাতা বগলে পাঠশালায় যাচ্ছে। তা হোক, রাজার প্রতিজ্ঞা বলে কথা, পালন করতেই হবে, অতএব পাঠশালার ছোট্ট বালকের সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

তারপরে ?

তারপরে কন্যার ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে রাজারাণী বানপ্রস্থে চলে গেলেন। রাজকন্যা তাঁর ছোট্ট বরকে খাইয়েদাইয়ে রোজ ইস্কুলে পাঠিয়ে দেয়, আর রাজ্যপাট দেখেন। এমনি করে দিন যায়। কিন্তু একদিন ছোট্ট বালক রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমার কে হও ?' রাজকন্যা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন ?' বালক বললো, 'আমার ইস্কুলের বন্ধুরা রোজ জিজ্ঞেস করে, রাজকন্যা তোর কে হয় ? আমি তো কিছু জানি না। বলো, তুমি আমার কে হও !' রাজকন্যা হেসে বললেন, 'আজ নয়, আর একদিন বলবো।'······

দিন যায়, ইস্কুলের ছেলেরা রোজ জিজ্ঞেস করে, ছোট্ট বালক রাজকন্যাকে রোজ জিজ্ঞেস করে, রাজকন্যা হেসে হেসে বলেন, 'আর একদিন বলবো।' তারপরে একদিন বললেন, 'কাল বলবো।' পরের দিন রাজকন্যার হুকুমে রাজবাড়ি আলোয় আলোয় সাজানো হলো। শোবার ঘরে সুন্দর শয্যা, অনেক ফুল দিয়ে সাজানো হলো। সন্ধ্যেবেলা ধূপ দীপে ফুলের গন্ধে ভরে উঠলো। রাজকন্যা তাঁর ছোট্ট বরকে সাজালেন, নিজের হাতে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়ালেন। তারপরে তাকে ফুল দিয়ে সাজানো পালঙ্কের শয্যায় শোয়াতে নিয়ে গেলেন। বালক জিজ্ঞেস করলো, 'বললে না তো, তুমি আমার কে হও?' রাজকন্যা বললেন, 'তুমি শোও, আমি খেয়ে এসে বলবো।' তারপরে রাজকন্যা সোনা, হীরা, পান্নায় কনের বেশে সেজে খেতে গেলেন। খেয়ে নিয়ে এলেন ফুলবাসরে, এবার তিনি বালককে বলবেন, তিনি ওর কে হন। এসে দেখলেন, তাঁর ছোট্ট বর ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি ওর গায়ে হাত দিলেন। ঠাণ্ডা গা। পাশ ফিরিয়ে ডাকতে গেলেন, দেখলেন বালকের বুকের পাশ থেকে কালনাগিনী সাপ এঁকেবেঁকে চলে গেল। বালকের বর্ণ নীল, সাপের দংশনে মৃত। রাজকন্যার চোখে সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেল, ধূপের গন্ধ বিষাক্ত বোধ হলো, তাঁর ছোট্ট বরকে বুকের কাছে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, 'তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি তোমার কে হই। সে কথা যে বলা হল না।'...

নাতি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর?' দিদিমা বললেন, 'আর নেই, গল্পটা এখানেই শেষ।'

এটি রবীন্দ্রনাথের রচিত রূপকথা। এই রূপকথাটি আমার মুখে শুনে এক অশান্ত-হৃদয় তরুণী জিজ্ঞেস করলো 'যদি সাপের দংশনে সেই ছোট্ট বরের মৃত্যু না হোত, তাহলে কী হোত?'

এমন জিজ্ঞাসা তরুণীর চোখের তারায় কৌতূহলের ঝিলিক। ব্যগ্রব্যাকুল স্বরে বললো, 'আমি সেই রূপকথাটি শুনতে চাই।'

আমি বললাম, 'তাহলে বলতেই হয়। সেই রূপকথাটি এই রকম: পাত্র-পাত্রী অবশ্য সেই রাজকন্যা আর তাঁর বালক বর। ঘটনার শুরু তাঁর ছোট্ট বরকে ফুলশয্যায় শুইয়ে দিয়ে নিজে গেলেন নানা আভরণে কনের বেশে সাজতে এবং খেতে। রাজপুরী আলোর মালায় সাজানো বটে, আকাশে ছিল শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। যেন সেই বালক বরেরই মতো। ফাল্গুন মাস। আকাশ পরিষ্কার

জ্যোৎস্নায় ফিনিক দিচ্ছে। উতল বাতাসে নানা ফুলের মদির গন্ধ ছড়াচ্ছে, কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলের কানাকানি। কোথায় দূরে বিরহী পাখিটা ডেকে চলেছে, পিউ কঁহা পিউ কঁহা...

রাজকন্যা অপরূপ কনের বেশে ফুলবাসরে এলেন। কপালে উজ্জ্বল সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুররেখা। তাঁর মদিরেক্ষণা চোখে ব্যাকুলতা, অথচ কৌতুকের কিরণে ঝিকিমিকি করছে, ঠোঁটের কোণের হাসিতে যেন একটি অপার রহস্যের দোলা। কিন্তু ঘরে ঢুকে থম্‌কে দাঁড়ালেন, প্রাণ চমকে উঠলো, দেখলেন শয্যা শূন্য, তাঁর ছোট্ট বর সেখানে নেই! তিনি ব্যাকুল উদ্বেগে ঘরের চারিদিকে ফুলের নানান সাজ ও ঝালরের দিকে তাকালেন। কোথাও সে নেই। আজ দাস-দাসী সখীদের ছুটি দিয়েছেন। সকলেই অন্যত্র আনন্দে মত্ত। কারোকে জিজ্ঞেস করবার মতো কেউ নেই।

ভাবলেন, বালকের দুষ্টুমি নয়তো! ভেবে নিচু হয়ে দেখলেন ফুলশয্যাধারের নিচে, ঘরের কোণে কোণে, কোথাও নেই। তরুণী উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় গেল সে?'

আমি বললাম, 'রাজকন্যাও উৎকণ্ঠিত হয়ে তাই ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতে বাজুবন্ধের রিনিঝিনি শব্দ তুলে ঘরের বাইরে অলিন্দে গেলেন। অলিন্দের খিলান দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। নিচে রাজপুরীর বাগানে জ্যোৎস্নায় জুঁই-চামেলির কেয়ারী, নানা ফুল বাতাসে দুলছে। অলিন্দে কেউ নেই। রাজকন্যা সুদীর্ঘ অলিন্দ পেরিয়ে গেলেন পূর্বদিকের খোলা ছাদে। মুখ ফেরাতেই দেখলেন, তাঁর বালক বর। আলসের ধারে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে আছে। বাতাসে তার উত্তরীয় উড়ছে, গলার মালা দুলছে। দেখে তাঁর যেন ধড়ে প্রাণ এলো।'

'আমারো।' তরুণী একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, 'তারপরে?'

আমি তরুণীর খুশি-উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'তারপরে রাজকন্যা পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে তাঁর বালক বরের কাছে এগিয়ে গেলেন, যাতে বাজুবন্ধে কোনোরকম শব্দ না হয়। যখন তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখনো বালকের কোনো খেয়াল নেই। সে যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে আছে দূরের নারকেল কুঞ্জের দিকে। যেখানে বাতাসে দোলানো পাতা জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে। আনমনে বুঝি সেই বিরহী পাখিটার ডাক শুনছে। রাজকন্যা তার কাঁধে হাত রাখলেন। সে চমকে ফিরে তাকালো, তাকিয়েই যেন কেমন লজ্জা পেয়ে হাসলো। রাজকন্যা জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘর ছেড়ে এখানে এসে কি করছো?'

ছোট্ট বালক বললো, 'কিছু না, এমনি। তুমি যখন খেতে গেলে, ঘরের মধ্যে জানালা দিয়ে বাতাস আসছিল। বাইরে কি সুন্দর চাঁদের আলো। আমার মনটা কেমন হয়ে গেল, তাই এখানে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি।'

সে কথাগুলো এমনভাবে বললো, যেন বসন্তের এই জ্যোৎস্না রাত্রের কুসুম গন্ধ বাতাস তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছে। রাজকন্যা তাঁর ছোট্ট বরকে আগে কখনো প্রকৃতি-মুগ্ধ হতে দেখেননি। এখন দেখে তাঁর মনেও যেন চাঁদের জোয়ারে ঢেউ লাগলো। বালক তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'এবার বলো, তুমি আমার কে হও?'

রাজকন্যা ঠোঁট টিপে হাসলেন, তাঁর অলংকারের হীরামোতি ঝিলিক দিল, বললেন, 'আমি তোমার রানী!'

বালক অবাক চোখে তাকিয়ে বললো, 'তুমি আমার রানী?'

রাজকন্যা হাঁটু ভেঙে বসে বালকের মুখোমুখি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ গো, তুমি যে এ রাজ্যের রাজা, আর আমি তোমার রানী। আমার বাবা এ রাজত্ব তোমাকে দিয়ে গেছেন। তুমি তো এত দিন খুবই ছোট ছিলে, তাই আমিই রাজ্যপাট দেখেছি। এখন তুমি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছো, এখন থেকে তুমিই সব দেখবে। কাজের শেষে যখন এই রানীর কাছে আসবে, তখন আমি তোমার সেবা করবো।'

বলে তিনি তার কোমর বেষ্টন করে ধরলেন।

বালক এমন অভাবিত কথা কখনো শোনেনি। সে খুশি-তন্ময় চোখে রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি রাজা, আর তুমি আমার রানী?' রাজকন্যা বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি কি খুশি হয়েছ?'

বালক শিশুর মতো রাজকন্যার গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর কাঁধের কাছে মুখ লুকালো, বললো, 'হ্যাঁ। আমি কালই ইস্কুলে গিয়ে বন্ধুদের কাছে বলবো।' তারপরেই সে খুব চিন্তিত হয়ে মুখ তুলে বললো, 'কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না, রাজ্য চালাবো কেমন করে?'

রাজকন্যা বললেন, 'ইস্কুলে তুমি কি কি শিখেছ?'

বালক বললো, 'শুভঙ্করীর নামতা আর অঙ্ক, চতুর্থ ভাগের গল্প আর কাব্য, ব্যাকরণ প্রথম ভাগ।'

রাজকন্যা বললেন, 'সেই যথেষ্ট। বাকী যা রাজ্যপাট চালাতে চালাতেই শিখে নেবে। ইস্কুলের মাস্টারমশাইকে ডেকে কালই আমি বলে দেব। তাছাড়া

এখন থেকে তোমাকে অস্ত্রশিক্ষা আর সৈন্যচালনা শিখতে হবে। শত্রু রাজ্য আক্রমণ করলে তখন যুদ্ধ করতে হবে তো।'

বালক বীরদর্পে ঘোষণা করলো, 'আমি তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করতে যাবো।'

রাজকন্যা চোখের তারা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর আমাকে যদি কেউ ধরে নিয়ে যায় ?'

বালক বললো, 'আমি এক কোপে তার মুণ্ডু কেটে ফেলবো।'

রাজকন্যা হেসে বালক বরকে কাছে টেনে নিলেন, বললেন, 'চলো এবার ঘরে যাই। আজ আমাদের ফুলশয্যা।'

আমি চুপ করলাম, দেখলাম তরুণীর চোখ কৌতূহলিত জিজ্ঞাসায় চিক্‌চিক্ করছে। সে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর ?'

আমি বললাম, 'তারপর ফুলশয্যার ডিটেল কিছু নেই, রূপকথা রূপকথাই ! সে কখনো অ্যাডাল্ট হয় না।'

ইতিমধ্যে বালকের অভিষেক হয়ে গেছে। সে সিংহাসনে বসে রাজ্য চালায়। সে এখন রাজা। মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি ও লোকলস্কর সবাইকে নিয়ে সে সারাদিন রাজ্য চালনার কাজ করে। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে। সুন্দর কিশোর রাজা পেয়ে সকলেই খুশি।

রাজকন্যাকে এখন আর রাজকন্যা বলা যায় না তিনি এখন রানী। কিন্তু তিনি সখী-দাসী নিয়ে বিলাসে-ব্যসনে দিন কাটান না। পাকশালা থেকে অন্দরমহলের সব কিছু নিজে দেখাশোনা করেন। দুপুরে রাজা যখন খেতে আসে তিনি নিজে পরিবেশন করে খাওয়ান, দাসী পাখা ব্যজন করে। তারপরে রাজাকে শয়ন ঘরে বিশ্রামে পাঠিয়ে তার পাতে বসেই খান। বিশ্রামের পরে রাজা যায় নানা ক্রীড়া-কৌশল ও অস্ত্রচালনা শিখতে, সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করে। ফিরে এসে কখনো একলা, কখনো রানীকে নিয়ে রাজপুরীর কুঞ্জে বিহার করতে যায়। তারপরে ঘরের মধ্যে দুজনের খেলা শুরু হয়। কখনো বাঘবন্দী, কখনো ষোল ঘুঁটি বাঘচাল, কখনো কড়ি চেলে গোলোকধাম। যে-ই জিতুক আর যে-ই হারুক, দুজনের সমান আনন্দ। তখন দাসীরা পরিবেশন করে শরবত, মিষ্টি আর পাকা ফল। খেলার শেষে আহার ও শয়ন।

এমনিভাবে দিন যায়। রাজ্যে কোন অশান্তি নেই, অভাব নেই, যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা নেই, প্রজারা সুখী। কিশোর রাজা ক্রমে যুবাপুরুষ হয়ে ওঠে। যেমন

তার দীর্ঘকান্তি, তেমনি প্রশস্ত বুক, আজানুলম্বিত বাহু, সিংহের মতো ক্ষীণ কটি।

রানী দেখেন আর তার মনটা যেন চমকে ওঠে, রাজার বুকের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁগো, আমাকে তোমার কি মনে হয়!'

রাজা অবাক হেসে বলে, 'কী আবার মনে হবে, তুমি আমার রানী, আমার সেই রানী!'

রানী জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি সুখী তো?'

রাজা বলে, 'আমার থেকে ত্রিভুবনে আর সুখী কে?'

রানী গভীর সুখের অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে যান।

আমি থামলাম। তরুণীর খুশি-চোখে কেমন একটি ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা। বললো, 'তারপর?'

আমি বললাম, 'তারপর দিন যায়। রানীর মনে হয়, আজকাল রাজার গা যেন ফুলের গন্ধে ভরে থাকে। বিশেষ করে সাঁঝবেলায়। আজকাল তিনি সাঁঝবেলায় কুঞ্জবিহারে বেশী যেতে পারেন না। শরীরটা সব দিন ভালো থাকে না। ক্লান্ত বোধ করেন।

একদিন দেখলেন, রাজার হাতে জড়ানো চম্পাকলির মালা। রানী জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমাকে এ মালা দিল?'

রাজা বললেন, 'এ মালা আমাকে মালঞ্চের মালীর মেয়ে গেঁথে, পায়ে দিয়ে প্রণাম করেছে।'

বলে রানীর গলায় মালাটি পরিয়ে দিলেন। রানী সেই মালায় যেন কাঁটার খচখচানি অনুভব করলেন। তবুও তাঁর রাজার পরানো মালা, ফেলতে পারেন না। মনে পড়লো, রাজার গায়ে রোজই ফুলের গন্ধ লেগে থাকে। মালী-কন্যা কি রোজই রাজাকে মালা গেঁথে পায়ে দেয়! নানান্ কথা রানীর মনে হতে লাগলো, প্রাণটা কেমন অ-সুখে ভরে উঠলো।

পরের দিন পূর্ণিমা। সন্ধেবেলাতেই সোনার মতো গোল চাঁদ উঠলো আকাশে। রানী গেলেন মালঞ্চের কুঞ্জে। কুঞ্জের পর কুঞ্জ। এক কুঞ্জ থেকে আর এক কুঞ্জে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন রাজা নতমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, একটি মেয়ে তাঁর পায়ে মালা রেখে প্রণাম করছে। মেয়েটি প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। রানী দেখলেন, পঞ্চদশী মেয়েটার রূপ যেন পূর্ণিমার চাঁদের মতই ঢলঢল করছে। মুখে তার কুণ্ঠা জড়ানো লজ্জার হাসি।

রাজা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই মুখের দিকে চেয়ে আছেন। রানীর মনে হলো, তাঁর বুকে শেল হেনে গেল। তিনি চোখ বুজলেন, শুনলেন রাজা জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি আগে ফুলের তোড়া দিতে, আজকাল কেন মালা দাও ?'

পঞ্চদশী বললো, 'মহারাজ এর জবাব আমি জানি না, এ আমার অন্তর্যামীর নির্দেশ।'

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে সেই অন্তর্যামী ?'

পঞ্চদশী বললো, 'আমি তাঁকে চিনি না। সবাই দেবতাকে ফুল দেয়, অন্তর্যামীর নির্দেশে আমি আপনাকে ফুল আর মালা দিই।'

রাজা বললেন, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে কিছুই দিই না ?'

পঞ্চদশী বললো, 'আপনার দেখা পাই, সেই তো আমার পাওনা।'

রাজা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আবেগমথিত স্বরে বললেন, 'কাল তোমার মালা আমি রানীর গলায় পরিয়েছিলাম, আজ এই মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিই।'

বলে পঞ্চদশীর গলায় মালা পরিয়ে দিল। পঞ্চদশী মুগ্ধ আবেগে বললো, 'মহারাজ, আপনার এই মালা আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক।' বলে আবার প্রণাম করলো। রাজার অনুমতি নিয়ে, কুঞ্জবীথির ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজা অপলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

রানী পঞ্চদশীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁগো, ও তোমার কে হয় ?'

এ কথা জিজ্ঞাসা মাত্র, রানীর মনে হলো, একটি শিশু বালকের স্বর যেন দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলে বারে বারে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, 'তুমি আমার কে হও ? তুমি আমার কে হও ?'...

রানীর প্রশ্নে রাজা জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেল, কথা তার মুখে আটকে গেল। একটু পরে বললো, 'রানী রাত্রে শয়নঘরে গিয়ে তোমাকে বলবো, ও আমার কে হয়।'

রানী বললেন, 'বেশ তা-ই বলো।'

রাজা আজ তার বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে নানা ক্রীড়া সাঙ্গ করে অন্তঃপুরে এলো। রানীকে না দেখে সন্ধান নিয়ে শুনলো, তিনি শয়নঘরে আছেন। রাজাকে খেয়ে নিতে বলেছেন। এমনটি কখনো হয় না। রাজা একটু আনমনা হলো, খেয়ে নিয়ে শয়নঘরে গেল। দেখলো শয়নঘরে অনেক দীপাবলীর বদলে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছে। রানী বসে আছেন খাটের শয্যায়, বাজুতে হেলান

দিয়ে। প্রদীপের আলোয় তাঁর চোখ দুটি কি চিক্‌চিক্ করছে, কিন্তু দৃষ্টি যেন শূন্য! রাজা কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখলো, ডাকলো, 'রানী মুখ তোল, আমার দিকে তাকাও।'

রানী মুখ তুললেন না, তাকালেন না। তাঁর শরীর যেন পুতুলের মতো রাজার কোলে ঢলে পড়লো। রাজা ডেকে উঠলেন, 'রানী!'

'রানী কোনো জবাব দিলেন না। রাজা দেখলো রানীর শরীরটা ঠাণ্ডা। বুকের কাছে কান পাতলো, হৃদয় স্পন্দনহীন। রানীর এলানো হাত তুলতে গিয়ে দেখলো, বাঁ হাতের অনামিকার আংটিতে হীরার দ্যুতি নেই, তার বদলে একটি সোনার ক্ষুদ্র পাত্র, গায়ে নীল দাগ, দেখামাত্র রাজা বুঝতে পারলো রানী আংটির পাত্রে রাখা তরল তীব্র বিষ পান করে প্রাণত্যাগ করেছেন। রাজা শিশুর মতো আর্ত কান্নায় ভেঙে পড়লো, 'তুমি কি জানতে, আমি বলতে পারবো না, ও আমার কে হয়? রানী এই কি তোমার অভিমান?'...

গল্প শেষ করে তরুণীর দিকে তাকালাম। দেখলাম, ওর দু চোখ জলে ভরা। ভেজা স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আগের রূপকথার শেষে, আলো নিভে গেছলো, ধূপের গন্ধ বিষাক্ত বোধ হয়েছিল। এ রূপকথার শেষে পূর্ণিমার রাতের বাতাসে ফুলের গন্ধ কেন?'

আমি বললাম, 'জানি না, গল্পটা এখানেই শেষ, নটে গাছ মুড়িয়ে গেছে।

তথাপি

'ওহে অ শশীভূষণ, এই ভরদুপুরে চললে কোথায় ?'

শশীভূষণ ডাক আর জিজ্ঞাসা শুনে দাঁড়ালো, বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখলো, পঞ্চায়েত বাড়ির রকে বসে আছে কালচাঁদ মুখুজ্জে, গ্রামে যাকে সবাই কালু মুখুজ্জে বলে। শশীভূষণ বলে কালুকাকা। এখন ভরদুপুর না হোক, বেলা এগারোটা বেজে গিয়েছে। পঞ্চায়েত বাড়ির সামনেই ঝাড়ালো বটের ছায়া পড়েছে খড়ের চালে। অনেকখানি জায়গা ছায়ানিবিড়, বাকী রাস্তাঘাট সবই জ্যৈষ্ঠের রোদে এখনই যেন দপ্‌দপ্‌ করছে। চোখ মেলে তাকিয়ে থাকা যায় না, রোদে আগুনের উত্তাপ।

রাস্তার ধারেই খানিকটা জমি ছেড়ে পঞ্চায়েত ঘর। মাটিতে ঘাসের চিহ্ন নেই, কেবল ধুলা। রাস্তার পূবদিকে কিছু বন-শিউলির ঝাড়, তারপরে নিবিড় বাঁশঝাড। সামনের রাস্তাটা খানিকটা উত্তর দিকে গিয়ে, পুকুরের ধার ঘেঁষে, শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে আবার পূব দিকে গিয়েছে এবং পুকুরের ধারে ধারেই আবার উত্তর দিকে মাঠের পথে হারিয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েত-বাড়ির দাওয়ায় বসে, উত্তরে খালের ওপর সাঁকো দেখা যায়। সিমেন্ট ঢালাই করা পাকা সাঁকো। বছর পাঁচেক হলো, সরকার তৈরী করে দিয়েছে।

বনশিউলির ঝাড়ের ভিতর থেকে ঘুঘু ডাকছে। ঘুঘুর ডাক সুখের কি দুঃখের, কেউ বোধ হয় সঠিক কিছু বলতে পারে না। কালাচাঁদ মুখুজ্জের কথার জবাব দেবার আগে, শশীভূষণ একবার বনশিউলীর ঝাড়ের দিকে তাকায়। সে একবার ঘুঘুর ডাক শুনে বলেছিল, 'আসলে ঘুঘুই সেই পাখি, যে "খোকা কোথা···কোথা কোথা" বলে ডাকে।'

কথাটা শুনে সবাই হেসেছিল, এমন কি সর্বও। সর্ব—সর্বেশ্বরী, শশীভূষণের স্ত্রী। কোথায় ঘুঘু, আর কোথায় খোকা কোথা ডাকা পাখি। আকাশ আর পাতাল।

শশীভূষণ তা বোঝে, কথাটা একদিক থেকে ভেবে দেখলে বাস্তবিকই মন্দ লাগে। পুত্রহারা মায়ের কান্না যে-পাখির গলায়, সে-পাখি কখনো 'ঘুঘু হতে পারে ? ঘুঘুর নানান দুর্নাম। ধূর্ত চরিত্রের লোককে ঘুঘু বিশেষণ দেওয়া

হয়। কারোকে ভিটা ছাড়া করতে হলেও শাসানো হয়, তার ভিটায় ঘুঘু চড়ানো হবে। এই কেলে—কালাচাঁদ মুখুজ্জে, সামান্য এক কাঁচ্চা বাঁদাড়ের বখ্‌রা নিয়ে শশীভূষণের ভিটেয় অনেকবার ঘুঘু চরাতে চেয়েছে। অবিশ্যি তার দরকার হয়নি। সম্প্রতি গ্রামের একদল ছোকরা মিলে সেই বাঁদাড় সাফসুরত করে দিব্যি একখানি ঘর তুলেছে। ব্যাপার কী? না, গাঁয়ের ভিতর পার্টির একটা অফিস হবে। কথাটা ছোকরাদের জিজ্ঞেস করেছিল কালাচাঁদ মুখুজ্জে নিজেই।

জায়গাটা শশীভূষণের নাচদুয়ারের—খিড়কি দরজা যাকে বলে, পিছনে, ছোট একটা শরিকী পুকুরের ধারে। বাঁদাড়ের পাশ দিয়েই, কয়েক ঘর মেয়ের যাতায়াতের, প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের জায়গা ছিল। কিন্তু কয়েক ঘরের মধ্যে কিছু ঘর কিছু বছরের মধ্যে পাইখানা তৈরী করে নিয়েছে। তাদের বাড়ির মেয়েরা আর বাঁদাড় পুকুরে বাঁশঝাড়ে যাতায়াত করে না। ছোকরাদের হঠাৎ কোদাল কুড়াল কাটারি শাবল নিয়ে বাঁদাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে শশীভূষণ নাচদুয়ারের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করেনি। তার মনে হয়েছিল, কালাচাঁদ মুখুজ্জের নাচদুয়ারের ভারী দরজাটাও খুললো বলে। তার মতো লোক এ রকম একটা ঘটনা কখনো নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে না।

শশীভূষণের একটু ভুল হয়েছিল। কারণ সে ভুলে গিয়েছিল কালাচাঁদের দোতলা বাড়ির বারান্দা থেকে বাঁদাড় দেখা যায়। বলতে গেলে, সাতসকালের ঘটনা। সকাল তখন আটটা হবে। কালাচাঁদ বাড়িতেই ছিল, খবর পেয়ে প্রথমে সে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল, ভ্রূকুটিরক্ত চক্ষে ঘটনা দেখে সেখান থেকেই হাঁক দিয়েছিল, 'ব্যাপার কী? ওখানে কী হচ্ছে কী এ সব?'

ছোকরাদের মধ্যে কয়েকজন ফিরে দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়েছিল, আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেছিল। বাকীরা যেমন কুড়াল চালাচ্ছিল, তেমনি চালিয়ে যাচ্ছিল।

শশীভূষণ তখনই বুঝেছিল, ব্যাপার বিশেষ সুবিধার না। ছোকরারা সকলেই গাঁয়ের এবং চেনাশোনা। কেউ কেউ তার সমবয়সীও। সকলেই পার্টি করে, বলতে গেলে ওরাই এখন গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যারা কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে হাসছিল, আর নিজেদের মধ্যে কী সব কথাবার্তা বলছিল, তাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে ডেকেছিল, 'এই যে কালুকাকা, একবার এখানটিতে আসুন, ব্যাপারটা বলবো।'

কালাচাঁদ মধ্যবয়স্ক লোক, কিংবা তারো বেশী, ষাট ছোঁব ছোঁব, কিন্তু শক্ত-পোক্ত হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। পুকুরের ওপারের দোতলা বারান্দা থেকে সে শশীভূষণের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল। পুকুরের জলে পানা না থাকলে কালাচাঁদের বাড়ির প্রতিবিম্ব পুকুরে দেখা যেতো এবং শশীভূষণ ভেবেছিল, কালাচাঁদ নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছে, ঘটনার মধ্যে শশীভূষণের হাত আছে।

কালাচাঁদ তার পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির মোটা কাঁঠাল কাঠের নাচদুয়ারের দরজা খুলে, রীতিমতো রোখ্‌পাক করে বেরিয়ে এসেছিল। পরনের ধুতিরই এক অংশ তার চওড়া মোটা বুকে ঢাকা দেওয়া ছিল, যার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তার তেলে-জলে-মাখা পৈতা। কিন্তু কুড়াল-কোদাল যারা চালাচ্ছিল, তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তারা যেন ময়দানবের সম্মোহিত সহচর। ঝপঝপ হাতের যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। গোটা কয় যজ্ঞিডুমুর, বাবলা গাছ ছাড়াও বরাবর যে আমগাছটা ছিল, সেটার গায়েও কোপ পড়ছিল। একটু দূরেই ছাগলবটি লতায় জড়ানো তালগাছটাও বাদ যাচ্ছিল না। অন্যান্য ছোটখাটো গাছপালা ঝোপজঙ্গলের তো কোনো কথাই ছিল না। কর্মীদের কাজে বাঁদাড় যেন দক্ষযজ্ঞের মতো হয়ে উঠেছিল, ধুলো উড়তে আরম্ভ করেছিল এবং ইতিমধ্যে পুকুরের পাড় ঘিরে পাড়ার ছোট-বড়, মেয়ে-পুরুষ অনেকে ব্যাপার দেখার জন্য ভিড় করেছিল।

ছোকরাদের একজন কালাচাঁদকে আপ্যায়ন করে এগিয়ে গিয়ে ডেকেছিল, 'আসুন কালুকাকা। আমরা এখানে একটা ঘর বানাবো।'

কালাচাঁদ ব্যাপারটার আকাশ পাতাল কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে অবাক স্বরে উচ্চারণ করেছিল, 'ঘর?'

'হ্যাঁ, ঘর।' ছোকরা বলেছিল, 'মাটির দেয়াল-টেয়াল তুলবো না। ছ্যাঁচা বেড়ার ঘর করবো। বাঁশের দাম খুব বেশী, তা হোক। স্‌সালা বর্ষাকালে কখন বান-ফান আসবে, মাটির দেয়াল গড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, তার চেয়ে ছ্যাঁচা বেড়াই ভালো। খুঁটি পুতে, বাঁশের ফ্রেম করে তার ওপরে খড়ের চাল করবো। আমাদের তো আর মাগ্‌-ভাতারের ঘর করা না, বেড়ার ফুটো দিয়ে দেখলে চোখে রস কাটবে!'

বক্তার কথা শুনে, আরো কয়েকটি ছোকরা হেসে উঠেছিল, কিন্তু কর্মীদের যেমন কাজ তেমনি চলছিল। কালাচাঁদ মুখুজ্জে, তার জন্মকালের মধ্যে এমন দিশাহারা অবাক বোধ হয় আর কখনো হয় নি, বরং সে লোককে নানান্‌

ভাবে অবাক করেছে। প্রথমবার সে উচ্চারণ করেছিল, 'ঘর?' দ্বিতীয়বার কোনো রকমে উচ্চারণ করেছিল, 'মানে?'

'বুঝলেন না?' ছোকরা হেসেছিল। বলেছিল, 'আপনাদের এ পাড়ায় পার্টির একটা ঘর না করলে আর চলছিল না। যখন তখন তো আর এর তার বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসতে পারি না। অথচ পাড়ার ভেতর না থাকলে কাজকর্ম হয় না। বুঝলেন না, কে কখন চাল পাচার করছে, ধান পাচার করছে, কে কার পেছনে বাঁশ দিচ্ছে এসব দেখাশোনা করা আর কী!'

সকালের বাতাসে শশীভূষণ স্পষ্ট টের পেয়েছিল তাড়ির গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। কর্মীরা সেইজন্যই ময়দানবের অনুচরদের মতো, দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঁদাড় সাফ করছিল। শশীভূষণের দৃষ্টি ছিল কালাচাঁদের দিকে।

ঘটনা শুনে, এবং তার পরিণতি ভেবে, কালাচাঁদের হতভম্ব ভাব কেটে আসছিল। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল, চোখ জোড়ায় রক্ত ছুটে এসেছিল এবং সে আবার শশীভূষণের দিকে তীব্র সন্দেহে তাকিয়েছিল।

সেই তাকানোই কাল করেছিল, শশীভূষণ নিজেও জানতো না কালাচাঁদের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হতেই সে হেসে ফেলবে। কেন যে তার হাসি পেয়েছিল, সে নিজেও জানে না। সেই দৃষ্টি-বিনিময় মাত্রই কালাচাঁদ ক্রুদ্ধ চিৎকারে আকাশ ফাটিয়েছিল, 'মাম্‌দোবাজি! আমার সঙ্গে? মগের মুলুক পেয়েছ সব, না? কথাবার্তা নেই, পরের জমিতে এসে ঘর তুললেই হলো! খবরদার বলে দিচ্ছি, ভালো হবে না। এসব কার চক্রান্ত, আমি সব জানি।'

কালাচাঁদ তার রক্তচক্ষে আর একবার বন্যবরাহের মতো শশীভূষণের দিকে তাকিয়েছিল।

শশীভূষণের আবার হাসি পেয়েছিল। কিন্তু যারা বাঁদাড় দখল করে সাফসুরত করছিল, তারা শশীভূষণের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারেনি। সেই মুহূর্তেই একটা বড় যজ্ঞিডুমুরের গাছ মাটিতে পড়েছিল এবং আমগাছের গোড়া মড়মড় করে উঠেছিল।

কালাচাঁদের সামনে, গুটিকয় ছোকরা হোহো করে হেসে উঠেছিল, একজন বলেছিল, 'এই দ্যাখো, কালুকাকা, আপনি চটছেন কেন? মামদোবাজির রাজত্ব চালাতে দেবো না বলেই তো আমরা এখানে ঘর করছি। আপনার ঝাড় থেকে আমরা পঁচিশটা বাঁশ নেবো। কিছু খড়ও আপনাকে দিতে হবে চালের জন্য। আর দেখছেন তো আমরা নিজেরাই জনমজুর খেটে বাঁদাড় সাফ করছি, তার

পরে ঘরামীর কাজও আমরা করবো। এখন পাঁচটা টাকা দিন তো, একটু দম দেবার ব্যবস্থা করি।'

'মানে?' কালাচাঁদ ছোট শব্দ উচ্চারণ করেছিল। তার লাল চোখে তখন কেমন একটা ভীতি-সংশয়। দেখেছিল, কয়েকটি ছোকরা তাকে ঘিরে রয়েছে।

ছোকরা বলেছিল, 'দেখবেন, আবার বাবাকে গিয়ে লাগাবেন না যেন। আপনার তো কোনো গুণে ঘাট নেই। দম মানে, ফকুরের ওখান থেকে দু ভাঁড তাডি আনতে দেবো। আমাদের গরুর ডাক্তার বলেছে শোনেননি, তাড়ি খেলে শরীর ভালো থাকে, কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে।'

কয়েকজন হেসে উঠেছিল এবং একজন কালাচাঁদের কোমরের চাবিতে হাত দিয়ে বলেছিল, 'টাকা সঙ্গে আছে, না বাড়ি থেকে আনতে যেতে হবে?'

ব্যাপার দেখে শশীভূষণ শব্দ করে হেসে উঠতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই একটা ছোট ঢিল তার পিঠে এসে পড়েছিল।

শশীভূষণ ভ্রূকুটি-অবাক চোখে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছিল। নাচদুয়ারের ভিতরের গলিতেও দেখা গিয়েছিল দুটি চোখের ভ্রূকুটি-দৃষ্টি, কিন্তু সে চোখ দুটি ছিল দুর্গাপ্রতিমার মতো আয়ত এবং ভ্রূকুটি-দৃষ্টি ছিল রোষকষায়িত। চোখ দুটি যার, সে শশীভূষণের সর্বেশ্বরী। শুধু নামে না, সব দিক থেকেই সে শশীভূষণের সর্বেশ্বরী, তার যুবতী স্ত্রী।

শশীভূষণ তাকাতেই সর্বেশ্বরী অঙ্গুলিসংকেতে তাকে কাছে ডেকেছিল। শশীভূষণ কাছে গিয়েছিল। সর্বেশ্বরী ফোঁস করে উঠেছিল। 'তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? জানো না যেমন শয়তান কেলে মুখুজ্জে, তেমনি গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো! সাপে-নেউলে লড়াই হচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি দাঁত বের করে হাসলে যতো কোপ এসে তোমার ওপর পডবে। যাও, শীগ্‌গির দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসো।'

শশীভূষণ তৎক্ষণাৎ নাচদুয়ারের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। মনে হতে পারে শশীভূষণ স্ত্রৈণ, সুন্দরী স্ত্রীর হুকুমে চলে। আসলে তা না। দিনকালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংসার করতে যে সব কূটকচালি নিয়ে চলতে হয়, শশীভূষণের সে সব সাংসারিক জটিল বুদ্ধি একটু কম। সর্বেশ্বরী অর্থাৎ শশীভূষণ যাকে সর্ব বলে ডাকে, তার সাংসারিক বুদ্ধি ও পরামর্শের প্রয়োজনটা অতএব শশীকে নিতেই হয়।

সর্বেশ্বরী মিথ্যা কিছু বলে নি। কালু মুখজ্জে বা গাঁয়ের পার্টিওয়ালা ছেলেরা, শশীর হাসির অপরাধেই যে কোনরকম নিষ্ঠুর শাস্তি দিতে পারতো। নিষ্ঠুর

সর্বনাশ করতে এরা কেউ কারোর থেকে কম না, যদিও নিজেদের মধ্যে এদের লড়াই লেগেই থাকে।

বাঁদাড়ের ঘটনায় শেষ পর্যন্ত কালু মুখুজ্জেকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছিল। টাকা দিতে হয়েছিল, বাঁশ খড় সবই দিতে হয়েছিল, কিন্তু আবার বিস্ময়কর রকমে ছেলেগুলোর সঙ্গে কালু মুখুজ্জের আঁতাতও হয়েছিল।

শশী কোনোদিন বাঁদাড়ের অংশ নিয়ে তার দাবি জানায় নি। জানালে তাকে ভিটেমাটি ছাড়তে হতো, এটাও তাকে তার সর্ব বুঝিয়ে দিয়েছিল।

সর্বেশ্বরী রূপসী কিন্তু বিয়ের আগে ছিল গরীবের মেয়ে, বিয়ের পর গরীবের বউ। কথায় বলে, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড ঘরনী না পায় ঘর। সর্বেশ্বরী সুন্দরী ও ঘরনী দুই-ই। সে ঘর পায় নি, বর পেয়েছে।

শশী স্ত্রীকে ভালবাসে, স্ত্রীর মর্যাদা বলতে যা বোঝায়, সে-বোধও তার পুরোমাত্রায় আছে। কিন্তু তার অন্তরে যতোটা সাধ, সাধ্য ততো নেই। সংসারে অনেক স্থূল সুখের উপকরণ আছে, যা পাবার জন্য মানুষের হাহাকারের অন্ত নেই। শশী সেই সব কোনো উপকরণ দিয়েই সর্বকে সুখী করতে পারে নি।

এ দুঃখটা তার ভিতরে মোচড দেয়, মুখ ফুটে বলতে পারে না, কারণ সর্ব বিরক্ত হয়, রাগ করে বলে, 'যে সুখ আমার কপালে নেই, তার জন্যে কেন মন গুমরে মরো! তুমি আর তোমার যা আছে তাই নিয়েই আমার শান্তি।'

কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে, মনটা মানতে চায় না। পিতৃপুরুষের ভিটা আর গত দুই বংশের অভাবের চাপে মাত্র দশ বিঘা জমি সম্বল। দশ বিঘা সম্বলটা এমনি কম না, কিন্তু বিধবা দিদি এবং তাঁর তিনটি সন্তানসহ সংসারে দশ বিঘার ফসল কিছুই না। সে জমিও ভাগে দেওয়া, মধ্যস্বত্ব ছাডা উপায় নেই, কারণ তালপুকুরে ঘটি না ডুবুক, একদা নামকরা প্রাচীন বাঁড়ুজ্জে বংশের অধস্তন সন্তান শশীভূষণ আর যাই করুক, নিজের হাতে চাষ-আবাদ করতে পারে না, কখনো শেখেও নি। শিখেছে একটা কাজ, যা শুরু করে গিয়েছিলেন তার নিরুপায় বাবা, পৌরোহিত্য। পৌরোহিত্য পেশার মধ্যেও প্রতিযোগিতা কম নেই, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদির মতো কাজ কমই জোটে। তথাপি পূজা-পার্বণ মিলিয়ে অভাবের মোকাবিলা কিছুটা করা যায়।

কিন্তু সমান সংসারের দিকে তাকিয়ে শশীর কেবল মনে হয়, জীবনের গতির সঙ্গে তার তাল মিলছে না। সকলেই অগ্রগামী, সে-ই পিছনে পড়ে থাকছে। এ সব ভেবে তার মন যে কেবল বিমর্ষ হয় তা না, একটা অশুভ ভাবনা যেন তার

মস্তিষ্কের সীমান্তে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। তার কারণও এই কালু মুখুজ্জে এবং তার মতো ব্যক্তিরা। তাদের কথার মধ্যে প্রায়শই এমন একটি ইঙ্গিত থাকে, সর্বেশ্বরীর মতো স্ত্রী নিয়ে নিরুপদ্রবে ঘর করাটা একটা অবাস্তব রীতিনীতিহীন ব্যাপার। বিশেষতঃ শশীভূষণের মতো লোকের পক্ষে।

শশীভূষণ অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ, কিন্তু সে চরিত্রের দিক থেকে নিরীহ বিরোধিতা এড়িয়ে চলতে চায়। তার যতো কথা সর্বেশ্বরীর সঙ্গে, এবং সর্বেশ্বরী সে-সব কথা শুনলে খিলখিল করে হাসে।

সে হাসি যেন শশীর বুকে ঝড়ের মতো বাজে, সর্বেশ্বরীর উচ্ছ্বসিত রক্তাভ মুখ ও শরীরের অধরা তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সর্বেশ্বরী বলে, যারা ওসব বলে, তারা যেন আমাকে বলে যায়, কোন্ রীতিতে চললে ভালো হয়। না হয় একবার যাচিয়ে দেখবো।' তার পরে শশীর দিকে ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে বলে, 'ওদের কাছে তোমারই বা এতো ভালোমানুষ হয়ে থাকবার দরকার কী? তুমিও সকলের সঙ্গে, দিনকালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে শেখো। মুখ ভার করে থেকে লাভ কী? আমি তো ঠিক করেছি সবাই যেমন, আমিও তেমনি করে তাদের সঙ্গে চলবো, দেখি আমার কী করতে পারে!'

সর্বেশ্বরীর কথায় শশীভূষণ খানিকটা আস্থা পায়। সে জানে, সর্বেশ্বরীকে নিয়ে যে যাই বলুক, তার মুখকে সকলেই কিছু-কিঞ্চিৎ ভয় পায়। সে কারোকেই ছেড়ে কথা বলে না। সর্বেশ্বরীর প্রতি সকলের আকর্ষণ যতো, সমীহও যেন ততো, যা শশীর প্রতি নেই।

* * *

কালু মুখুজ্জের ডাক শুনে শশীভূষণ দাঁড়ালো। পঞ্চায়েত-বাড়ির বেড়ার গায়ে কৃষিঋণ, সার ইত্যাদির ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন ছাড়াও হিন্দী সিনেমার ছবির বিজ্ঞাপনও আছে। শশীভূষণ বললো, 'ভরদুপুর আর কোথায়? যাচ্ছি একটু ছেষট্টি দাগের মাঠে, দেখি গিয়ে জমিতে সার দিল কী না!'

কালু মুখুজ্জে একটি ইতর বাক্যের সঙ্গে বললো, মিছেই এ রোদ মাথায় করে যাচ্ছো, হারামজাদাদের চেনো না! যদি বলে থাকে আজ সার দেবে জমিতে, তবে এক হপ্তা ধরে রাখো। সার কি আগেই কিনে দিয়েছ, না তোমার ভাগের চাষী কিনেছে?'

শশীভূষণ বললো, নিজেই কিনে দিয়েছি।'

কালু মুখুজ্জে বললো, তবেই হয়েছে। তোমার সার সে আগে নিজের জমিতে

দেবে, তার পরে পয়সার যোগাড় হলে সার কিনে তোমার জমিতে দেবে। এত দেখেশুনেও এমন বোকার মতো কাজ করো কেন?'

কালু মুখুজ্জের কথাগুলো একেবারে মিথ্যে না, কিন্তু শশীভূষণ সহজে মানুষকে অবিশ্বাস করতে পারে না। অথচ অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করতে গেলে কালু মুখুজ্জের কথায় বাস্তবতাই বেশী।

সে আবার বললো, 'কেন মিছিমিছি এই রোদ মাথায় করে এখন যাবে। খেয়েদেয়ে বেলা পড়লে যেও, তখন যাচাই করলেই হবে। এসো, দাওয়ায় এসে একটু বসো।'

শশীভূষণের সে ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও নেই, যদিও এই রোদে মাঠে না যাওয়ার পরামর্শটা তার মনে যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। কিন্তু কালু মুখুজ্জে কী প্রসঙ্গ পেড়ে বসবে, সেটাই চিন্তার বিষয়। সে বললো, 'বেরিয়েছি যখন একবার দেখেই আসি।'

কালু মুখুজ্জে বললো, 'মিছিমিছি যাচ্ছো। তা তুমিও কি আজ ইস্টিশনের দিকে যাচ্ছো নাকি?'

শশীভূষণ অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন বলুন তো?'

কালু মুখুজ্জে বললো, 'আজ তো সব পাড়া ঝেঁটিয়ে মেয়ে-মিনসে হিন্দী বায়স্কোপ্ দেখতে যাচ্ছে। বউমা যাচ্ছে না?'

বউমা অর্থাৎ সর্বেশ্বরী। গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে, স্টেশনের কাছে সিনেমা হল। গ্রাম থেকে প্রায়ই সব গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে সেখানে সিনেমা দেখতে যায়। গ্রামের সবাই আজকাল হিন্দী বায়স্কোপ দেখে, বায়স্কোপ-ওয়ালারাও হিন্দী বই বেশী আনে।

সর্বেশ্বরী দু-চারবার যে যায় নি তা না। আজ সর্বেশ্বরীর যাবার কথা নেই, তাই বললো, 'না, আপনার বউমা আজ যাবে না।'

কালু মুখুজ্জে বাঁধানো দাঁতে হেসে বললো, 'শুনলাম এ বায়স্কোপটাতে নাকি মাগীদের অনেক ল্যাংটা কারবার আছে। চলো না, খুড়ো-ভাইপো দেখে আসি।'

শশীভূষণ একটু হেসে বললো, 'আপনি যান, আমি যাবো না।'

কালু মুখুজ্জে হেসে বললো, 'তুমিও যেতে, যদি বউমাটি যেতো। বউকে পাহারা দিতে হবে তো!'

কথাটা একেবারেই মিথ্যা। শশী কখনো বউ পাহারা দেবার জন্য বায়স্কোপ দেখতে যায় নি।

সে জবাব না দিয়ে যেতে উদ্যত হলো। কালু মুখুজ্জে বলে উঠলো, 'শশী, শুনেছো তো, আমাদের গোবরা বাউরি একটা নতুন টানজিটার কিনেছে?'

টানজিটার মানে ট্রানজিস্টার রেডিও। কথাটার মধ্যে একটি বিশেষ ইঙ্গিত এবং খোঁচা—দুই-ই ছিল।

সর্বেশ্বরীর একটি ট্রানজিস্টারের সাধ আছে, কিন্তু মুখ ফুটে কখনো বলে না। তবে মাঝে-মধ্যে সর্বেশ্বরী কালু মুখুজ্জের বাড়িতে ট্রানজিস্টারে নাটক গান শুনতে যায়। শশীভূষণ বাধা দেয় নি, কিন্তু মুখ থমথমিয়ে উঠেছে।

সর্বেশ্বরী তা বুঝতে পারে এবং হাসি দিয়ে হাল্‌কা করে বলে, 'এর জন্য তুমি মুখ ভার করো কেন? আমি মুখুজ্জেবাড়ির মেয়ে-বউদের সঙ্গে বসে গান শুনি, তাতে দোষ কী?'

সর্বেশ্বরী এমন ভাবে বলে, দোষের কথা ভাবা যায় না, তথাপি মনটা কেমন টনটন করে।

পাড়ায় এসব নিয়ে কথা হয়। শশীকে শুনিয়েও অনেকে বলে, 'বউটা শেষে বুড়ো ভামের পাল্লায় পড়লো!'······শশী কান দিতে চায় না, কিন্তু কথাগুলো অন্তরে বিঁধে থাকে।

কালু মুখুজ্জে আবার বললো, 'তুমি কি বলতে চাও, গোবরা ব্যাটা তাড়ি বেচে আর মদ চোলাই করে অমন একটা টানজিটার কিনেছে?'

শশী বললো, 'আমি কিছুই বলছি না কালুকাকা।'

কালু মুখুজ্জে বললো, 'আরে এতে বলাবলির কী আছে? সবাই জানে গোবরার বউ দুবার কোমর দুলিয়ে পাড়া বেড়ালে অমন টানজিটার রোজ একটা করে কিনতে পারে।'

কালু মুখুজ্জে হা-হা করে হেসে উঠলো। শশীভূষণ জানে, পাড়ায় না, কালু মুখুজ্জের উঠোনে বেড়ালেই যথেষ্ট। কিন্তু কিছু না বলে, শশী আর কোনো কথা না শুনে, দ্রুত পুকুরের ধার দিয়ে মন্দিরের পাশ দিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল।

* * *

সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন। শশী গিয়েছিল গরুর ডাক্তারের কাছে, একটু মলম আনবার জন্য। বকনা বাছুরটার কানের কাছে দগদগে ঘা হয়েছে, কিছুতেই সারছে না। বাড়ি এসে সর্বেশ্বরীকে না দেখে দিদিকে জিজ্ঞেস করে জানলো, সে গিয়েছে কালু মুখুজ্জের বাড়ি রেডিওর গান শুনতে। শোনা মাত্র মনটা ক্ষুব্ধ

হতাশায় ভরে উঠলো। আজ ওবেলাই পঞ্চায়েত-বাড়ির সামনে গোবরা বাউরির ট্রানজিস্টার কেনার কথা হচ্ছিল। শশীর মনে মনে একটা ইচ্ছা ছিল, এ বছরের ফসল উঠলেই চোখ-কান বুজে বর্ধমান শহর থেকে একটা ট্রানজিস্টার কিনবে। শ-দেড়েক টাকা দরকার। শশীর কাছে সেটা খুব সহজ ব্যাপার না। কিন্তু এই মুহূর্তে হতাশা ক্ষোভ ও একটা অভিমানাহত ব্যথা তাকে এমন ব্যাকুল করে তুললো, সে স্থির থাকতে পারলো না। বাছুরের গায়ে মলম দিতে ভুলে সে সোজা চলে গেল মুসলমান পাড়ায় নেয়ামতের কাছে।

নেয়ামত ধনী কৃষক, নগদ টাকার অভাব নেই। লোকের প্রয়োজনে জমিজমা বন্ধক রেখে ধার-কর্জ দেয়। ধানজমির দাম এখন অগ্নিমূল্য, কম করে তিন হাজার টাকা বিঘা। শশী তার ছেষট্টি দাগের এক বিঘা জমি বন্ধক রেখে দুশো টাকা ধার করলো। একমাত্র কড়ার, এবারের ফসল উঠলেই টাকাটা শোধ দেবে। কালু মুখুজ্জের থেকে নেয়ামত লোক ভালো না, একটু কম চশমখোর। সামান্য সুদের বিনিময়ে শশীকে টাকা দিল।

শশী বাড়ি গিয়ে খুলে কিছু বললো না। পরের দিন সকালবেলা কাজের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে বর্ধমান পৌঁছুতেই দুপুর। গ্রামের একজনই চেনা লোক সেখানে ছিল, বর্ধমানে মুদির দোকানদারি করে। শশী তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ট্রানজিস্টার রেডিও কিনলো। দোকান থেকেই ট্রানজিস্টারটি পিজবোর্ডের বাক্সে বেঁধেছেঁদে দিল। বস্তুটির দিকে একবার তাকিয়ে শশীর চোখের সামনে সর্বেশ্বরীর মুখ ভেসে উঠলো আর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। খাওয়াটা সারতে হলো হোটেলেই। গ্রামে যখন ফিরলো তখন অন্ধকার নেমেছে। বাঁশঝাড় আর পুকুরপাড়ে ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে।

শশী বাড়িতে এসে ঢুকলো। উঠোনে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে ঝংকৃত বাজনার সঙ্গে গান শোনা যাচ্ছে। কে গান করে!

শশী দাওয়ায় উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। ভিতরে হারিকেন জ্বলছে। সর্বেশ্বরীর গা ধোয়া, শরীরে শাড়ি জামা। মাথায় ঘোমটা নেই, খোঁপা চিকচিক করছে। তাকে ঘিরে বসে আছে দিদির ছেলেমেয়েরা। সর্বেশ্বরীর কোলের সামনে একটি ট্রানজিস্টার। সে তন্ময় হয়ে গান শুনছে, ঠোঁটের কোণে মুগ্ধ হাসি, চোখে যেন স্বপ্নের আবেশ। শশীর পায়ের হয়তো শব্দ হয়ে থাকবে, সর্বেশ্বরী দরজার দিকে তাকালো। শশীকে দেখেই বলে উঠলো, 'কোথায় গেছলে গো? সেই সকালে বেরিয়েছ, এখন ফিরলে?'

শশী যেন সেকথা শুনতে পেলো না, জিজ্ঞেস করলো, ওটা কোথায় পেলে ?'

সর্বেশ্বরী হেসে কালু মুখুজ্জের মতো উচ্চারণে বললো, 'এ টানজিটারটা ? মা গো ! আর বলো না, কালুকাকা কিছুতেই শুনলো না, নিজে বাড়ি বয়ে এসে দিয়ে গেল। বলে গেল, 'বউমা, এটা তোমাকে দিলাম, তোমার জন্যই এটা কিনে এনেছি।'

পরমুহূর্তেই সর্বেশ্বরীর দৃষ্টি পড়ে শশীর হাতের দিকে, জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার হাতে ওটা কী গো ?'

শশী তার দু হাতে ধরা বাকসোটির দিকে একবার তাকালো, তারপরে দাওয়া থেকে নেমে, উঠোন পেরিয়ে বাড়ির বাইরে অন্ধকারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। পিছনে সর্বেশ্বরীর স্বর শোনা গেল, 'কী হলো, আবার কোথায় যাচ্ছ ?'

শশী দূরের মাঠের দিকে তাকালো। মন্দিরের পাশে পুকুরের নিস্তরঙ্গ কালো জলে তারার ঝিকিমিকি। সে ব্যাকুল বা চঞ্চল হলো না। একটা যন্ত্রণা বুকের মধ্যে সাপের মতো নিষ্কুণ্ডল হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এগিয়ে গেল মন্দিরের কাছে, নেমে গেল পুকুরের জলের সামনে। মনে মনে বললো 'সর্ব, তুমি সকলের সঙ্গে সকলের মতন হতে পারো, আমি পারি না। আমি আমার মতোই থাকবো, কিন্তু এ ভার আর সইতে পারি না।'

শশী নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে ছোট যন্ত্রটি জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। তথাপি চোখের সামনে জেগে রইলো সর্বেশ্বরীর প্রতিমার মতো মুখ।

অসহায়

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ কথাটা শোনা ইস্তক কেবলই ভাবছি, নারীঘটিত বিষয়ে নিজের ভূমিকাটি একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

কথাটা নিজের কাছেই কিঞ্চিৎ হেঁয়ালির মত লাগছে। নারী ঘটিত বিষয়ে নজের ভূমিকা, এর আবার ঝালিয়ে নেবার কি আছে? নারী মাতা, নারী ভগ্নী, নারী স্ত্রী, নারী কন্যা—এগুলোর সঙ্গে পর পর সাজিয়ে দিলেই নিজের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমি এসব ভূমিকার কথা ভাবি নি। ঠোঁটের কোণে হাসিটা চেপেই বলছি, এ ভূমিকাগুলো তো নিতান্ত মামুলি। এই সব ভূমিকাই কি সব? ভাবলে নারী জাতিকেই ছোট করে দেখা হয় না কী?

আমার এক অকৃতদার বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। সে ইচ্ছা করেই এতোখানি বয়স অবধি অকৃতদার রয়ে গিয়েছে তা ভাববার কোন কারণ নেই ক্ষেত্রবিশেষে মেয়েদেরই যে কেবল জীবনে বিয়ে ঘটে ওঠে না তা সত্যি না। দেখাশোনা উদ্যোগের অভাবে কতো অকৃতদার পুরুষের দীর্ঘশ্বাসে যে সংসারের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে, সে খবর কে-ই বা রাখছে! আমার এই বন্ধুটির অবস্থা সেই রকম। এখন সে কলকাতার বাইরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজ করছে। বেশ কিছু বৎসর আগে এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়ির আড্ডায় রীতিমতো একটি দার্শনিক প্রশ্ন উঠে পড়েছিল, 'মানুষ কী চায়?'

শিক্ষক বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ বলে উঠেছিল, 'মানুষ চায় মেয়েমানুষ।'

তার পরেই যতো কূটতর্ক শুরু হয়েছিল। অধ্যাপক-পত্নী অধ্যাপিকা নন বটে, বাঙলার সেকেণ্ড ক্লাস এম. এ.। তিনি বলে উঠেছিলেন, 'ল্যাঙ্গুয়েজ প্লিজ! মানুষ বলতে তাহলে তুমি কেবল পুরুষদের বোঝাচ্ছ? মেয়ে-মানুষ মানে কী? পুরুষরা মানুষ, আর আমরা মেয়ে মানুষ?'

শিক্ষক বন্ধুটি করজোড়ে বলেছিল, সে মোটেই তা বলতে চায় নি। তার ভাষাটা অর্বাচীন বটে, আসলে সে বলতে চেয়েছিল পুরুষ কেবল নারী। মানুষের কথাটা বলা তার ভুল হয়েছে।

এ বিষয়েও নানারকম তর্ক উঠেছিল। সে-সব তর্কের কোন শেষ আছে বলে আমার মনে হয় না।

বন্ধুটির সেই অকৃত্রিম উক্তিটি আমার অদ্যাবধি কানে লেগে আছে. 'মানুষ চায় মেয়েমানুষ।' অর্থাৎ 'পুরুষ চায় কেবল নারী।'

কথাটা মনে পড়লেই সেই বন্ধুর মুখটি আমার মনে পড়ে, আর সত্যি বলতে কি, মনটা খুবই ভার হয়ে ওঠে। ল্যাঙ্গুয়েজের আড়াল দিয়ে এরকম খাঁটি সত্য কথা, যা প্রাণ থেকে আপনি বেরিয়ে পড়ে, আজকাল উঠেই যাচ্ছে। কথা বলেও সুখ নেই।

যাই হোক, শিক্ষক বন্ধুটির উক্তি আমি যেভাবে উল্লেখ করলাম, অনেকের মনে হতে পারে, এতে নারীজাতিকে খাটো করা হয়েছে। আমার কিন্তু আদৌ তা মনে হয় নি। বন্ধুটির বিয়ে হলে সে স্ত্রৈণ হতো কী না সে বিচার করে কোন লাভ নেই। সংসারে এতো প্রার্থিত বস্তু থাকতেও যে এক কথায় বলতে পারে, পুরুষ চায় কেবল নারী, তার দূরদৃষ্টির কোন তুলনা নেই। আদতে সে বলতে চেয়েছিল. নারী ছাড়া জীবন নেই। আমি জানি, তথাপি প্রশ্ন উঠবে, পুরুষ যে কেবল নারী চায় সে চাওয়ার উদ্দেশ্য আর ভঙ্গিটা কী তার ব্যাখ্যা দরকার! নারী ছাড়া যে জীবন নেই, সেই জীবনটার অভিসন্ধিই বা কী? তার মানে, সেই ভূমিকার কথাই আসছে।

অন্যদের কথা থাক, আমার নিজের ভূমিকার কথাই ভাবছিলাম। অবিশ্যিই একজন লেখক হিসেবেই আমার ভূমিকার কথাটা মনে হয়েছে। মহিলাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, আমি নাকি নারী-বিদ্বেষী। আবার মহিলাদের কাছেই এর বিপরীত কথা শুনেছি, এমন কি মহিলার সঙ্গে মহিলার তর্কও। যে তর্কে আমার ভূমিকা গৌণ। কিন্তু প্রতিটি কথাই মন দিয়ে শুনেছি, নিজেকে বিচারের জন্য। কখনো বুঝতে পারি নি, আমি সত্যি নারী-বিদ্বেষী বা নারী-পূজারী।

এক এক সময় মনে হয় প্রসঙ্গটা নিতান্তই অর্থহীন। তৈলধর পাত্র না পাত্রধর তৈল, এরকমই একটি বিতর্কিত অর্থহীন প্রসঙ্গ যার কোন শেষ নেই। তার চেয়ে আমি একটা সত্যি ঘটনা বলি। ঝাণ্ডা কাঁধে বীরাঙ্গনাদের আমি বরাবরই শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, কিন্তু এতো ভয় পাই, শনিঠাকুরের মতো তাঁদের আসন বাইরেই রেখেছি। ঝাণ্ডার থেকে ঝাঁটার আমার ভয় যেমন, ভালবাসাও তেমনি। অতএব কবুল করতেই হয় আমি বড় কথার মানুষ না, গৃহাঙ্গনেই আছি।

আমার এক বন্ধু ধরা যাক তার নাম বিরাজমোহন। প্রথম জীবনে সরকারী কর্মচারী, এখন মডার্ন হিস্ট্রির অধ্যাপক।

ও যখন চল্লিশ পার হয়ে গেল, ধরে নিলাম বিয়ে-টিয়ে আর করবে না। একই

কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক হরিনাথ বাবুরবয়স পঞ্চান্ন, তিনিও অকৃতদার। বিরাজ আর হরিনাথবাবু একেবারে হরিহর আত্মা। কলেজে প্রফেসার্স-রুমে দুজনের এক কোণে পাশাপাশি চেয়ার। যতক্ষণ কলেজে, ততক্ষণ দুজনের ছাড়াছাড়ি নেই। কেবল ক্লাস নেওয়া ছাড়া।

একটা কথা মনে রাখতে হবে দুজনের মধ্যে যদি ভূমিকা ভাগাভাগি করতে হয় তাহলে হরিনাথবাবুর ফার্স্ট পার্ট, বিরাজ সেকেণ্ড পার্ট। হরিনাথবাবু বিরাজকে বন্ধু হিসাবে যেমন ভালবাসেন তেমনি স্নেহ করেন। বিরাজ তেমনি হরিনাথবাবুকে শ্রদ্ধাও করে। তা বলে যে দুজনের মধ্যে প্রাণখুলে কথা হয় না তা না। স্নেহ-শ্রদ্ধা বন্ধুত্বের বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

হরিনাথবাবু একলা কখনো চা খান না, ক্যান্টিনের খাবারও খান না। সব সময় দুজনের জন্য খাবার আসে। বিরাজের পয়সা দেবার উপায় নেই, হরিনাথবাবু রীতিমতো ঠোঁট উল্‌টে অভিমান করেন। মনে হয় তাঁর চকচকে টাক বেয়েই হয়তো অশ্রু গড়িয়ে পড়বে।

বিরাজ ক্ষমা-টমা চেয়ে কোনরকমে মানিয়ে নেয়। সেই জন্যই হরিনাথবাবুকে ফার্স্ট পার্ট বলা হয়েছে। কেবল যে কলেজের চা-জল খাবারের ব্যাপারে তা না, সিনেমা থিয়েটার থেকে শুরু করে রিকশা ভাড়া পর্যন্ত বিরাজেব একটি পয়সা খরচ করার উপায় নেই। বিরাজ প্রথম প্রথম অস্বস্তি বোধ করলেও এখন আর করে না। ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে।

বিরাজ আস্তে আস্তে আমাদের অর্থাৎ বিবাহিত বন্ধুদের একেবারেই ত্যাগ করছে। আগে যাও বা বিকেলে সন্ধ্যায় আড্ডা দিতে বাড়ি আসতো, তাও আর আসে না। শুনি হরিনাথবাবুর সঙ্গেই অষ্টপ্রহর কাটে। আমরা সকলে জেনেছি দুজনেরই প্রতিজ্ঞা, কনফার্মড ব্যাচেলর হিসেবেই জীবন কাটিয়ে দেবে।

ভালো। কিন্তু আমাদের ত্যাগ করার কী আছে ?

বোধ হয় সঙ্গদোষের বায়ুর বিরাগে। বিরাজের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হলেও সে এরকম কথাই বলে। 'বউ সংসার ছেলেমেয়ে গুলি মারো।' এটা ওর মুখে প্রায় লেগেই থাকে। 'বেশ ঝাড়া হাত-পা আছি বাবা, ওসব ঝামেলার মধ্যে নেই।' কথায় কথায় একথা বলে।

হরিনাথবাবু সঙ্গে থাকলে ঠোঁট উল্‌টে হেসে বলেন, 'এসব কথা বলতে যাও কেন ? নিজের আনন্দ নিজের মধ্যেই রাখো। আমরা হলাম আলাদা জাত।'

হরিনাথবাবু বিরাজকে অনেক রকম উপদেশ দেন, মাঝে মাঝে বকুনি দেন,

শাসনও করেন। বিরাজ আগে ছিল খুব রসিক ধরনের। কথায় কথায় হাসি-ঠাট্টা মজার গল্প ওর মুখে লেগেই থাকতো। অল্প-স্বল্প শ্ল্যাংও-ওর মুখে ফুটতো সব সময়। ফলে হাসি-ঠাট্টা জমতোই বেশী। কিন্তু হরিনাথবাবু ওকে একেবারে ভদ্রলোক করে ফেলেছেন। একটি শ্ল্যাং শব্দও ওর মুখে আজকাল আর শোনা যায় না।

বিরাজের চেহারা-স্বাস্থ্য ভালো। কিন্তু ওর চুল অকালে পেকে গিয়েছে। কুড়ি-বাইশ থেকেই দেখছি ওর মাথায় পাকা চুল। এখন চল্লিশে তো মাথা প্রায় সাদা।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো, সেলুনের নরসুন্দরের সুন্দর সুন্দর কথা শুনে বিরাজ একবার চুলে কলপ করে ফেললো। বিরাজের মাথার কালো কুচকুচে চুল দেখে হরিনাথবাবু তো ওকে প্রথমে চিনতেই পারেন নি, চিনতে পেরে এমন আঘাত পেলেন একটা ক্লাসও আর নিতে পারলেন না। প্রিন্সিপ্যালকে শরীর খারাপ জানিয়ে বাড়ি চলে গেলেন, বিরাজের সঙ্গে একটি কথাও বললেন না।

বিরাজের অবস্থাও তথৈবচ। ও-ও ক্লাস নিতে পারলো না, কিন্তু নিজের বাড়ি না গিয়ে গেল হরিনাথবাবুর বাড়ি।

ওকে দেখেই হরিনাথবাবু ধুতির কোচা দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন, বললেন, 'জীবনে এমন আঘাত আমাকে আর কেউ দেয় নি।'

বিরাজ শুধু পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলো না, প্রতিজ্ঞা করলো এমন কাজও আর কখনো করবে না। হরিনাথবাবু ওকে ক্ষমা করলেন, কিন্তু আঘাতটা সামলাতে সময় লাগলো। বিরাজের মাথার চুল সাদা হতে যতোদিন সময় লাগলো, আঘাতটা ততোদিনই বেজেছিল।

এই বিরাজ আবার হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো। শীতের ছুটিতে বেড়াতে গেল দিল্লীতে এক আত্মীয়-বাড়িতে। ফিরে এসে যখন দেখা করলো তখন ওর হাতে একটি খামের ওপরে লেখা 'প্রজাপতয়ে নমঃ' এবং হলুদের দাগের চিহ্ন।

বিরাজ বিয়ে করতে চলেছে। অঘটন ঘটেছে দিল্লীতে। কী করে যে ঘটলো ও নিজেও জানে না, কিন্তু মহিলাকে ওর পছন্দ হয়েছে। অতএব, হ্যাঁ।

অতএব তো বোঝাই গেল, এখন হরিনাথবাবু কী বলছেন? বিরাজ গ' উদ্বেগে বললো, 'ওঁকে তো বলতেই পারছি না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'নিমন্ত্রণ করবি না?'

'নিমন্ত্রণ!' বিরাজ বিষম খেয়ে বললো, 'সামনেই যেতে পারছি' লুকিয়ে

বেড়াচ্ছি। উনি শুনলে যে কী করবেন তাই ভাবছি। একটা সাংঘাতিক অঘটন না ঘটে যায়।'

অঘটন ঘটলো। হরিনাথবাবু প্রথমে বিরাজের সঙ্গে কথা বন্ধ করলেন। দেখতে দেখতে শুকিয়ে উঠলেন, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো। তারপরে কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

সত্যি বলতে কি, অনেকের সমবেদনা হরিনাথবাবুর জন্যই বেশী দেখা গেল। বিরাজ কেন এমন প্রতিজ্ঞা করেছিল যা রাখতে পারবে না? আর তার জন্য একটা মানুষের জীবনটাই নষ্ট!

বিরাজের বৌভাতে গিয়ে দেখলুম ওর বউটির বয়স তিরিশ-বত্রিশ হবে। দিল্লীতেই মানুষ। বেশ হাসিখুশী, স্বাস্থ্যবতী আর সহজ। আমি বিরাজকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন কী ঘটলো যে তুই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলি?

বিরাজ অনেক ভেবে বললো, 'আসলে কী জানিস, চন্দ্রার (স্ত্রীর নাম) সঙ্গে আলাপের পর আমি যেন কেমন হয়ে—মানে ভেতরে ভেতরে হেল্প্‌লেস্ হয়ে পড়লাম।'

হেল্প্‌লেস্!

বিরাজ আরো বললো, 'এমন হেল্প্‌লেস্ যে কোনরকমেই নিজেকে হেলপ্ করতে পারলাম না।'

চমৎকার! কথাটার যে কী মানে করবো বুঝতে পারলাম না।

এ ঘটনার বছরখানেক পরে শিলং থেকে ফিরছিলাম। গৌহাটি বিমান বন্দরে আমি অপেক্ষমাণ। লাউঞ্জে বসেছিলাম।

আমার মুখোমুখি একটি দম্পতি বসেছিলেন। ভদ্রলোকের মাথায় ফেল্ট হ্যাট, গলায় টাই এবং স্যুটেড-বুটেড। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হতে পারে। গোঁফদাড়ি কামানো, ঝকঝকে মুখ, চোখে সান-গ্লাস। ভদ্রমহিলাও নানা বর্ণের ছাপা সিল্ক শাড়ি পরা। মাথার সামনের চুল পাতলা হলেও পিছনের খোঁপাটি বিরাট। তাঁর সব কিছুই রীতিমতো আধুনিক। বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশ যাই হোক, ঠোঁটে রঙ মেখেছেন। হাতের দশটি নখই রঙ-মাখা। পায়ে হাইহিলের জুতো, তাঁদের কথাবার্তার ভাষা মিডিয়াম বাঙলা হলেও ইংরেজী শব্দই দশ আনা। যদিও কথা তাঁরা কমই বলছিলেন।

রানওয়ের দিকে তাকিয়ে নীরবেই সময় কাটছিল। তার মধ্যেই কিছু কথা-বার্তা। আমার হাতে বই।

ভদ্রলোক হঠাৎ মাথার টুপি খুলে টাকে হাতে দিয়ে চুলকোতেই চেনা মুখখানি ভেসে উঠলো। হরিনাথবাবু! আমাদের সেই কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক, বিরাজের বন্ধু। আমার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে গেল, 'হরিনাথ-বাবু!'

'ইয়েস!' হরিনাথবাবু ভ্রূকুটি-বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন। চিনতে একটু সময় লাগলো, তারপরে বললেন, 'আরে আপনি রাইটার মশাই! কোথায় চললেন?'

বললাম, 'কলকাতায়।'

কিন্তু আমার দৃষ্টি ঘন ঘন চলে যাচ্ছে পাশের মহিলার দিকে।

হরিনাথবাবু তা লক্ষ্য করলেন, ইংরাজীতে বললেন, 'মীট মাই ওয়াইফ মিসেস চক্রবর্তী।' বলে আমারও পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিসেস চক্রবর্তীর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, আমার কিছু বই পড়া আছে ওঁর, পরিচয় হয়ে ওঁর ভালো লাগলো ইত্যাদি।

কিন্তু আমার বিস্ময়ের সীমা যে আকাশ থেকে পড়ার চেয়েও বেশী। হরিনাথ-বাবু বিবাহিত, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী! পৃথিবীতে এমন অঘটনও ঘটে? এবং তার রহস্যটা কী?

তা জানার কোনো উপায় আছে বলে মনে হলো না।

প্লেন আসতে দেরি করছিল। কথায় কথায় জানা গেল, হরিনাথবাবু এখন শিলং-এ কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং তাঁর স্ত্রীও সেই কলেজেরই লেক্‌চারার।

তা তো বুঝলাম! কিন্তু সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকলো কেমন করে?

জানা গেল সেই রহস্য।

আমি লেভেটরি থেকে বেরোচ্ছি, হরিনাথবাবু ঢুকছেন। অপেক্ষা করলাম তাঁর জন্য। বেরিয়ে আসার পরে বললাম, 'বিরাজের ওপর এখন নিশ্চয়ই আপনার আর রাগ নেই?'

হরিনাথবাবু ভ্রূকুটি-গম্ভীর মুখে বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে। ওর ওপর আমার রাগ কোনদিন যাবে না। ও আমার বুকে শেল হেনেছে।'

তথাপি তিনি বিবাহিত! কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না।

তিনি আবার বললেন, 'হি ইজ এ ট্রেইটর।'

তিনি কি সেই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতেই বিয়ে করেছেন? আমি

হাওয়াটা হালকা করার অভিপ্রায়ে বললাম, 'আপনাদের দুজনকে দেখে বেশ ভালো লাগলো।'

হরিনাথবাবু হেসে বললেন, 'আমাদের—মানে আপনি তন্দ্রার কথা বলছেন ? ওহ্, শী ইজ এ ভেরি গুড-হার্টেড লেডি।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাবতেই পারি নি আপনি আবার কখনো—।'

'বিয়ে করবো!' বাধা দিয়ে হরিনাথবাবু বলে উঠলেন। এবং হেসে উঠে আবার বললেন, 'আমিও কি কখনো ভেবেছি বিয়ে করবো ? কী করে যে হোল বুঝতেই পারলাম না! আই মীন, হোয়েন আই মেট তন্দ্রা—হোয়াট কুড আই সে, সামহাউ আই বিকেম হেল্প্‌লেস্! হ্যাঁ বুঝলেন, হেল্প্‌লেস্—একটা অদ্ভুত ফিলিংস্! আমি ভেতরে ভেতরে কেমন হেল্প্‌লেস হয়ে গেলাম।'

কার কথা শুনছি! বুঝতে পারছি না। হরিনাথবাবুর, না বিরাজের, না কি আমারই ? আসলে অনেক নাটের গুরু হয়েও আমি—আমাদের ভূমিকা কি নারী-ঘটিত বিষয়ে একান্তই অসহায় নয় ?

কথাটা ব্যঙ্গার্থে না, নারী-পুরুষের পরস্পরের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ বা না, দুই-ই বাদ ; বিদ্বেষ এবং পূজাও তাই।

সম্পর্কের মধ্যেই পরস্পর বোধ হয় অসহায়।

জীবিকা

উন্মাদটিকে অনেককাল ধরেই চিনতাম। বদ্ধ উন্মাদ বা ক্ষ্যাপা পাগল বলতে যা বোঝায় এ মানুষটা ঠিক সেইরকম না। ঠিকমতো বলতে গেলে, আমাদের এই ছোটখাটো শিল্পশহরে, বাঙালী অধ্যুষিত এলাকায়, স্টেশন দোকান বাজার অঞ্চলে, অনেক সময়েই যেমন নানা পাগলের দেখা মেলে, আমি যার কথা বলছি, তাকে ঠিক সেই বিভাগেও ফেলা যায় না।

যখন স্টেশনের সামনে আমাদের প্রিয় আড্ডার জায়গাগুলোতে বসে আমরা বন্ধুরা আড্ডা দিই, ডবল হাফের পর ডবল হাফ (চা) চলতে থাকে, তৎসঙ্গে সিগারেটের ভস্মনাশ এবং নানাবিধ আলোচনা, যে সব আলোচনার কোনো নির্ধারিত সীমা নেই বা প্রসঙ্গের কোনো বিধিনিষেধ নেই, কারণ হয়তো লেনিনের রাজনৈতিক চিন্তার থেকে অনায়াসেই ব্যালেরিনা উলিয়ানোভার কথা উঠে পড়তে পারে, কিংবা গান্ধী-দার্শনিকতা থেকে হয়তো কোনো চিত্রনটীর প্রসঙ্গ, অথবা শহরের কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রসঙ্গ থেকে কোনো চটুল মেয়ের চুটকিতে— অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই প্রায় খৈ ভাজার মতো (নেই কাজ তো !), তখন আমাদের চোখের সামনে দিয়ে যেন পাগলের মিছিল চলে যেতে থাকে।

বিষয়টা ভাবার মতো নয় কী ? আমাদের আলোচনার এটাও একটা প্রসঙ্গ, এতো পাগল আসে কোথা থেকে, যায়-ই বা কোথায় ? কারণ এই সব পাগলদের কখনোই বেশি দিন দেখা যায় না।

আমাদের শহরের জংশন স্টেশনটা যেন জীবনেরই একটা প্রতীক। এখানে যে সুস্থ-মস্তিষ্ক যাত্রীরাই কেবল ভিন্ন জায়গায় যাবার জন্য ট্রেন বদল করেন তা নয়, ভাসমান পাগল-সমাজও ভাসতে ভাসতে কিছুদিনের জন্য আমাদের এই শহরে ঘুরে বেড়ায়, তারপরে আবার এক সময়ে উধাও হয়ে যায়। পুরনো মুখের জায়গায় নতুন মুখ দেখা দেয়।

সেই সব পাগল, এবং অবিশ্যিই পাগলীও, তাদের প্রত্যেকের বেশভূষা আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ হয়তো আকাশের দিকে তাকিয়ে অনবরত বিড়বিড় করে, মাঝে মাঝে আঙুল নেড়ে নেড়ে নানা সংকেত করে। যেন গোটা আকাশটাই তার কাছে একটা অঙ্কের খাতা, আর সে নিঃশব্দে জটিল অঙ্ক

নানাভাবে কাটাকুটি করে ফল মেলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সীমাহীন সেই সংখ্যাতত্ত্বের ফল কোনো দিন মিলবে বলে মনে হয় না।

কেউ বা ক্ষ্যাপা কাপালিকের মতো রুক্ষ চুলের গোছা, গায়ে নোংরা মেখে বিকট চোখ-মুখ করে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে শাসিয়ে চলেছে। আর সে সব ভাষারই কী বৈচিত্র্য! খবরের কাগজে তো আপনারা রোজই পড়ছেন, কোন্ অসাধু ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা কর ফাঁকি দিচ্ছে, জনসাধারণকে শুষে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে।

কিন্তু আপনি হয় তো দেখলেন, চোখ-মুখ পাকিয়ে একটা পাগল চিৎকার করে বলে চলেছে, 'ভেবেছ এমনি এমনি পার পাবে? আমার লাখ টাকায় ঘা দিয়েছ, ঠাকুরের দেড়শো ভরি সোনা গায়েব করেছ। শালা তোমার কলজে আমি তেল্-নুন দিয়ে ভেজে খাবো। না না, ছেড়ে দাও, শালাকে আজ দেখে নিচ্ছি। মার শালাকে, মার মার মার।...কে ডাকছে? ওখেনে বেড়ার ফাঁকে কে দাঁড়িয়ে? আমি এসেছি গো, ও মা, আমি এসেছি।'

পাগলের প্রলাপ ছাড়া এসব কিছুই না। যদি সন্দেহ করেন, তা হলে তদন্ত করা যায়।

কথাগুলো শুনলে মনে হয়, এ নিতান্তই হয়তো প্রলাপ নয়। কিন্তু এসব ভেবে কোনো লাভ নেই। কথায় আছে, পাগলে কী না বলে!

ধরুন আপনি অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছেন, হঠাৎ একজন ভদ্রবেশী উদ্‌ভ্রান্ত-চোখ লোক আপনার সম্মুখে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'রমাকে দেখছেন, রমাকে? হঁ্যা হঁ্যা, ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, ফরসা, চোখ-মুখ সুশ্রী, বয়স সাতাশ-আটাশ, দোষের মধ্যে ফিকফিক করে হেসে ওঠে, আর তাই দেখেই লোকেরা যা খুশি তাই ভেবে নেয়। এবার বুঝেছেন তো, কোন্ রমার কথা বলছি?'

আপনি নিশ্চয়ই হকচকিয়ে যাবেন, অবাক চোখে ভদ্রলোকের উদ্বেগ-ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলতে উদ্যত হবেন, 'না তো, এরকম কোনো মহিলাকে—'

কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি সেকথা বলবার সুযোগ পাবেন না, তার আগেই দেখবেন, সেই উদ্বেগ-ব্যাকুল মুখ আর চোখ তীব্র সন্দেহে কঠিন হয়ে উঠেছে আর চিৎকার করে বলছে, 'তবে রে স্কাউণ্ড্রেল, মনে করেছ ওরকম চাঁদপানা মুখ করে থাকলেই হবে? সিম্পলি আই উইল চেঞ্জ দ্য জুয়োগ্রাফি অব য়োর ফেস!'

কি রকম বুঝলেন ? অ্যান্টি-ক্লাইমেকস্ !

না, লোকটি আপনার মুখের ভৌগোলিক আকারের কোনো পরিবর্তন করবে না, কেবল তর্জনী তুলে এই বলে শাসিয়ে চলে যাবে, 'ওয়েইট্, আই উইল গিভ য়ু ত্থ লেসন।'...

আপনি হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, আশেপাশের লোকেরা আপনার দিকে তাকিয়ে হাসছে এবং বুঝতে পারলেন, আপনি একটি পাগলের পাল্লায় পড়েছিলেন।

পাগলদের এরকম বিবরণ দিতে গেলে, তার শেষ পাওয়া কঠিন। তা হলে একটা পাগলের মহাভারত লিখতে হয়। কিন্তু আমার পক্ষে কোনোদিনই সেরকম একটি মহাপাগল বেদব্যাস হওয়া সম্ভব না। পাগল নিয়ে কেউ যদি কখনো রিসার্চ করেন, সেকথা নিশ্চয়ই আলাদা। রিসার্চ যে করা হচ্ছে না, তাও আমি বলছি না। মনোবিকলনের নানা চর্চাই তো হচ্ছে।

সেরকম কোনো পাণ্ডিত্যের বিষয়ে আলোচনায় আমার অভিরুচি নেই। কারণ আমার অযোগ্যতা। গাইয়ে বকিয়ে হাসকুটে ক্রুদ্ধ পাহাড়ের মতোই শুদ্ধ নির্বাক শান্ত গম্ভীর কামুক নানা শ্রেণীর পাগল আমরা সকলেই দেখে থাকি। এমন কি অতি ত্যাঁদড় হাড়ে হারামজাদা পাগলের সাক্ষাৎও অনেক সময়েই পাওয়া যায়।

এরকম একটি পাগলের কথা কলকাতার একটি সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমি একবার লিখেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার জন্য অশ্রুপাত না করে পারা যায় নি। তার মৃত্যুর পরে আমার মনে হয়েছিল, আমাদের মফঃস্বল শহরের সমাজ-চরিত্রের একটা স্থান চিরকালের জন্য শূন্য হয়ে গেল, যা আর কোনোদিনই পূর্ণ হবে না। হয় নি।

আপাততঃ এসব ভূমিকা থাক। আমি যে পাগলটির কথা বলতে চাইছিলাম, তার কথাই বলা যাক।

আমাদের পাড়ার কাছেই। এক নামকরা ডাক্তারের বাড়িতে একটি পাগলকে রোজই প্রায় দেখতে পাই। পাগলটির সঙ্গে ডাক্তার পরিবারের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁদের বিরাট বাড়ি। ভিতর বাড়ি, বাইরের বাড়ি, ডিসপেন্সারি, গ্যারেজ সব মিলিয়ে এতো জায়গা, পাগলটির পক্ষে এক কোণে পড়ে থাকার কোনো অসুবিধা নেই।

অন্যান্য বিষয় বলার আগে পাগলটির চেহারার বর্ণনাটা দেওয়া যাক।

নাতিদীর্ঘ বলিষ্ঠ তার গড়ন, শক্ত পেটানো পেশীবহুল চেহারা। বয়স তার কতো, অনুমান করা কঠিন। মাথার চুলে পাক ধরেছে অনেক দিন। শক্ত চৌকো মুখে বেশ কিছু ভাঁজ পড়েছে। কপাল বেশ চওড়া, ভুরুতে বিশেষ চুল নেই, চোখ দুটো ছোট, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সব সময়েই প্রায় ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। খড়্গনাসা এবং তার চিবুকে একটি ভাঁজ আছে। এক এক সময় মনে হয়, তার বয়স চল্লিশ হতে পারে, কখনো মনে হয় ষাট হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র না।

কমপক্ষে দশ-বারো বছরের ওপর তাকে দেখছি, চেহারার পরিবর্তন বিশেষ দেখি নি। কখনো হয়তো মাথা ভরতি চুল জমে ঘাড় বেয়ে নামে। তারপরেই আবার দেখা যায় একেবারে কদম ছাঁট। চুল কাটা বোধ হয় ষান্মাসিক ব্যবস্থা। গোঁফদাড়ি এক সপ্তাহ থেকে পক্ষকালের মধ্যে। অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ বাদ দিলে, বছরের ন'মাসের পোশাক ছেঁড়া-ঝুলি। বেঢপ বেমাপের বিবর্ণ ফুল প্যাণ্ট আর বহু ছিদ্রবিশিষ্ট গেঞ্জি। শীতের সময় মোটা, বহু সেলাই তাপ্‌পী মারা একটি হাফশার্ট। তার কোনো নাম আছে কী না আমি জানি না, শুনি নি কখনো। পাগলা বলেই তাকে লোকে ডাকে। অথবা শুধুই পাগল। এটা হলো বাড়ির লোকের ডাক।

বাইরে লোকেরা ওকে নানা নামে ডাকে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'লাট'। এই ডাকের মধ্যে তার আবরণের কিছুটা মিল আছে, যারা ডাকে তাদের কিছু কৃপাও আছে। আর একটি নাম 'গরু চোর'। কী করে এই নামের উৎপত্তি, আমি তার কোনো হদিস জানি না। পাড়ার ছোট ছেলেরা যখন তার পিছনে লাগে, তখন চিৎকার করে তারা এই নামে ডাকে, আর লাগাতার চেঁচাতে থাকে। তখন কেবল, 'গরু চোর' না, 'আলু চোর' 'পটল চোর' 'বেগুন চোর' 'ঝিঙে চোর' নানান কিছু শোনা যেতে থাকে।

পাগলের চেহারা তখন হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। দাঁতে দাঁত চেপে মুখটা কংক্রিটের মতো শক্ত করে, ক্ষ্যাপা মহিষের মতো তেড়ে আসে। হুংকারে আশেপাশের বাড়ির দরজা-জানালা কেঁপে ওঠে। রাস্তার কুকুরটা পর্যন্ত ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু যে সব কুচোকাঁচাগুলো তার পিছনে লাগে, সেগুলো অমিত সাহসী বিচ্ছুর দল। তাড়া খেয়ে ওরা পিঠ্‌টান দেয় বটে, একেবারে চলে যায় না। বরং ওদের মজার সমুদ্রে জোয়ার লাগে। ওরা আরো চেঁচাতে থাকে। কেবল যে চেঁচায় তা নয়, রাস্তার থেকে ইঁট-পাটকেল নিয়ে ছুঁড়তে থাকে। তাও বেশ

মোক্ষম। পাগলের গায়ে মাথায় লাগে। সেও তখন থান ইঁট নিয়ে তাড়া করে। কোনো সন্দেহ নেই, সেই থান ইঁট যদি কচি কাঁচাগুলোর মাথায় কোনো দিন পড়ে, আর রক্ষে নেই। একটা খুনোখুনি ব্যাপার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভরসার কথা, পাগলের হাত থেকে কোনো দিনই থান ইঁট ছুটে আসে নি, কারোর মাথাও ফাটে নি। সে কেবল প্রাণ-চমকানো হুংকার দিতে থাকে। আর হুংকার দিতে দিতেই গেট দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়।

পাগলের আচরণ এমনিতে খুব একটা ক্ষ্যাপাটে নয়, তবে রোখাচোখা। হয়তো বাড়ির গিন্নী ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'ও বাবা পাগল, বেচনকে একবারটি ডেকে দে!'

পাগল খিঁচিয়েমিচিয়ে বলে ওঠে, 'বেচন কে, আমি তা জানি না।'

গিন্নীও তখন ধমকিয়ে বলেন, 'মুখপোড়া, বেচন কে তুই জানিস না? ড্রাইভারকে ডাকতে বলছি!'

পাগল তেমনি মেজাজ নিয়েই বলে, 'সে কথা বললেই হয়।' বলে বকবক করতে করতে চলে যায়, 'বেচন! ব্যাটা আর নাম খুঁজে পায় নি। বেচন! ড্রাইভার বললেই তো হয়। বেচন আবার কিসের নাম?'

এরকম উত্তেজিতভাবে বকবক তাকে প্রায়ই করতে দেখা যায়, যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

হয়তো গেটটা বন্ধ, স্বয়ং ডাক্তারবাবু গাড়ি নিয়ে এগিয়ে এসে পাগলকে দেখে বললেন, 'এই, গেটটা খুলে দে তো!'

পাগল বলে উঠলো, 'কেন, এখন আবার গেট খোলার কী দরকার?'

অবস্থাটা অনুমান করতে পারেন!

ডাক্তারবাবু খাপ্পা হয়ে চিৎকার করেন, 'হারামজাদা, কেন গেট খুলতে হবে, সে কৈফিয়ৎ কী তোকে দিতে হবে? খোল্ আগে!'

ততোক্ষণে কিন্তু দরজা খোলা হয়ে গিয়েছে। গাড়ি বেরিয়ে গেলেই পাগলের বিড়বিড় শুরু হয়ে যায়, 'খালি গাড়ি চড়ে বেড়ানো, আর গেট খোল্ গেট খোল্! খুলব না, দেখি আমাকে কে কী করতে পারে? আমার খুশি আমি খুলব না।'

নিতান্তই পাগলের প্রলাপ।

ডাক্তারবাড়ি যে পাগলের এই পাগলামি মেনে নিয়েছে তার প্রমাণ, আশ্রয় আর খাওয়া। তার পরিবর্তে এমন না যে পাগলকে বিশেষ কোনো দায়িত্বের কাজকর্ম করতে হয়। পাগলকে দিয়ে তা সম্ভব না, কেউ তা আশাও করে না।

ধরে নেওয়া যায় করুণাবশতই পাগলকে তাঁরা আশ্রয় দিয়েছেন, দুবেলা খেতেও দেন।

কিন্তু আমি লক্ষ করেছি, পাগলটি একটু মুডিও আছে। বিড়ি সে প্রায় সব সময়েই টানে। তার চোর দুর্নাম কখনো শুনি নি।

তা হলে ধরে নিতে হয়, কিছু পয়সাও সে পায়। বিড়ি নিশ্চয়ই দোকানদারের কাছে চেয়ে পায় না। আমি দেখেছি, বিড়ি টানতে টানতে সে কখনো কখনো যেন গভীর কোনো চিন্তায় নিমগ্ন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কী যেন ভাবে! যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গিয়েছে, এরকম একটি ভাব।

তখন আমাকেও ভাবনায় পেয়ে বসে, এমন গভীরভাবে সে কী চিন্তা করতে পারে? তার কি বিশেষ কোনো অতীত আছে? সে-সব কি তার মনে আছে? সে কি সে-সব ভাবে? কী অতীত তার থাকতে পারে?

আমারই পাগল হওয়ার অবস্থা। কারণ একজন পাগলকে নিয়ে এসব ভাবার কোনো মানেই হয় না। পাগল পাগলই। তার ভাবনা-চিন্তাও একটা পাগলামি। কিন্তু মাঝে মাঝে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী খোঁজে? এমনভাবে মুখ তুলে নিরীক্ষণ করে, যেন সে অন্য কোনো গ্রহের জীবদের দেখতে পেয়েছে, এমনই অনুসন্ধিৎসা তার চোখে। তারপরেই হয়তো দেখা যায়, সে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে।

লক্ষণীয় একটা বিষয়, সে মাঝে মাঝে ভীষণ ক্ষেপে যায়। কারোকে ক্ষ্যাপাতে হয় না। সে নিজে-নিজেই ক্ষেপে গিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। যেন সে দারুণ আক্রোশে কারোকে শাসায় বা ধমকায়। মুখ বিকৃত করে দাঁত খিচোয়, পাড়ার কচিকাঁচারা তার এই ক্ষ্যাপামির সুযোগ নেয়।

দেখছি সে নিজে থেকে যখন ক্ষেপে যায় বা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, যা অনেকটা দার্শনিকের মতোই, তখন কেউ কিছু বললেও সে খেয়াল করে না। এমন কি দু'একটা ঢিল-পাটকেল ছুঁড়লেও সে কিছু বলে না। সে যেন টেরই পায় না।

কেন আমি এই পাগলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম, এবার সে কথাতেই আসা যাক। সম্ভবতঃ আমারও এটা এক ধরনের মানসিক গোলযোগ বা পাগলামি। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, একটা পাগলকে ভয় পাবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে আমার বিশ্বাস, পাগলদের বোধ হয় সকলেই কম-বেশি ভয় পান। আমি একটু বেশি পাই। এই পাগলটিকে আমি ভয় পাই। বিশেষ করে

তার ক্ষ্যাপা মূর্তির তো কথাই নেই, এমনিতেও তাকে আমি ভয় পাই। তার চাউনি ভঙ্গি সবই এমন রোখ-পাক করা, ভয় হয় ঠাঁই করে সে হয়তো আমাকে একটা ঘুষি কষিয়ে দেবে বা হয়তো একটা থান ইট ছুঁড়ে মারবে।

অনেকদিন এমন হয়েছে, হয়তো নিঝুম দুপুরে বা একটু বেশি রাত্রে একলা বাড়ি ফিরছি আর পাগলটাকে দেখতে পেলাম পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বা সামনে কোনো রকে বসে আছে, আমার পা আর উঠতে চায় না। আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ি, তারপর আস্তে আস্তে পেছনে হাঁটা দিই। কী লজ্জার কথা!

একজন সঙ্গী না জোটা পর্যন্ত আমি একলা নির্জনে সেই পাগলের সামনে দিয়ে যেতে পারি না। মনে হয়, চোখ পড়লেই সে ভল্লুকের মতো আমার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আর চোখ ঠিক পড়বেই। ভয়ের মনস্তত্ত্বটাই এই রকম। কিন্তু আমার এই ভয়ের কথাটা কারোকে মুখ ফুটে কখনো বলতে পারি নি। নিজেরই লজ্জা করে।

এক বর্ষার রাত্রে আড্ডা দিয়ে ফিরতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। দেরি মানে রাত্রি এগারোটা বেজে গিয়েছিল।

সারাদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছিল। ইলশেগুঁড়ির ছাট, তার সঙ্গে পুবে বাতাসের ঝাপ্টা। রাত্রেও তার কামাই ছিল না। এমন দুর্যোগে আমি একটা ছাতা পর্যন্ত নিয়ে বেরোয় নি।

সন্ধেবেলায় একটু ধরল দেখে আশা করেছিলাম, রাত্রের দিকে বৃষ্টি থেমে যাবে। কিন্তু থেমে যাওয়া তো দূরের কথা, আরো যেন বাড়ছিল। লোকজন বা সাইকেল-রিকশা খুব কম চলছিল। রাস্তার কুকুর পর্যন্ত এমন দুর্যোগে বাইরে থাকতে চায় না, মানুষ কোন্ ছার। একমাত্র আমার মতো আড্ডাধারী জীবের পক্ষেই এসব সম্ভব।

আমি হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলাম। কলকাতা শহর না, রাস্তার আলোগুলো এমনিতেই টিমটিমে। তার ওপরে অনেকগুলো আলো জ্বলছিল না। বৃষ্টির রাতের রাস্তাটা রীতিমতো ভৌতিক মনে হচ্ছিল। আমার তখন একটিমাত্র চিন্তা, সেই পাগল! কিন্তু বাড়ি তো ফিরতেই হবে।

এই কথা ভাবতে ভাবতেই চলছিলাম। টের পাচ্ছিলাম, আমার পিছনে পিছনেই আরো কেউ আসছে। একবার তাকিয়েও দেখেছি, সারা মাথায় গায়ে

চটের মতো জড়িয়ে কেউ আসছে। কোনো গরীব শ্রমজীবী কোনো মানুষ হবে, ধরেই নিয়েছিলাম।

বড় রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে যখন আমাদের গলির মোড়ে এলাম লক্ষ্য করলাম, সেই পাগল কোথাও আছে কী না! সেই অবকাশে আমার পিছনের লোকটিও আমার পাশ দিয়ে গলিতে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। মাথার থেকে চটের ঢাকনা সরিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমার বুকে ধক্ করে উঠলো না কেবল, মনে হলো আমি মারা গিয়েছি। চটের ঢাকা দিয়ে সেই পাগল আমার সামনে। মনে হলো সাক্ষাৎ যমদূত আমাকে পিছন থেকে অনুসরণ করে আসছে।

আমার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে পিছন ফিরে ঝেড়ে দৌড় দেবার জন্য প্রস্তুত হলাম। আর সেই মুহূর্তেই শুনতে পেলাম, অতি বিনীত ভদ্র অমায়িক ভাষণ, 'আহা, একেবারে ভিজে গেছেন যে! এরকম বর্ষায় একটা ছাতাও নিয়ে বেরোন নি?'

অবাক যেমন হলাম, ভয় তার চেয়ে আরো বেশী পেলাম। পাগল এরকম অভাবিত কথা বলে! নিশ্চয়ই এটা ভৌতিক ব্যাপার, অথবা মারাত্মক কিছু ঘটতে চলেছে। প্রদীপ নিভে যাবার আগে যেমন একবার দপ করে জ্বলে ওঠে, এই ভদ্র অমায়িক মিষ্ট ভাষণ হয়তো তাই। আমি কোনো জবাবই দিতে পারলাম না।

পাগল যে কোনো সুস্থ-মস্তিষ্কের থেকেও সুস্থ ভাবে, সুস্থ ভদ্রলোকের মতো ভাষায় আবার বললো, 'খুবই অবাক হয়েছেন, বুঝতে পারছি। আপনাকে আমি চিনি। এভাবে জলে ভিজে অসুখ-বিসুখ করবেন না। আপনাদের জীবনের দাম আছে।'

আমার মাথা ভালো থাকবার কথা না, সত্যি খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। অবাক ভয় সব কিছুর স্তর আমি তখন অতিক্রম করে গিয়েছি। কিন্তু কথা? আমার স্বর বলে কিছু ছিল না।

পাগল দু পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো। তার সেই বিকট মুখে একটি করুণ বিব্রত হাসি। বললো, 'আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বললাম, এ কথা কাউকে বলবেন না। পাগল হয়ে আছি, সব হারিয়ে তবু দুটি খেয়ে বেঁচে আছি। একটা জীবিকাই বলতে পারেন। আমি জানি, আপনি কাউকে বলবেন না। চলি। আপনি আর বৃষ্টিতে ভিজবেন না।'

বলে সে মোড়ের আলোয় বিশাল ছায়া ফেলে দ্রুত চলে গেল। আমি ভূতগ্রস্তের মতো বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাগল অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু আমি কি সত্যি ব্যাপারটা দেখলাম? কথাগুলো শুনলাম? বিশ্বাস করতে পারছি না।

হঠাৎ একটা বাতাসের ঝাপটায় আমি শীতে কেঁপে উঠলাম। আর আমার কানে বেজে উঠলো, 'আপনি আর বৃষ্টিতে ভিজবেন না।'

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম।

তার পরেও আজ পর্যন্ত সেই পাগলকে দেখি। তার উন্মাদ চোখের দৃষ্টিতে আমাকে চিনতে পারার কোনো লক্ষণ কখনো দেখি না, অথচ তার সেই কথাগুলো আমি কখনো ভুলতে পারি না, 'একটা জীবিকাই বলতে পারেন।...'

আমি আজকাল আর তাকে ভয় পাই না। আমি তার কথা কখনো কারোকে বলি নি। আমার মনে বহু জিজ্ঞাসা আর কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও তাকে আমি যেচে কখনো কিছু জিজ্ঞাসাও করি নি। কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট মোচড় দিয়ে ওঠে। মানুষ—হ্যাঁ, মানুষ যে কতো ভাবে বাঁচে!

কলম্বাস বা কুকের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু ব্যাপারটা নিতান্তই হাস্যকর শোনাবে, অতএব সেদিক দিয়ে বিশেষ সুবিধা হবে না।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনাটা অনেকখানি খেটে যায়। অবিশ্যিই তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্গে তুলনা আদৌ করতে চাই না। সম্রাট হবার কোনো বাসনা আমার নেই।

যোগ্যতা থাকলে তো বাসনার প্রশ্ন ওঠে। বরং দীন কাঙাল হরিনাথের মতো কিছু গান গেয়ে যেতে পারলেই সার্থক মনে করবো।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, অপরদিকে সাহিত্যসম্রাট। আমি ওসবের ধারেকাছে নেই। কিন্তু আমার একটি জিজ্ঞাসা মনকে খুবই উতলা করে। তিনি কি সত্যি কপালকুণ্ডলা নাম্নী কোনো তরুণীকে বনমধ্যে দেখেছিলেন? না কি কপালকুণ্ডলা একান্তই তাঁর কল্পনার প্রতিমা?

কাঁথি শহরের এক প্রান্তে আমি কপালকুণ্ডলার মন্দির এবং প্রতিমা দর্শন করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় যে কাঁথি বা ইংরেজী উচ্চারণের কণ্টাই শহরটি ছিল, নিশ্চয়ই তা অনেক ছোট ছিল। সেই হিসাবে তৎকালীন কাঁথি মহকুমা শহর থেকে কপালকুণ্ডলার মন্দির নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা দূরে গ্রামে ছিল। সেখানকার গ্রামীণ পরিবেশটা এখনো যায় নি, যদিও নতুন শহর সেইদিকেও ছড়িয়েছে। সেই মন্দিরের দেওয়ালে, শ্বেত-পাথরের ফলকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিতির কথা লিখিত আছে।

এখানে একটি কথা না বলে পারছি না। আমি প্রত্নতত্ত্বের লোক নই, অনুসন্ধানীও বলা চলে না। কিন্তু একটা শুধু জিজ্ঞাসা আমার থেকেই গিয়েছে। আমি প্রথম যখন কপালকুণ্ডলার মন্দিরে গিয়েছিলাম, তখন প্রতিমার রূপ দেখেছিলাম একরকম। সেই মূর্তি ছিল রক্তস্তনী। পাশেই কয়েকটি খড়্গ ঝোলানো ছিল, পুরনো আর জীর্ণ, ধারগুলো মরচে পড়া। মন্দিরের পূজারীর মুখে শুনেছিলাম, ওখানে যে পশুবলি হয় খড়্গগুলো তারই।

কপালকুণ্ডলা মন্দিরের পূজারীর একটি প্রথা, যে খড়্গ দিয়ে বলি হয়, তার রক্ত কখনো খড়্গের গা থেকে জল দিয়ে ধোয়া হতো না। রক্ত খড়্গের গায়েই লেগে থাকার দরুন একটি খড়্গ দিয়ে বেশি দিন বলির কাজ চালানো যেতো না। সেইজন্যই অনেক খড়্গ জমে যেতো।

মন্দিরের পিছনে একটি বড জলাশয় আছে। আশেপাশে বেশ কিছু জমিও। সেখানে শবদাহ করা হয়, তার চিহ্নসকলও আছে। বক্রেশ্বর বা তারাপীঠের মতো মহাশ্মশানের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

কয়েক বছর পরে আবার যখন যাই, দেখলাম কপালকুণ্ডলা আর রক্তস্তনী নেই, মাটির প্রতিমাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। খড়্গগুলো নেই, ইতিমধ্যে পূজারী পুরোহিতেরও পরিবর্তন হয়েছিল। জিজ্ঞেস করতে সে আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, এই মূর্তিই ছিল, যা আদৌ সত্যি না। খড়্গগুলো যে কোনকালে ছিল, তা-ই সে বলতে পারলো না। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই আমাকে ফিরতে হয়েছিল।

যাই হোক, সংবাদপত্রের চিঠির মতো আমি কোন বক্তব্য এখানে তুলতে বসি নি। কপালকুণ্ডলা এবং তার মন্দির, এবং বঙ্কিমচন্দ্রই আপাততঃ আমার জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলের বিষয়। আমি জিজ্ঞাসু মনে ভাবি, বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই মন্দির দর্শনে এসেছিলেন (নিশ্চয়ই ঘোড়ার পিঠে চেপে!) তখন কি এর চারপাশে গভীর বন ছিল? সমুদ্র কি ছিল খুবই নিকটে, যার উত্তুঙ্গ ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার গর্জন শোনা যেতো?

আশ্চর্যের কিছুই না। স্থানীয় মৃত্তিকায় আমি বালির স্তর দেখেছি। আশেপাশে যে সব গাছপালা রয়েছে, নারকেল গাছসহ সবই প্রায় সামুদ্রিক অঞ্চলের। কাঁথি থেকে সমুদ্র যে এখন খুব বেশি দূর সরে গিয়েছে তাও নয়। সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কপালকুণ্ডলার মন্দিরের বাস্তবতা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই অভিভূত হয়েছিলেন, এবং কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনার কল্পনা, সেই মুহূর্তেই হয়তো তাঁর ধ্যানে ঝিলিক হেনেছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী দেখে? কপালকুণ্ডলার মতো তরুণী কি তাঁর চোখে পড়েছিল? কাপালিকের মতো কোনো তান্ত্রিক যোগীকে তিনি কপালকুণ্ডলা মন্দিরে বা তার আশেপাশের বনের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন? নাকি সে-সবই তাঁর কল্পনা, প্রতিভার দ্বারা রচিত? এসব প্রশ্ন আমার মনকে চঞ্চল করেছিল। মনে হয়, এর জন্য বর্তমান কালের একজন সাহিত্যিক হওয়ার প্রয়োজন হয় না, যে-কোনো মানুষের মনকেই এসব জিজ্ঞাসা কৌতূহলিত ও চঞ্চল করতে পারে।

এসবই হলো, আমার নিজের কপালকুণ্ডলার ভূমিকা। কপালকুণ্ডলা, উনিশশো আটষট্টি। কথাটা এভাবেই আমাকে বলতে হয়। উনিশশো আটষট্টি থেকে এটাই বোঝাবার চেষ্টা করছি, ঘটনাটা সেই সালের।

আমরা কয়েকজন বন্ধু সেই সালের শীতের সময় একটি বড নৌকায় সুন্দরবন ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। যাত্রা করেছিলাম মোল্লাখালি থেকে। খুব বিশদ বর্ণনায় আমি যাবো না, কারণ আপাততঃ আমি কোনো ভ্রমণকাহিনী লিখতে বসি নি। কলকাতা থেকে বিশেষ যোগাযোগে আগে থেকেই আমাদের একটি বড় নৌকার ব্যবস্থা করা ছিল। এক্ষেত্রে লঞ্চে যাবার আমি ছিলাম ঘোরতর বিরোধী। লঞ্চের মোটরের যান্ত্রিক শব্দটাই আমার কাছে বিরক্তিকর। সমুদ্র নদী আর বনকে চকিত চমকে জাগিয়ে দিয়ে দাপিয়ে বেড়াবার পক্ষপাতী আমি মোটেই ছিলাম না।

নৌকাটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। বড় না বলে সেটাকে বিরাট আখ্যা দেওয়া ভালো। আমাদের শোবার বিছানা পাতার ভালো পরিসর ছিল। রান্নার জায়গাও অনেকখানি। মস্ত বড় বড় দুটো জলের জালা উঠেছিল। কেননা নোনা জলের অকূলে ভাসতে হলে, মিষ্টি পানীয় জলের ব্যবস্থা যথেষ্ট রাখতেই হয়। দশ দিনের খাদ্য তুলে নিয়েছিলাম। প্রধানতঃ চাল ডাল নুন লঙ্কা তেল ইত্যাদি। চিড়ে-মুড়ি যতোটা সম্ভব আনাজপাতি আর মিষ্টি। প্রধান মাঝিটিকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। শক্ত স্বাস্থ্যবান অভিজ্ঞ, কিন্তু অল্প বয়সের পুরুষ। মাথায় বড় বড় চুল। সে ভক্ত মানুষ, ভালো গান জানে। সে ছাড়া আরো দুজন যুবক শক্তিশালী মাঝিও তার সঙ্গী ছিল। প্রধান মাঝির নাম সত্য সাঁই।

দয়া করে এর থেকে কেউ ধরে নেবেন না, সাঁইবাবা নামক সাধক সিদ্ধপুরুষের বিষয়ে কিছু বলছি। মাঝি তার এই নামটিই বলেছিল। সে একদা সাঁইদার ছিল। তারও আগে ছিল মৌলি—অর্থাৎ যারা সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনের বাঘকে সে নিতান্ত বাঘ মনে করে না, দেবতা মনে করে এবং তাকে বশ কবার মন্ত্রতন্ত্রও তার জানা আছে। বাঘ ভূত ডাকাত সুন্দরবনের জলে ডাঙায় এই ত্রিবিধ জীবদেরই একমাত্র ভয়। এসব নিতান্ত ছেলেভুলানো গল্প নয়, সত্য সাঁইদের আন্তরিক বিশ্বাস। ভূত যতোই অবায়বীয় হোক, অতি বাস্তব সত্য। সত্য সাঁই সে-সব ভূতদের বন্ধন আর মুক্তির মন্ত্রও জানে। এসবই হচ্ছে একজন খাঁটি সাঁইদারের লক্ষণ। কারণ সে নেতা। মাঝিদের জীবনের দায়দায়িত্ব সবই

তার। সুন্দরবনের গভীরে সাপল্ খাড়ি এবং অকূলে সর্বত্রই মাঝিদের মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায়। মাঝিরা নিশি পাওয়া আচ্ছন্নের মতোই সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের অজ্ঞাতে চলে যায়। আর কখনো ফিরে আসে না।

সাঁইদারের কাজ সেই সব অদৃশ্য দুরাত্মাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখা এবং তাকে বিতাড়িত করা, অথবা তুষ্ট করে ফিরিয়ে দেওয়া। বনবিবি প্রধানতঃ ব্যাধির দেবী। অসুখের মধ্যে আমাশয়, কলেরা, আর ঘা পাঁচড়া। বনবিবির পূজা এক্ষেত্রে অতি আবশ্যিক। আর দক্ষিণরায় হলেন ব্যাঘ্রদেবতা। অর্থাৎ দক্ষিণেররাজা।

সত্য সাঁইয়ের গল্পের ভাণ্ডার এতোই ঐশ্বর্যপূর্ণ, আমি তার কাছে একান্ত গরীব। ধরে নিতে হবে, এই যাত্রায়, সে-ই আমাদের রক্ষক এবং নেতা। আমরা তা সর্বাংশে মেনেও নিয়েছিলাম।

এবার কপালকুণ্ডলার কথায় আসা যাক।

যাত্রা করবার তৃতীয় দিনে সাত জেলিয়াতে আমরা স্নান করবার সুযোগ নিয়েছিলাম। সাত জেলিয়ার হাটের ধারেই টিউবওয়েল ছিল। শীতের দিন হলেও আমাদের প্রতিটি রোমকূপ একটু মিষ্টি জলে স্নান করার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। মলমূত্র ত্যাগের জন্য আমাদের সব সময়ই বিপজ্জনক ব্যবস্থা নিতে হতো। বিপজ্জনক এই কারণে, আমরা মাঝিদের পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিলাম না।

নৌকার ধার থেকে একটি দড়ি আর বাঁশের ঝোলানো মই নেমে গিয়েছে জলের গায়ে। সেই মই বেয়ে নিচে নেমে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা। বিপজ্জনক বলার কারণ এই না যে সাঁতার না-জানা। সাঁতার আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সুন্দরবনের নদী নালায় কেউ নামে না, স্নান তো দূরের কথা। জলে নেমে জল শৌচের কথাও কেউ ভাবে না। সেটা যে কেবল জল লবণাক্ত বলেই তা না। কুমীর কামটের ভয়। কুমীরের থেকেও স্থানীয় লোকের ভয় কামটকে। কামট হাঙর শ্রেণীর এক জাতীয় হিংস্র জলজন্তু। হাঙরের মতোই অতি তীক্ষ্ণ দুই পাটি দাঁত। আকারেও কম বেশী সেই রকম। রঙটা কালো-সবুজ শ্যাওলার মতো, মুখ অনেকটা শূকরের মতো ছুঁচলো। অতি ক্ষিপ্র আর দ্রুতগামী এবং সজাগ জলচর প্রাণী। মানুষবাহী নৌকোর এবং মনুষ্যবসতি ডাঙার কাছোপিঠেই তারা ঘুরে বেড়ায়। আর সুযোগ পেলেই ধারালো দাঁতে নিমেষে অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে নেয়। কুমীর তবু চিবিয়ে খায়, কামট যান্ত্রিক ধারালো করাতের মতো চোখের পলকে শরীর টুকরো টুকরো করে দেয়।

অতঃপরও যে আমরা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মগুলো সারতে পেরেছি। সেটা ভাগ্য বলতে হবে। নোনাজলে স্নান করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। সারা গা যে কেবল চটচট করে তাই না, শুকিয়ে যাবার পরে চুলকাতে আরম্ভ করে। সুন্দরবনের মাঝিদের একটা বড় চর্মরোগই হলো দাদ। হাজার কথা তো বাদই দিলাম।

সাত জেলিয়াতে আমরা কেবল স্নান করলাম না। জালার জল যতোখানি ব্যয় হয়েছিল তা আবার পূর্ণ করে নিলাম। গোটা কয়েক মুরগীও কেনা গেল। সত্যি বলতে কি, মুরগী কেনার কোনো দরকারই আমাদের ছিল না। নিতান্ত মুখের স্বাদ বদলাবার জন্যই কেনা হয়েছিল। মাছ আমরা প্রচুর পেতাম। ভোরবেলা যে কোন নদীর বুকেই জেলে-মাঝিরা যখন জাল তুলতো, প্রথম সূর্যালোকে জালে আটক পড়া নীলকান্তমণি রঙের ভেটকির গায়ে যেন সাত রঙ খেলে যেতো। অথবা রূপালি আভাস। অতি তৈলাক্ত স্বাদু মাছ। দামেও পেতাম অনেক কম।

সাত জেলিয়ার পরে পঞ্চম দিন রাত্রে আমাদের কুমীরখালি পৌঁছুবার কথা। এবং সেখানেই রাত্রিবাস হবে এরকম ঠিক ছিল। কিন্তু সত্য সাঁইয়ের মতো মাঝিও রাতের অন্ধকারে ঘোষণা করলো, পথ ভুল হয়েছে। ইতিমধ্যে রান্না হয়ে গিয়েছিল। আমরা কম্বল আর লেপ মুড়ি দিয়ে ছইয়ের ভিতরে হারিকেনের আলোয় তাস খেলছিলাম।

তখন ভাঁটা চলছিল। পথ ভুলের কথা শুনে বাইরে গেলাম। দুটো দাঁড় পড়ছিল ঝপ্ ঝপ্ করে আর অন্ধকারে দাঁড়ের আঘাতে জলের মধ্যে •ফসফরাসের জন্য অজস্র জোনাকির মতো জল ছিটকে উঠছিল। দিগন্তব্যাপী আর কিছুই দেখা যায় না। তারাভরা আকাশ আর দিগন্তবিস্তৃত জল মেশামেশি করে আছে।

সত্য সাঁইকে কেমন চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন দেখলাম। সে উৎকর্ণ হয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলো। আমরা ভয় পেলাম, বোধ হয় নৌকা সমুদ্রের অকূলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বললো, 'সমুদ্র না, ডাকাত। আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, এখানে প্রায়ই ডাকাতি হয়।'

তারপরেই সাঁইদারের নির্দেশ, হারিকেন নিভিয়ে দিন। কেউ বিড়ি-সিগারেট খাবেন না। একটি আলোর বিন্দুও যেন দেখা না যায়। কথাবার্তা একদম বন্ধ। একটি কথাও যেন কেউ উচ্চারণ না করি। এবং মাঝিরা ছাড়া আমরা সকলেই যেন ছইয়ের ভিতরে থাকি। এই নির্দেশের পরে ছইয়ের মধ্যে আমরা কেবল

নিজেদের বুকের স্পন্দনের শব্দ শুনতে লাগলাম। সে শব্দ দাঁড়ের ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দের থেকেও যেন প্রচণ্ড হয়ে বাজছিল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক এইরকম রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতার পরে সত্য সাঁইয়ের স্বরে বিপদ-মুক্তির সাইরেন শুনতে পেলাম, 'বাবুরা, বাতি জ্বালেন, এবারে খেয়ে নেয়া যাক। খারাপ জায়গাটা পেরুইয়ে এসেছি।'

ভোরবেলার ঝাপসা কুয়াশায় আবিষ্কার করা গেল, আমরা পাখিরালা বন-বিভাগের অফিসের ঘাটের নিচে রয়েছি। আমার এক বন্ধু বোধ হয় রাত্রের উদ্বেগের ধকল সহ্য করতে পারছিল না। সে মুখে জল না দিয়েই হুইস্কির বোতল তুলে নিট্‌ চুমুক দিল।

তারপরে আমরা যখন বড বড় মোটা গাছের গুঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে বনবিভাগের অফিসের মাটিতে পা দিলাম, তখনই একটা ঘরের ভিতর থেকে রীতিমতো ধমকানো আর উদ্বিগ্ন চিৎকার শুনতে পেলাম, 'আরে মশাই, কে আপনারা? কোন্‌ সাহসে এখানে উঠে এসেছেন? তিন দিন ধরে একটা বাঘ অফিসের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শীগ্‌গির পালান।'

আমরা নিরস্ত্র বন্ধুরা আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি সেই পলিপড়া পিছিল কাঠের গুঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। একজন আছাড়ও খেলো। কিন্তু আমরা প্রাণে বাঁচলাম।

আমার এসব বিষয়কেও বিংশ শতাব্দীর অর্ধশতক অতিক্রান্ত কপালকুণ্ডলার ভূমিকাই বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার নবকুমারকে আমাদের মতো বিপত্তি ভোগ করতে হয় নি। কামট কুমীর ভূত বাঘ ইত্যাদির কথা কপালকুণ্ডলা পড়তে গেলে মনেই আসে না। বরং আরণ্যক ভয়াবহতার মধ্যে কেমন একটা রোমান্টিক ভাবই জেগে ওঠে। তারপরে যখন শুনতে পাই, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' তখন তো মনে হয়, নবকুমারের পরিবর্তে আমিই কেন সেখানে উপস্থিত হতে পারলাম না! রমণীর স্বরে সেই কথা উচ্চারিত হওয়া মাত্র, সুন্দর বনের ভয়াবহতার কথা আর একটুও মনে থাকে না। সুন্দরবন হয়ে ওঠে এক রহস্যময় নন্দনকানন।

এখন বেলা প্রায় বারোটা। ভোরবেলাই পাখিরালার স্যাংচুয়ারির মাচায় আমরা চুরি করে উঠেছিলাম। আমাদের কোনো অনুমতি ছিল না এবং বিনানু-মতিতে অভয়ারণ্যের খালে যাওয়া বা মাচায় ওঠার অধিকার আমাদের ছিল না।

কিন্তু আমরা নিরস্ত্র, শিকার আমাদের লক্ষ্যও ছিল না, লাভের মধ্যে একটু পাখি দেখা। এই চৌর্যবৃত্তিটুকু আমরা না করে পারি নি। এমন কি বাঘের ভয় থাকা সত্ত্বেও। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে আমরা কুমীরখালির উদ্দেশে রওনা হলাম।

বেলা বারোটার সময় যখন রান্নাবান্না প্রায় শেষ, আমরা আবার স্নানের জন্য উন্মুখ হলাম। কিন্তু মিষ্টি জল পাবার কোনো উপায় নেই। আমরা কোমরে সংক্ষিপ্ত বাস জড়িয়ে খালি গায়ে মাচার রোদে বসেছিলাম।

এমন সময় আমাদের চোখে পড়লো একখণ্ড জমি। একটি ছোট্ট দ্বীপ, যেন জলে ভেসে রয়েছে। বড় গাছপালা চোখে না পড়লেও জনমানবহীন ছোট্ট দ্বীপটিকে সবুজ দেখাচ্ছিল। আমাদের সকলের দৃষ্টিই দ্বীপটি আকর্ষণ করলো। দ্বীপটির পঁচিশ-তিরিশ হাত দূর দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। আমি প্রস্তাব করলাম, 'মিষ্টি জলের সন্ধান পেয়ে স্নান করতে আমাদের অনেক দেরি হবে। আমরা এই দ্বীপে নেমে গায়ে তেল মাখতে পারি, তারপরে খানিকটা রোদ খেয়ে নোনা জলেই স্নানটা সেরে নেওয়া যেতে পারে। গায়ে যা জ্বালা ধরেছে, একটু স্নান না করলে আর চলবে না।'

আমাদের মধ্যে যে সাঁতার জানে না সে বললো, 'নোনা জলেই না হয় চান করবো, কিন্তু জলে নামবো কী করে? এখানে কুমীর না থাক, কামট কি নেই?'

কামটের কথা আমার মনেই ছিল না। আর এক বন্ধু বললো, 'তা ছাড়া এ দ্বীপে আমাদের নামা উচিত হবে কী না, সেটাও জানা দরকার।'

নিঃসন্দেহে। সত্য সাঁইয়ের অনুমতি না পেলে আমরা দ্বীপে নামতে পারি না। তবে দ্বীপটি সবুজ দেখে আমার মনে হলো, ভরা বর্ষায়ও হয়তো দ্বীপটি পুরোপুরি জলে ডোবে না। অন্যথায় সবুজ হাঁটুসমান জঙ্গলে ভরে উঠতো না। আমি সত্য সাঁইয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কি ওই ডাঙায় নেমে একটু তেল মেখে চান করতে পারি?'

সত্য সাঁই দ্বীপটির দিকে তাকিয়ে দেখলো, বললো, 'তা পারেন। ভয় হলে নামতি পারবেন না। একটা বালটিতে দড়ি বেঁধে দিতেছি, জল তুলি তুলি মাথায় ঢালতে পারবেন।'

বলেই সে হালে মোচড় দিয়ে মুখ ঘোরালো। তার কথা শুনে বড় আনন্দ পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা জোয়ারের জলে ডুবে যায় না?'

সত্য সাঁই বললো, 'ইদানী বছর-দুই ধরি দেখতিছি ডাঙ্গাটা জাগতিছে। মনে হয় কি, আর দু-এক বছর বাদে এটা আরো বড় হবি, ত্যাখন আবাদ হাতি পারবে।'

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, দ্বীপটির একটা অংশ খানিকটা উঁচু ঢিপির মতো উঠে গিয়েছে। সেদিকটায় এক শ্রেণীর গাঢ় সবুজ লতানে ঝোপঝাড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে। সত্য সাঁইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ ডাঙায় বাঘ বা কুমীর নেই তো?'

সত্য সাঁই হেসে বললো, 'আইজ্ঞে না। ওঁয়ারা (বাঘ কুমীর) এখেনে কী করতি থাকবেন বলেন? খাবেনটা কী? জঙ্গল বাডলি পরে জানোয়ার-টানোয়ার থাকলি ওঁয়ারা থাকতেন। সোম্সারের জীব যেখেনে খাতি পায়, সেখেনে যায়। তয় মেছো কুমীর এক আধটা থাকলি থাকিতিও পারে। একটু দেখে শুনি চলবেন।'

আবার মেছো কুমীর কেন? মনে একটু ভয়-ভয় ভাব থেকে গেল। কিন্তু ডাঙায় নামতে পারার আনন্দে সে ভয় বেশিক্ষণ টিকলো না। মাটির ওপরে রোদে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে কতো দিন তেল মাখি নি! শত হলেও ডাঙার জীব আমরা। দু-এক দিন জলে থাকলেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়। আজ আমাদের সপ্তম দিন।

নৌকা দ্বীপের ভূমি স্পর্শ করলো। এক জোয়ান দাঁড়ি দড়ি ধরে লাফিয়ে নামলো, আর একজন লোহার ভারি নোঙর ছুঁড়ে ফেলে নিজেও লাফিয়ে নামলো। তারপরে নোঙর গাঁথলো। আমরা তেলের শিশি, সিগারেটের প্যাকেট, তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে আণ্ডারওয়্যার পরে নামলাম। শীতকাল বটে, তবু মাটির ঠাণ্ডা স্পর্শে যেন একটি অনির্বচনীয় সুখানুভূতি হলো।

দ্বীপের যে গাছগুলো হাঁটুসমান মনে হয়েছিল, এখন দেখলাম সেগুলো প্রায় কোমরের সমান। দেখতে অনেকটা আসশ্যাওড়ার মতো, কিন্তু তা নয়। গাছের পাতাগুলো তার চেয়ে বড। অনেকটা ডুমুরের মতো, তবে খসখসে নয়, মোলায়েম। এক বন্ধু হুইস্কির বোতল নিয়ে নামতে ভোলে নি। সকলেই আমরা যেন মুক্তির স্বাদ পেলাম। সিগারেট ধরিয়ে সবাই যে যার ইচ্ছামতো ছড়িয়ে পডলাম।

অল্প অল্প বাতাস বইছে। গাছের মাথাগুলো হেলে পডেছে। নীল আকাশ চারদিকে দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি। উত্তরদিকে আকাশের গায়ে ঠেকে আছে গাছপালাহীন একটি ভেড়ি বাঁধের রেখা। পূব-দক্ষিণে কোনো গভীর বনের সীমানা

জেগে আছে, দেখাচ্ছে একটি কৃষ্ণনীল দ্বীপের মতো। সেই দিকেই কিছু দূরে জলের বুকে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে কয়েক সহস্র বেলেহাঁস। মাঝে মাঝে তাদের অদ্ভুত ডাক শোনা যাচ্ছে।

আমার কৌতূহলিত দৃষ্টি উঁচু ঢিবির দিকে। আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললাম। জমিতে এখনো বালির ভাগই বেশি। মৃত্তিকার জন্ম হয় নি। যতই এগোতে লাগলাম ততই গাছগুলো যেন পাল্লা দিয়ে বড় হতে হতে আমার বুক আর মাথার সমান হয়ে উঠতে লাগলো। এক ধরনের লতাঝোপও গাছ-গুলিকে জড়িয়ে উঠছে। আমার ভয় হলো জোঁকের জন্য। জোঁককে আমার বড় ভয়। তবে নোনাজলে জঙ্গলে জোঁকের কথা কখনো শুনি নি। বড় বড় মিষ্টিজলের বাওরে জোঁক থাকে। আর জোঁকের সব থেকে বেশি উৎপাত দেখেছি তরাইয়ে, পাহাড়ে আর আসামের জঙ্গলে, যেখানে নোনার কোনো স্পর্শ নেই।

আমি হঠাৎ থম্‌কিয়ে দাঁড়ালাম। আর একটু হলেই আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসতো। কিন্তু আমি রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে আমার বাঁদিকে তাকিয়ে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অভাবিত আর অবিশ্বাস্য দৃশ্য। একটি মেয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখছে। সম্ভবতঃ আমার বন্ধুদেরই সে দেখছে। এবং এমনই নিবিড় অন্যমনস্ক আর কৌতূহল, কিছুটা উদ্বেগেও দেখছে, আমাকে সে দেখতেই পেলো না। টেরও পায় নি, আর একজন মানুষ তার কাছ থেকে মাত্র দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

এই দ্বীপে মানুষ! তাও একটি মেয়ে? বয়স ষোল-সতরোর বেশি কোনোমতেই না। গায়ের রঙ কালো, স্বাস্থ্যটি উজ্জ্বল। মুখের এক পাশ থেকে দেখে মনে হচ্ছে, নাক তেমন চোখা নয়, চোখ ভাসা-ভাসা। চোখে রোদ পড়ে ঝক্‌ঝক্ করছে। বিস্ময়ে আর কৌতূহলে তার ঠোঁট ফাঁক হয়ে গিয়েছে, সাদা কয়েকটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। নাকের নিচেই ওপর-ঠোঁটের ওপরে একটি চুটকি নোলক দুলছে। সেটি সোনা বা পিতলের বুঝতে পারছি না। গায়ে কোনো জামা নেই। নীলের ওপরে কালো ডোরাকাটা কালো পাড়েরই একটি সস্তা শাড়ি তার পরনে। পুষ্ট বাহু, উদ্ধত বুক, ক্ষীণকটির নীচেই সুগঠিত কোমর থেকে স্তম্ভের মতো উরুদেশ। দুই হাতে লাল আর নীল কাঁচের চুড়ি।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তদুপরি মানুষ দেখে কেমন যেন ভয় হতে লাগলো। এখানে মানুষের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। চাষআবাদ নেই, জেলেদের মাছ শুকোবার

কারবার নেই। তাহলে দুই চারটি নৌকা অন্ততঃ দেখা যেতো। নৌকায় আসবার সময় অন্য কোন নৌকাকে নোঙর করে থাকতে দেখি নি।

শহরের মানুষ হিসাবে এবং আধুনিকতার বড়াই থাকা সত্ত্বেও, ভূতের প্রসঙ্গটা আমার বুকের স্পন্দনের সঙ্গে বাজতে লাগলো। এ কোনো অশরীর মায়া নয় তো? যাই হোক আমি পালাতে চাই, মেয়েটিকে বা সে যাই হোক, ফাঁকি দিয়ে। ফিরে গিয়ে বন্ধুদের বিশেষ করে সত্য সাঁইকে এ খবরটা দিতে চাই।

ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামান্য নড়তেই মেয়েটি সচকিত বাঘিনীর মতই ঝটিতি আমার দিকে ফিরে তাকালো। ঘাড়ের ঝটকায় তার কপালে চুল এলিয়ে পড়লো। আমি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম। মেয়েটির চোখেমুখে প্রথমে আপার বিস্ময় ও ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। এবং তারপরেই তার মুখ আর ভাসা-ভাসা চোখের দৃষ্টি যেন কঠিন হয়ে উঠলো। কিন্তু আমি মানুষ। বিস্ময়-চমকের মধ্যেই একটা মুগ্ধতা আমার চোখে ফুটে উঠলো। মেয়েটির কালো মুখখানি যে এত সুন্দর, এই নির্জন দ্বীপবাসের রুক্ষতাও তা ম্লান করতে পারে নি। তার মুখে একটা তেজোদৃপ্ত ভাব।

আমার চোখে চোখ রেখে কয়েক পলক দেখেই মেয়েটি পিছন ফিরে দৌড দিল। আমি কী করবো ভেবে পেলাম না। পালাবো? চিৎকার করে সবাইকে ডাকবো? কিন্তু নিজের আচরণে আমি নিজেই বিস্মিত হলাম। মেয়েটির পলায়মান পথের দিকেই আমি এগিয়ে চললাম। এক অতি আকর্ষক চুম্বকের টানে আমি যেন নিশি-পাওয়া ঘোরে চলতে লাগলাম। কিছুটা দূরে গাছের পাতা নড়ে উঠতে দেখে সেই দিকে গেলাম। কিন্তু মেয়েটিকে আর দেখতে পেলাম না।

আমি তখন ঢিবিটার কাছে। আমার নাকে একটা দুর্গন্ধ লাগলো। প্রথমে মনে হলো শুকনো মাছের গন্ধ। কিন্তু শুকনো মাছের গন্ধ আমার চেনা। এ গন্ধ যেন আরো বিকট আর চামসা। কিসের গন্ধ হতে পারে? মানুষ মরে পড়ে নেই তো কোথাও? একবার ভাবলাম ফিরে যাই। কিন্তু পারলাম না।

মানুষ সব সময়ে দৈবকে এড়িয়ে যেতে পারে না। সে নিজেই তাকে টেনে নিয়ে যায়। আমি নিচের দিকে তাকালাম। মানুষের পায়ের ছাপ স্পষ্ট বাঁদিকে গিয়েছে। আমি সেই ছাপ অনুসরণ করে ঢিবিটা প্রদক্ষিণ করতে উত্তরদিকে বাঁক নিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম গোলপাতার একটি অবিন্যস্ত ছাউনি

ঢিবির নিচেই যেন গুঁড়ি মেরে রয়েছে। কয়েকটি ছোট ছোট মোটা গাছের গুঁড়ির ওপরে গোলপাতার চাল মাটি স্পর্শ করেছে। ভিতরে প্রবেশের একটি প্রায় সুড়ঙ্গের মতো ফাঁক। নিশ্চয়ই মাথা নিচু করে উপুড় হয়ে ঢুকতে হয়।

এটি যদি একটি বাসস্থান হয়, তবে বাইরে থেকে তা দেখবার কোনো উপায় নেই। ঢিবির নিচেই অন্যান্য গাছের সঙ্গে গোলপাতার চাল মিশে রয়েছে। তারপরেই আমার চোখে পড়লো, কতকগুলো হাড়গোড় আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু স্পষ্টতই তা মানুষের নয়। কোনো জন্তু-জানোয়ারেরই হবে। গন্ধ এখান থেকেই উত্তরের বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারপরেই হঠাৎ আমার চোখে পড়লো একটি ছোট বাহারি নৌকা। ভেজা হোগলা পাতা দিয়ে ঢাকা।

কী এর অর্থ? নিশ্চয়ই কেউ এই নৌকায় বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। কিন্তু কোথায় গেল সেই মেয়েটি? আমি কি কোনো ডাকাতের আস্তানায় এসে পড়েছি? এই কথা ভাবতেই গোলপাতার ছাউনির সুড়ঙ্গের ফাঁকে সেই মেয়েটির মুখ দেখা গেল। যেন সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে একটা বাঘিনী উঁকি দিয়ে আমাকে দেখছে। তারপরেই আমার বুক হিম করে দিয়ে একটি লোহার নল আমার দিকে এগিয়ে এলো। বন্দুকের নল। দেশী পাইপগানের নল আমার অচেনা না।

আমি চিৎকার করে ওঠবার আগেই মেয়েটিকে সরিয়ে দিয়ে একটি মূর্তি বেরিয়ে এলো। পেশীবহুল শক্তপোক্ত খালি গা একটি মধ্যবয়স্ক লোক। মাথায় কাঁচাপাকা রুক্ষ বাবরি চুল, গোঁফদাড়ি ভরা মুখ। গলায় একটি তাবিজ, স্পষ্টই সেটা বাঘের নখের তাবিজ। পরনে একটা লুঙ্গি। হাতে তার একটি পাইপগান। কিন্তু তা আমার দিকে উদ্যত নয়। লোকটির দুই চোখে বাঘের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। মেয়েটি বোধহয় এসে তার পাশে দাঁড়ালো।

মেয়েটির চোখে-মুখে এখন সেরকম কাঠিন্য নেই। কেবল বিস্ময় আর কৌতূহলে ভরা। দুজনেই আমার আণ্ডারওয়্যার পরা খালি গায়ের আপাদমস্তক দেখলো। তারপরে লোকটিই প্রথম গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কে বাবা? এখেনে কী করি আলেন?'

আমি যেন একটু ভরসা পেলাম। এ নিতান্ত কাপালিক না, মেয়েটিকেও কপালকুণ্ডলার মতো বন্দিনী মনে হলো না। লোকটির কথার মধ্যেও কিঞ্চিৎ কোমলতা আর সম্ভ্রমের স্পর্শ আছে। আমি সত্যি কথাই বললাম।

আমার কথা শুনে লোকটির চোখমুখের ভাব একটু নরম হলো। বললো, 'আমার বেটি ছাওয়ালের মুখিও তাই শোনলাম। কলকাতার থেকে আসিছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

লোকটি আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথা থেকে নৌকা নিইছেন, মাঝির নাম কী?'

বললাম, 'মোল্লার হাট থেকে। মাঝি সত্য সাঁই।'

লোকটি মেয়েটির দিকে তাকালো। মেয়েটি হাসলো। তার নোলক দুলে উঠে চিকচিক করলো। বেটি ছাওয়াল মানে নিশ্চয়ই কন্যা। এরা তাহলে পিতা-পুত্রী? কিন্তু এখানে কী করে? হাতে এই দেশী পাইপগান বা কেন?

মেয়েটির সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হতেই এবার তার মুখে লজ্জার ছটা ফুটলো। লোকটি বললো, 'ময়না, বাবুকে একটা চ্যাটাই পাতি বসতি দে। তামুক খাবেন?'

রীতিমতো আতিথেয়তা। মেয়েটির নাম ময়না? কপালকুণ্ডলা নয়? বললাম, 'আমি তামাক খাই না।'

ময়না একটা হোগলার চাটাই নিয়ে বাইরে আসতেই লোকটি আবার বলে উঠলো, 'থাক, বাইরি বসতি লাগবে না। আপনি ঘরের ভিতর চলেন।'

ঘরের ভিতর? ঐখানেই কি হাড়িকাঠ আছে নাকি? ময়না কিন্তু হেসে উঠে মুখে আঁচল চেপে এই প্রথম কথা বললো, 'বাপজানের মাথার ঠিক নাই।'

লোকটি হাসলো। গোঁফদাড়ির মধ্যে তার শক্ত অটুট দাঁতের সারি দেখতে পেলাম। বললো, 'তুই ঘরের মধ্যি বাতি জ্বালা গা।'

ময়না আর একবার আমার দিকে দেখে হেসে হোগলার চাটাই নিয়ে ভিতরে চলে গেল। আমি বললাম, 'ভেতরে যাবার আর দরকার কী? আমি বরং যাই, আমার বন্ধুরা আমাকে খুঁজবে।'

লোকটি বললো, 'খুঁজলিও আপনারে পাবে না। আসেন।'

স্বর নিরীহ, কিন্তু আমার অমান্য করার সাহস হলোনা। আমাকে এগিয়ে দিয়ে সে পিছনে দাঁড়ালো। ভিতরে উঁকি দিয়ে একটা লম্ফর শিস্ দেখতে পেলাম, তার পাশে আলুলায়িত ময়নার কেশ-মুখ। আর কিছুই চোখে পড়লো না। ঢুকতেই ময়না আঙুল দিয়ে হোগলার চাটাই দেখিয়ে বললো, 'ওটোয় বস।'

বসতে গিয়েই বুক কেঁপে উঠল। দেখলাম আমার দু হাত দূরেই একটি

প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগার অপলক তাকিয়ে আছে। ময়না খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, 'ওটা মরা বাঘ। ছাল ছাড়ায়ে মুণ্ডুটা জোড়া রয়িছি।'

ধড়ে প্রাণ এলো। এখানেও সেই চামসা গন্ধ। তার সঙ্গে তামাক। আরো নানা কিছুর গন্ধ মেশানো। লোকটি ভিতরে ঢুকে বাঘের মুণ্ডটার সামনেই বসলো। পাশে রাখলো বন্দুক। মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখলাম। বাঁশের ফ্রেমের ওপরে গোলপাতা বিছানো। গোলপাতা আসলে খড়ের মতোই লম্বা। কিন্তু খড়ের থেকেও বেশি শক্ত। এক পাশে মাটির হাঁড়িকলসী রয়েছে। পিতলের ঘটি, লোহার কলাই করা দু'একটা থালা দেখতে পেলাম।

লোকটি বললো, 'বাবা, আপনারে একটা কথা কই। আমি ফেরার মানুষ। জঙ্গলপুলিস আমারে খুঁজি ফিরিতেছে। তয় মানুষ খুন করি নাই। বাঘ মেরে আমার নামে হুলিয়া হয়িছি। এখেনে এইসি পালায়ে রয়িছি। এখনও বাঘ মারি, এই বন্দুকে।'

বলে সে বন্দুকটি তুলে দেখালো, দেখিয়ে আবার পাশে রেখে বললে, 'একটা নয়, আরো আছে, নিজের হাতেই বানাই। টোটা কিনতি লাগে। তার জন্যে লোক আছে। আপনি তোরাপ সর্দারের নাম কখনো শুনিছেন?'

তোরাপ সর্দার? নামটা খুবই চেনা লাগলো। কোথাও শুনেছি, না খবরের কাগজে পড়েছি, মনে করতে পারলাম না। বললাম, 'আমার খুবই শোনা মনে হচ্ছে।' লোকটি বললো, 'আমার নাম তোরাপ সর্দার। এক সময়ে বাউলি ছিলাম। এই সোন্দরবনে ঘুরাফিরা করতাম। আমার এক ওস্তাদ ছিল, ওনার কাছে বন্দুক বানানো শিখি, বাঘ মারতে আরম্ভ করি। আজতক অনেক মাইরেছি। কিন্তু বাবা, নিজির জন্যে না, আমার পিছনে লোক আছে। তাদের ট্যাকার কাঁড়ি আছে। তারা বাঘ মারতি পারে না, কিন্তু মরা বাঘের ব্যবসা করে। বড় মানুষ আর সাহেবসুবোদের বিক্রি করে মেলাই টাকা রোজগার করে। আমি বাঘ মারি, ওরা মারে আমারে। তারাই এখেনে আমারে লুকোয়ে রেখিছে। হপ্তায় একদিন ওরা আমারে মিঠা পানি আর চাল ডাল দিয়ি যায়। বাইরে একখান লৌকা দেখিছেন?'

বললাম, 'দেখেছি।'

তোরাপ সর্দার বললো, 'ওই লৌকায় করি আমি সুযোগ মতন বাঘ মারতি যাই। ছাল ছাড়ায়ে মুণ্ডু রেখি, আর বাঘের চার পায়ের নখ, সব রাখি। হাড়

মাংস ফেলি দিই। কিন্তু বাবা, আপনারে বলি, এই বেআইনি কাম আর করতি পারি না, মন চায় না।'

আমার বিস্ময়ের সীমা নেই। জীবনে কথনো এমন একটি লোকের সংস্পর্শে আসবো, এমন এক অজানা দ্বীপে, আর এই কাহিনী শুনবো। জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে কেন করছেন ?'

তোরাপ সর্দার বললো, 'কী উপায় বাবা ? যারা আমারে দিয়ি বাঘ মারায়, তাদের গায়ে বিস্তর তেল, জল লাগে না। পুলিশ তাদের কিছু বইলবে না। তারা আমাকে ধরায়ে দিবে। তার উপরে এই বেটি ছাওয়াল আমার, বয়সটা দেখেন। ওরে আমি কোথায় রাখব ? এক এক সোমায় ভাবি যে, ওরে একটা গুলি করি মারি, তারপরে নিজির গলায় নল ঢুকয়ে গুলি খেয়ি মরি।'

শেষের দিকে তোরাপ সর্দারের স্বর ভারি শোনালো। আমি ময়নার দিকে তাকালাম। সে নত মুখে লম্ফর কাছে বসে আছে। খোলা দীর্ঘ রুক্ষ চুলের রাশি তার মুখের দু-পাশ দিয়ে এলিয়ে পড়েছে। আমি তার ভুরু, নাকের ডগা, নোলক ঠোঁট চিবুক দেখতে পাচ্ছি। সে হঠাৎ তোরাপের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'বাপজান, তুমি তা কোনদিন পারবে না। বন্দুক চালাতি আমি শিখিছি। একদিন আমিই নিজিরি মারি ফ্যালাবো।'

তোরাপের গোঁফদাড়িতে বিষণ্ণ হাসি, বললো, 'অই শোনেন বাবা।'

ময়না ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে বাবার দিকে দীপ্ত চোখে তাকিয়ে বললো, 'এতে আবার শুনবের কী,আছে ? তা না হলি আমারে কও, বন্দুক নিয়ি গোসাবায় যেয়ি তোমার কত্তা বাবুদের খুন করি আসি।'

কৃষ্ণাঙ্গী ময়না কোনো মনস্তাত্ত্বিকের স্বষ্টি জটিল চরিত্রের কপালকুণ্ডলা না। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই রক্তস্তনী শক্তি দেবী কপালকুণ্ডলার মূর্তি। যে কাপালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যায় না। নিজের হাতে খড়্গ ধারণ করতে চায়। আমি বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে দেখলাম। ময়নার চক্ষে আগুন, নাসারন্ধ্র স্ফীত। উদ্ধত বুক দ্রুত নিশ্বাসে ঢেউয়ের মতো ওঠা নামা করছে। নীলের ওপর কালো ডোরায় তাকে অন্য এক রূপদান করেছে।

তোরাপ গম্ভীর মুখে বললো, 'বাঘ মারার জন্যি যদি জেলে যেতি হয়, তা বাবুদের খুন করি যাওয়া ভাল। কিন্তু বেটি, মানুষ তো কথনো মারি নাই।'

ময়না বললো, 'আমি মারব।' বলে আমার দিকে ফিরে বলে উঠলো, 'আমি

বাপজানরে বলি, তুমি আর বাঘ মারতি যেইও না। পুলুশকে বুঝয়ে বললি কি তারা শুনবি না?'

আমি কী বলবো ভেবে পেলাম না। ময়না আমাকে কথাগুলো বলে লজ্জা পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। লম্ফর আলো ওর গায়ে কাঁপছে। অস্বীকার করবো না, আমি এক বিশেষ আবেগের স্রোতে ভেসে চলেছি। মনে হলো, এই পলাতক তোরাপ সর্দারের ঘরে তার মতো করেই তার ঘরে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

আমার এই আবেগ আচ্ছন্নতার মধ্যে বন্ধুদের চিৎকার শোনা গেল। তারা আমার নাম ধরে ডাকছে।

সত্য সাঁইয়ের স্বরও আমি চিনি। সেও 'বাবু বাবু' বলে চিৎকার করছে।

তোরাপ সচকিত হয়ে বাইরের দিকে মাথা নিচু করে তাকালো। বললো, 'বাবা, সত্য সাঁই আমারে চিনে। সে যদি জানতে পারে আমি এখানে আছি, আর আমার উপায় নাই। ধম্মের নাম করি বলি যান, ওদের কিছু বলবেন না।'

সেই ধর্ম যদি মানুষের ধর্ম হয়, তাহলে নিশ্চয়ই বলবো না। কিন্তু এ কি ভয়াবহ অবাস্তব জীবনযাত্রা? এর হাত থেকে কি মুক্তি নেই? আমি আবার ময়নার দিকে তাকালাম।

তোরাপ কী ভেবে বলে উঠলো, 'বাবা, আমার এই বেটিও আজতক তিনটা বাঘ মারিছে। ওরে যদি একটা শাদী দিতে পারতাম! সে যাক বাবা, আমার কথাটা রাখবেন।'

আমি বললাম, 'মানুষের ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে, সত্য সাঁইদের আমি আপনার কথা বলবো না। কিন্তু আপনি এ মেয়েকে নিয়ে এভাবে এখানে আর কতোদিন থাকবেন?

তোরাপ বললো, 'সেটা বাবা খোদায় বলতি পারে, আর দক্ষিণ রায়।'

একটা কথা সহসা মনে এলো। বললাম, 'আপনি তো মুসলমান। আপনি যশোর বা খুলনায় পালিয়ে যান না কেন! সেটা তো ভিন্ন দেশ। এ দেশের পুলিশ আপনাকে ধরতে পারবে না।'

ময়না ক্রূর চোখে আমার দিকে তাকালো। তোরাপ বললো, 'সে কথা যে ভাবি নাই, তা না। কিন্তু বাবা, সে দেশের পুলিশ কি আমারে ছেড়ি দেবে? আমার কাগজ-পত্তর নাই।'

বাইরে বন্ধুদের আর সত্য সাঁইয়ের চিৎকার ক্রমে যেন এদিকেই এগিয়ে

আসছে। আমি বললাম, 'আপনার কোন শাস্তি হবে বলে আমার মনে হয় না। আপনি সব সত্যি কথা বলবেন। দেখুন আপনি জানেন একটা কথা আছে, যুদ্ধে ছল বল কৌশল সবই দরকার হয়। পাশের দেশ ইসলামের দেশ, মুসলমান হলে মাপ। আপনি চলে যান। এ ছাড়া আপনার আর কোনো বাঁচার রাস্তা ছিল না। তবু যদি বলবার আপত্তি না থাকে আপনার সেই বাঘের ব্যবসায়ী বাবুদের নামগুলো আমাকে বলতে পারেন।'

তোরাপ সর্দার দ্বিধা করলো, কন্যার দিকে তাকালো। ময়না বলে উঠলো, 'বল, কেন বলব না! আমিই বলতিছি, একজন যোগেন দয়াল, আর একজন ভূষণ চৌধুরী। তাদের ধান চাল মধুর মস্তব্যবসা আছে।'

তোরাপ বললো, 'বাবা আপনি ওঠেন।'

আমি হামাগুড়ি দিয়ে চালার বাইরে এলাম। আমার পিছনে ময়না আর তোরাপ সর্দার। তোরাপ নিচু স্বরে বললো, 'তয় বাবু, আপনার কথা মতন পাকিস্তানের কথাটাই আমার মনে ধরতিছে। গেলি পরে খুল্‌নেতেই যাবগা।'

চিৎকার ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। আমি যেদিক দিয়ে এসেছিলাম, সেদিকে পা বাড়াতে যেতেই ময়না আমার হাত চেপে ধরলো, টেনে নিয়ে গেল বিপরীত দিকে, এবং রীতিমতো ছুটতে লাগলো। আমার পতনের ভয় প্রতি মুহূর্তে। বেশ খানিকটা ছোটায় পরে ময়না থেমে ফিসফিস করে বললো, 'এখেন থেকে জবাব কর। বল তুমি এখেনে।'

আমি মুহূর্তেই ময়নার মনোগত উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম। আমার বন্ধুরা পাছে তোরাপদের গোপন ডেরায় যাতে চলে না যায়, তাদের বিপথগামী করাই ময়নার উদ্দেশ্য। আমি চিৎকার করে বললাম, 'আমি এখানে।'

ময়না আবার আমার হাত ধরে খানিকটা ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে বললো, 'আবার হেঁকি বল।'

আমি কয়েকবার চিৎকার করলাম। তার উত্তরে বন্ধুদের চিৎকার শোনা গেল, 'শালা বেঁচে আছিস? দাঁড়া যাচ্ছি।'

ময়না ফিক্ করে হেসে উঠলো। আমি তার হাতের দিকে তাকালাম, যে-হাত দিয়ে সে আমার হাত ধরে রেখেছিল। আমি তাকাতেই ও আমার হাতটা ছেড়ে দিল। ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখে লজ্জা ফুটলো। এই শীতেও তার কপালে চিবুকে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। অবিন্যস্ত চুলে তাকে এলোকেশীর মতো দেখাচ্ছে।

আমি বুঝতে পারছি, আমার আবেগ মুগ্ধতা এমন কি রক্তেও সঞ্চারিত হচ্ছে। আমি আমার নাগরিক মনটাকে কথঞ্চিৎ চিনি। কিন্তু এই দুর্জয় কপালকুণ্ডলার কাছে নিজেকে প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। কেবল বলতে পারলাম, 'ময়না, চলি।'

ময়না কোনো জবাব দিল না, ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো। তারপর নিজেই পিছন ফিরে চলতে লাগলো।

কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো। ওর হাসিটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। একটু আবেগও কি চোখের তারায় সঞ্চারিত? ও আবার ঘাড় কাত করে বললো, 'এইস গা।'

বলেই গাছলতাগুল্মের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সত্য সাঁইকে আমি নৌকায় কিছুই বলি নি। মোল্লাহাটে ফিরে গিয়ে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে তোরাপ সর্দারকে চেনে কী না। সত্য সাঁই জবাব দিয়েছিল, 'আরে বাপ্‌রে বাপ! তোরাপ সর্দার তো বাবু আর এক দক্ষিণ রায়। তারে পুলিশ খুঁজি বেড়াতিছি। বাঘেরাও খুঁজি ফিরতিছি। সে মন্তর দিয়ি বাঘেরে ঘুম পাড়াতি পারে। আর তার এক মেয়ে আছে। শুনি বাপ বেটিতে এই সোন্দরবনে বাঘের সঙ্গেই থাকে।'...

এই ঘটনার ছ'মাস পরে, খবরের কাগজে একটি ছোট সংবাদ বেরোয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সংবাদদাতা জানায়, 'বাঘের যম তোরাপ সর্দার নিখোঁজ। অনেকেরই সন্দেহ, সে শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটেই গিয়েছে। সুরকারী হিসাবে এ পর্যন্ত সে প্রায় পনেরোটি বাঘ হত্যা করেছে।......

সংবাদটা আমাকে দ্বিধান্বিত ও বিচলিত করে। তোরাপ কি সকন্যা বাঘের পেটে গিয়েছে, অথবা সীমান্তের ওপারে পালিয়েছে? বাঘের পেটে গেলে সম্ভবতঃ কোনো না কোনো ভাবে জানা যেতো।

বাংলাদেশে বিপ্লবের পর সেই দেশে গিয়াছিলাম। তোরাপের খুলনেয় (খুলনায়) নানা জায়গায় খোঁজখবর করেছি। তোরাপ সর্দারের সন্ধান কেউ দিতে পারে নি। অতএব ময়নারও না।

ময়না না, আমার কাছে সে কপালকুণ্ডলা। নবকুমারের দুর্জয় মোহ আর স্তব্ধ হৃদয়ের কথা শোনবার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা কোনটাই আমার নেই।

সেই দিক থেকে আমার ট্র্যাজেডির রূপটা আলাদা।

'আরে শোভনের কথা বাদ দিন তো! ওর কথার কোনো ঠিক আছে নাকি?' সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক রাধাবিনোদ বললেন, 'দেখুন গিয়ে, কোথায় হয়তো মাতাল হয়ে পড়ে আছে। আজকের বৈঠকের কথা হয়তো ও মনেই নেই।'

সাহিত্য বিভাগের সভাপতি কৃষ্ণ চৌধুরী যুগপৎ ক্ষমা ও ক্ষুব্ধ ভাবের ঈষৎ মিশ্রিত হাসি হেসে বললেন, 'একটু-আধটু মদ দিন বুঝে সময় বুঝে আমরাও খাই। খাই না? তা বলে শোভনের মতো—।'

'না, দিন বুঝে সময় বুঝে বিশ্বসংসারের সবাই কিছু ওই জঘন্য জিনিস গেলে না।' সত্যসিন্ধু রীতিমতো বিরক্ত স্বরে প্রতিবাদ করলেন। তিনি রাধাবিনোদ বা কৃষ্ণ চৌধুরীব মতো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নামকরা পণ্ডিত নন বটে। একটি বৃহৎ ফার্মের একজিকিউটিভ, কিন্তু বিদ্বৎসমাজে বিশেষ কৃষ্টিসম্পন্ন হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। যাকে বলে 'হারাম', মদ্যপান তাঁর কাছে সেই রকম। কৃষ্ণ চৌধুরী অবিশ্যি মিথ্যা কথা বলেন নি, এবং কেউ-ই তথাকথিত মাতাল বা সুরাপায়ী নন্ এবং সত্যসিন্ধু যথেষ্ট বন্ধুবৎসল ব্যক্তি। হেসে বললেন, মাঝে-মধ্যেও ভাই আপনারা যে কী স্বাদে এই বিষগুলো খান, আমি বুঝতে পারি না।'

খ্যাতিমান সমাজতত্ত্ববিদ ব্যোমকেশ বললেন, অথচ আপনি যে-কোম্পানির বিজনেস একজিকিউটিভ, সেই কোম্পানীর ককটেল পার্টি লেগেই আছে। আর আপনাকে সেই সব পার্টিতে হাজিরও থাকতে হয়।'

'থাকতে হয় মানে?' সত্যসিন্ধু প্রায় টাকের কাছে ভুরু তুলে বললেন, 'অ্যারেঞ্জমেনটের দায়-দায়িত্ব পর্যন্ত আমার।'

'অথচ আপনার ভারজিন লিপে একটা সিগারেট আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নি।' দিগেন্দ্রনাথ বললেন। যদিও তিনি একজন স্যানিটারি মেটিরিয়ালের ব্যবসায়ী, কিন্তু সবাই তাঁকে দুর্দান্তানন্দ ধর্মীয় সমাজের একজন বিশিষ্ট সেবক বলে জানে। সেই সাতসকালে পুজোশেষে কপালে লাগানো চন্দনের ফোঁটাটি এখনো প্রায় অমলিন, 'এসব বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমারও অনেক মিল। কিন্তু শোভন থাকলেও এখন কী বলতো বলুন তো!'

'আপনার আর সত্যসিন্ধুবাবুর মুখ থেকে ভাতের গন্ধ বেরোয়।' কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'শোভন ঠিক এই কথাই বলতো।'

সত্যসিন্ধুবাবু ভারি উদার হেসে বললেন, 'শোভনের কথা আলাদা। ওর ওপরে আমি রাগ করতে পারি না। সেটা যে কেবল ও নাট্যকার বলে তা নয়, মেয়েদের সম্পর্কে ওর বাছ-বিচার নেই—মানে, লম্পট—মাতাল। সবই, কিন্তু ওর মনটা ভারি পরিষ্কার, প্যাঁচ-ট্যাঁচ নেই—মানে, কী বল তো—ও যেন সব কিছু উজাড় করে দিতেই এসেছে, তাই না? যা আমরা—সত্যি বলতে কি—ইয়ে—মানে, পারি না। ঠিক কী না, অ্যাঁ?' তিনি তর্জনী তুলে গালের ভাঁজে ভাঁজে হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

ঘরের সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। কেমন একটা অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা তাঁদের সকলের চোখে-মুখে। অথচ একটা রহস্যজনক হাসি চিকচিক করছে সকলেরই চশমার কাঁচে। হ্যাঁ, রাধাবিনোদ ছাড়া সকলের চোখেই চশমা।

'ওহ, বাট নো নো মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ডস।' সত্যসিন্ধু যেন চকিত চমকে, হাসি ও উদ্বেগে বলে উঠলেন, 'তা বলে আমি শোভনের ওই সব ব্যাপারগুলোকে মোটেই সমর্থন করি না। ওর ওই সব সঙ্গী—মানে, সঙ্গিনী-টঙ্গিনী—।'

সবাই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন, 'আমরাও তো সেই কথাই বলছি মশাই। দোজ অল ভালগার ক্রিচার্স—।'

'আফটার অল্ আমরা কোনো ইমমর‍্যাল ট্রাফিকের অংশীদার হতে পারি না।' দিগেন্দ্রনাথ বললেন, 'শোভনের কাছে যা জল ভাত, ঠিক কী না?'

ব্যোমকেশ বললেন, 'নিশ্চয়ই। এই যে আমাদের কৃষ্টি, যা নান্দনিকতা আর সৌন্দর্যের প্রতীক—মানে, আমরা যার উপাসক—।'

'কিন্তু আসল ব্যাপারটা থেকে আমরা ছিটকে যাচ্ছি।' কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'শোভনের প্রসঙ্গটা এমন একটা ব্যাপার নয় যে আমরা আর সব ভুলে যাবো।'

রাধাবিনোদ বললেন, 'মোটেই তা হতে পারে না। তবে আমি বলছিলাম কি, মহাভারতীয় নন্দন পরিষদের কনফারেন্সের আলোচনা কি আজ সম্ভব? প্রিনসিপ্যাল বকুলদির নকল দাঁত গতকাল সন্ধ্যেয় সেট করা হয়েছে উনি আসতে পারবেন না। নগর কলুষমুক্ত সমিতির অরবিন্দবাবু মাথায় কলপ মেখে সারা মুখে মাথায় সাংঘাতিক র‍্যাশ বেরিয়েছে, ঘর থেকে বেরোতেই পারছেন না। চণ্ডীচরণবাবু—।'

'আহা, এত কথার দরকার কী?' ব্যোমকেশ বললেন, 'কনফারেন্সের আলোচনা আজ না হয় মুলতুবীই থাক। সত্যসিন্ধুবাবুর বাড়িতে আমরা রয়েছি, বিপত্নীক মহোদয়ের বাড়িতে আজ না হয় আমরা কিঞ্চিৎ—।'

'মদ্যপান?' সত্যসিন্ধু টাকে ভুরু তুলে আঁতকিয়ে উঠলেন।

'মোটেই না। চা চা চা—আর ফুলকপির সিঙাড়া—আপনার পাচিকার হাতে তৈরি।' কৃষ্ণ চৌধুরী বলে উঠলেন।

সত্যসিন্ধু ভ্রূকুটি-সন্দিগ্ধ চোখে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে আকর্ণ হেসে মাথা ঝাঁকালেন। সবাই হা-হা হে-হে করে হেসে উঠলেন।

'কিন্তু কেষ্টবাবু, সেই মেয়েটির গল্পটা শুরুতেই থামিয়ে দিলেন!' দিগেন্দ্রনাথ করুণ মুখে আবেগের স্বরে বললেন, 'দেয়ার ইজ সামথিং! আপনি গল্পটা শেষ করুন।'

সত্যসিন্ধু ব্যস্তভাবে বললেন, 'এক মিনিট কেষ্টবাবু, আমি চা খাবারের কথাটা ভেতরে বলে আসি।'

কৃষ্ণ চৌধুরী হেসে বললেন, 'আরে মশাই, গল্পটা তো কাগজে বেরিয়েছে, পড়ে নেবেন।'

'পড়ার সময় কোথায় আমাদের বলুন?' ব্যোমকেশ বললেন, 'তাও আবার গল্প-উপন্যাস। আপনি হলেন রুচিশীল পাঠক, দুরন্ত সমালোচক। আমরা আপনার মুখ থেকেই গল্পটা শুনতে চাই।'

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ করে সমর্থন করলেন। সত্যসিন্ধুও ফিরে এলেন। সকলেরই বয়স চল্লিশের ঘর থেকে পঞ্চাশের ঘরে। মাথায় টাক, ধূসর ও কালো চুল, রোগা লম্বা মোটা, ধুতি পাঞ্জাবি ট্রাউজার শার্ট বিভিন্ন রূপের একটি জমাট ঐক্যের সমাবেশ।

কৃষ্ণ চৌধুরী একটি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে, গলা খ্যাকারি দিয়ে বললেন 'গল্পের বিষয়বস্তু এমন কিছু অভিনব নয়। পড়ন্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি রূপসী তরুণীর করুণ পরিসমাপ্তি গল্পের বিষয়বস্তু বলতে পারেন। বলতে পারেন মানে, ব্যাপারটা তাই-ই। লেখকের লেখার গুণে গল্পটি হয়ে উঠেছে একটা আশ্চর্য সৃষ্টি যাকে বলে মহৎ-সুন্দর করুণ!'

'হোয়াট এ ল্যাঙ্গুয়েজ!' ব্যোমকেশ বলে উঠলেন।

কৃষ্ণ চৌধুরী হাত তুলে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'লেখক যেখানে মেয়েটির চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন, ইউনিক। অধিকাংশ লেখক যা করে থাকেন

এই লেখক মোটেই তা করেন নি, অর্থাৎ যাকে বলে ইংরেজি ঘেঁষা বাঙলায় বর্ণনা। রাজশেখর বসু যাকে বলেছেন ইংরেজির গাধাবোটবাহিনী বাঙলা জগাখিচুড়ি ভালগার, এই লেখক সেদিক দিয়েই যান নি।'

'কী চমৎকার ব্যাখ্যা!' দিগেন্দ্রনাথ বললেন।

কৃষ্ণ চৌধুরী হাত তুলে দিগেন্দ্রনাথকে থামিয়ে বললেন, 'এই লেখক তরুণীর রূপের ব্যাখ্যা করেছেন, আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রীয় লক্ষণের যে মৌল বর্ণনার ভাষা সেই ভাষায়। যেমন, রঙ তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, রক্তকপোল বিম্বোষ্ঠা, অশাণিত উচ্চ নাসা, আয়ত বঙ্কিম চোখ, স্বল্পকুঞ্চিত কেশপাশ, সীমিত কপাল। মনে রাখবেন, শাস্ত্রীয় লক্ষণে নারীর ঘন কুঞ্চিত কেশ অলক্ষণে। পীন বক্ষ—।'

'বাহ্‌বা!' সত্যসিন্ধু বিগলিত বিস্ময়ে উচ্চারণ করলেন।

কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'শুনুন। কিন্তু যেন অশক্ত গাছের ডালে কিঞ্চিৎ ভারাবনত যুগল ফল।'

'অতুলনীয়, যেন দেখতে পাচ্ছি।' দিগেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন।

ব্যোমকেশ বললেন, 'আর বেরসিকের মতো কথা বলবেন না, এর পরে হয়তো বলবেন, যেন ছুঁতে পাচ্ছি।'

ব্যোমকেশ ভ্রূকুটি চোখে দিগেন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন। কৃষ্ণ চৌধুরী বলে গেলেন, 'সুবর্ণ দেহটি নির্লোম, ক্ষীণ কটি, মেদহীন নাভিস্থলে নিম্নগামী কোন রোমরেখা নেই। মনে রাখবেন, নাভিস্থলের রোমরেখা রমণীদের অলক্ষণ এবং ঘনবদ্ধ বিশাল শ্রোণিদেশ, স্বর্ণস্তম্ভ উরু ও জানুদেশ।'

'এক কথায় অপরূপ!' রাধাবিনোদ বললেন।

'এবং পবিত্র।' সত্যসিন্ধু তেমনিই বিগলিত স্বরে বললেন, 'যে পবিত্রতা রমণীর শ্রেষ্ঠ অলংকার।'

দিগেন্দ্রনাথ বললেন, 'মশাই, শাস্ত্রে আর এমনি এমনি রমণীর সুলক্ষণগুলো বিচার করা হয়েছিল! কেষ্টবাবু, লেখক মেয়েটির কী নাম দিয়েছেন?'

'অধরা।' কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন।

'অধরা?' সত্যসিন্ধুর টাকে যেন মেঘ নেমে এলো।

সকলের চোখে-মুখেই একটা আহত বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। কৃষ্ণ চৌধুরী করুণ অথচ বিজ্ঞ হেসে বললেন, 'জানি এমন একটি মেয়ের এ-রকম নাম আপনাদের পছন্দ হলো না! লেখক গল্পটির নামও দিয়েছেন, অধরা। আর এখানেই লেখকের মুন্সিয়ানা। অধরা যদি এ-রকম কোনো বিশেষণ হতো, অধর দিয়ে

যার তুলনা দেওয়া যায়, তাহলে মেয়েটিকে রক্তাধরা বলা যেত। কিন্তু অধরাকে অধরাই করেছেন। সেইখানেই আমাদের আজকের সমাজ চিত্র ফুটে উঠেছে, নারীর সংগ্রামের ইতিহাস, এই অবক্ষয়িত সমাজের বুকে ফুটে উঠেছে সেই কাহিনী।' কৃষ্ণ চৌধুরী করুণ গম্ভীর মুখে আবার সিগারেট ধরালেন।

সিগারেট ধরালেন রাধাবিনোদ এবং ব্যোমকেশ। সকলেই গম্ভীর। কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'অধরা টাকার অভাবে পার্ট টু পরীক্ষা দিতে পারে নি। বাবা শয্যাশায়ী, মা অসহায়, ভাইগুলো মস্তান—যাদের আমি আপনারা ভালোই চিনি। আর এর মাঝখানে অধরা একটি হীরকখণ্ডের মত জ্বলজ্বল করছে, যার চারপাশে লোভী জহুরীরা দিনরাত্রি ঘোরাফেরা করছে।'

'মর্মন্তুদ!'

'দুঃসহ!'

'তারপর?'

কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'মনে রাখবেন, অধরার পরেও আছে পর পর দুটি বোন। কিন্তু এই মাংসলোলুপ পশুগুলো বাড়িতে আনাগোনা করতে পারছিল কেন? মস্তান ভাইগুলোর জন্যই। অধরা কী দেখলো? সংসার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ ও ই পারে সংসারটাকে বাঁচাতে। কিন্তু কিসের বিনিময়ে?'

'রূপ!'

'দেহ!'

'আহ্, অসহ্য লাগছে। তারপর?'

কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'অধরা জীবনযুদ্ধে নামলো। সৎভাবে বাঁচবার, বাঁচাবার যুদ্ধ।'

'আহা, শুনে শান্তি'।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'অধরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে নি। অফিসপাড়া থেকে প্রেস দপ্তরীখানা হোসিয়ারি ফ্যাক্টরিতে। কোথাও যেতে বাদ রাখে নি। কাজ কি কোথাও পায় নি? পেয়েছে কিন্তু থাকতে পারে নি। মাংসলোলুপদের হাত সর্বত্র। অধরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছে। প্রজাপতির সনির্বন্ধ বেচারীর কপালে ছিল না। শেষ পর্যন্ত—হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ।'

'আত্মসমর্পণ!' সকলেই আর্তনাদ করে উঠলেন।

কৃষ্ণ চৌধুরী গম্ভীর স্বরে বললেন, 'না, আত্মসমর্পণ নয়, আত্মবলিদান। দেবতার কাছে নিজেকে সমর্পণ, আত্মহত্যা, সৎভাবে বেঁচে থাকার জন্য, অধরা চিরদিন অধরাই রয়ে গেল।'

'গ্রেট গ্রেট !'

'এই হলো আমাদের নারীদের প্রকৃত রূপ।'

'ছিন্নমস্তার কথা মনে পড়ছে আমার।' কৃষ্ণ চৌধুরী বললেন, 'এটাই হলো আমাদের মূল্যবোধের নিরীখ্। কোনো কারণেই এই মূল্যবোধকে আমরা ত্যাগ করতে পারি না।'

'নিশ্চয়।'

'এই মূল্যবোধই তো আমাদের সম্বল।'

'আমাদের জীবনে—।' সত্যসিন্ধু থমকিয়ে চুপ করলেন।

সকলের দৃষ্টি পড়লো দরজার দিকে। শোভন আর তার পাশে একটি রূপসী তরুণী। শোভনের মুখ চোখ অবিন্যস্ত চুল দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে মদ্যপান করেছে। সঙ্গের তরুণীটির আয়ত চোখ দুটিও ঈষৎ রক্তিম। কিন্তু শাস্ত্রীয় লক্ষণের সব মিলিয়ে তার রূপের ঝলক ঘরের মধ্যে বিচ্ছুরিত হলো। অপরিচিত ব্যক্তিদের সামনে সে কিছুটা ব্রীড়াময়; মোহসঞ্চারী বিম্বোষ্ঠে সলজ্জ হাসি। সুরার মৃদু গন্ধের সঙ্গে একটি হালকা সুগন্ধও ছড়িয়ে পড়ছে। শাস্ত্রীয় লক্ষণের সঙ্গে একটু অমিল, তরুণীর বক্ষস্থল অনম্র উদ্ধত।

শোভন হেসে বললো, 'পরিচয় করিয়ে দিই, আমার নতুন নাটকের হিরোয়িন, শ্রীমতী ধরা।'

সকলের চোখে-মুখেই একটি বিস্মিত হাসির উজ্জ্বল ঝিলিক। সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'ধরা !'

'হ্যাঁ, ধরা দেবী। বী-টা বাদ দেবেন না যেন।' শোভন হেসে বললো।

শ্রীমতী ধরা হাত দুটি তুলে নমস্কার করলেন। সকলেই নমস্কার করে একযোগে আহ্বান করলেন, 'আসুন, আসুন ধরা দেবী।'

শোভন বললো, ওর মতো একটি মেয়েকে—ব্যক্তিগত চরিত্র-টরিত্রের কথা বাদ দিন, একজন সুন্দরী রূপসীকে এভাবে ডাকলেই হয়? হাত ধরে নিয়ে যান!'

ঘরের মধ্যে একটা দমকা ঝড়ের পূর্ব-মুহূর্তের স্তব্ধতা। দিগেন্দ্রনাথ দ্রুত কপাল থেকে চন্দনের ফোঁটা ঘষে তুলে ফেললেন। তারপরে পাঁচজনই একসঙ্গে দরজার দিকে দ্রুত ধাবিত হলেন।

'আহা, আস্তে আস্তে। সবাই মিলে ঝাপটে ধরলে ধরা ভয় পেয়ে যাবে না?' শোভন বললো।

শ্রীমতী ধরা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

শোভন বললো, 'সত্যসিন্ধুবাবুর বাড়িটাই নিরাপদ, তাই ধরাকে এখানেই নিয়ে এলাম। আসুন, সবাই এসে একে একে ওকে নিয়ে যান।'

তৎক্ষণাৎ সবাই শ্রীমতী ধরার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালেন। কিন্তু কে আগে হাত ধরবেন ঠিক করতে পারছেন না। ধরা আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো, আর ওর অধরা ধরা-ধরা তনু যেন এদিকে ওদিকে লতিয়ে পড়লো। এবার ধরার গলার সঙ্গে সবাই গলা মিলিয়ে হেসে উঠলেন, আর সবাই তাকে স্পর্শ করে ঘরের মধ্যে নিয়ে চললেন।

শোভন বললো, 'আমাকে কিন্তু একটু খাওয়াতে হবে।'

'হবে হবে, নিশ্চয় হবে।' সত্যসিন্ধু এবং সবাই উল্লাসে কলকলিয়ে উঠলেন।

সামান্য ঘটনা

সামান্য ঘটনাই অনেক সময় এমন অসামান্য রূপ নিয়ে দেখা দেয়, নিজেরই বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল কিছুকাল আগে। ঋতুর দিক থেকে এবং ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী সময়টা ছিল গ্রীষ্মকালের বেলা প্রায় তিনটে। স্থান, কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের সঙ্গমস্থল। আমার প্রতীক্ষা একটি ট্যাকসির জন্যে। আমার এমনই ভাগ্য, বিশেষ করে এই স্থানটিতে ট্যাক্‌সি পেতে বরাবরই আমাকে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয়। বিরক্তির আর সীমা থাকে না। জায়গাটাও এমনই, সকাল-দুপুর সন্ধ্যে সব সময়েই যেন ট্যাক্‌সিযাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকে, ফলে 'দৌড়াদৌড়িও করতে হয়, একটা প্রতিযোগিতা লেগে যায়।

বিশেষ যে-দিনটির কথা আমি বলছি, সেদিন আমার ভাগ্যকে যথেষ্ট সুপ্রসন্ন বলতে হবে। সামান্য সময় অপেক্ষা করতেই একটি ট্যাক্‌সি পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ভিতরে বসলাম, ড্রাইভার মিটার ডাউন করলেন। এমন সময়ে দুটি মহিলা গলদঘর্ম অবস্থায় প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। গরমে ঘামে তাঁদের সাজসজ্জা কিছু বিস্রস্ত ও ম্লান হয়ে পড়েছে। একজন সঙ্কোচ ও লজ্জার সঙ্গে হেসে জানতে চাইলেন, আমার গন্তব্য কোথায়? আমার গন্তব্য শুনে তিনি বিব্রত ও বিনীত অনুরোধ করলেন, তাঁদের যদি মধ্য কলকাতায় একটি বিশেষ সিনেমাগৃহের সামনে নামিয়ে দিই, বিশেষ কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত হবেন। অবিশ্যি ভাড়া দিয়ে দেবার ভদ্র সান্ত্বনাও দিলেন। কিন্তু সময় মোটেই নেই, তাঁদের যেতেই হবে।

আমি মনে মনে কিছুটা বিরক্ত আর অপ্রস্তুত বোধ করলেও তাঁদের অবস্থা দেখে করুণা হলো। আমি পিছনের আসন থেকে নেমে সামনের আসনে যেতে যেতে বললাম, 'উঠে পড়ুন, দেরি করবেন না।'

মহিলা দুজনেই তরুণী। একজনকে মনে হলো বিবাহিতা, আর একজন সম্ভবতঃ অবিবাহিতা। আমার আচরণে দুজনেই অবাক হলেন, একজন বললেন, 'সে কি, আপনি সামনে গেলেন কেন, পেছনেই বসুন না।'

আমি বললাম, 'সেটা সম্ভব নয়। সঙ্কোচ না করে বসুন, আপনারা নেমে গেলে আমি আবার পেছনেই গিয়ে বসবো।'

তরুণীরা নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টি-বিনিময় করে উঠে বসলেন। ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করলো। গাড়ির মধ্যে তাঁদের প্রসাধনের এবং ব্যবহৃত বিলিতি সুগন্ধির গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু আমার মনের বিরক্তি একটুও কাটলো না, বরং বাড়তেই লাগলো। সিনেমায় যখন যেতেই হবে এবং ট্যাক্সিতে বা অন্য কোনো ভাড়াটে পরিবহণের মারফৎ, তখন হাতে আরো সময় নিয়ে বেরোনো উচিত। এরকম তাড়াহুড়ো করে যেন তেন প্রকারেণঃ উপায়ে যেতেই হবে এটা ঠিক নয়। বুঝতে পারছি এসব ভেবে কোনো লাভ নেই, কিন্তু মনের অস্বস্তি আর বিরক্তি আমাকে ভাবাচ্ছে।

পিছনের আসনে তরুণী মহিলা দুজন নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছেন, খুবই নিচু স্বরে। আমার অনুমান হলো, তাঁরা কোনো একটা ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করছেন। 'হ্যাঁ' 'না' 'উঁহু' বা 'বলছি' এই জাতীয় দু-একটি কথা থেকে আমার অনুমান হলো, অথবা আদৌ হয়তো তা নয়।

যাই হোক, রাস্তায় যানবাহনের তেমন ভিড় না থাকায় মধ্য কলকাতার সেই সিনেমা গৃহের সামনে পৌঁছুতে বিশেষ বিলম্ব হলো না। ওঁদের দুজনের মধ্যে একজন তাঁর ব্যাগ খুলে টাকা বের করলেন। আমি সামনের আসন থেকে নেমে বললাম, 'এটার জন্যে ভাববেন না, আমাকে এ রাস্তায় যেতেই হতো। আপনাদের আর দেরি করা উচিত নয়, শো বোধ হয় শুরু হয়ে যাচ্ছে।'

ওঁরা দুজনেই গাড়ি থেকে নামলেন। দুজনের দৃষ্টিতেই বিশেষ একটি কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। বিবাহিতা তরুণী জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা কিছু মনে করবেন না, আপনাকে কেমন চেনা-চেনা লাগছে, কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

অযৌক্তিক এবং হাস্যকর প্রশ্ন। আমি হেসে বললাম, 'বোধ হয় যেখান থেকে ট্যাকসিতে উঠলাম, সেখানেই অনেকবার দেখে থাকবেন।'

আমি দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে উদ্যত হলাম। তরুণী আবার জিগ্যেস করলেন, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

হেসে বললাম, 'কেন নয়? আমি গোয়েন্দা-টোয়েন্দা নই।' বলে আমার নাম বললাম।

শুনেই দুজনের মুখে একটা ত্রস্ত চমকের পরিবর্তন দেখা দিল। অবিবাহিতা বললেন, 'আমি তো তোমাকে তখন থেকেই বলছি, তুমিই মানতে চাইছিলে না।'

বিবাহিতার মুখে লজ্জার ঝলক, কিন্তু বিমর্ষতার ছাপটাও স্পষ্ট। বললেন, 'আশ্চর্য, আমি একবারও বুঝতে পারি নি!'

আমি হেসেই জিগ্যেস করলাম, 'আপনাদের অসুবিধেটা কী হলো?'

তরুণী দুজন পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। দুজনের মুখেই বিব্রত লজ্জার ছটা, কিন্তু বিবাহিতার মুখ একটু ম্লান, এবং একটু যেন শক্তও। বললেন, 'আমি বোধ হয় সিনেমাটা দেখতেই পারবো না, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।'

অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কেন বলুন তো?'

বিবাহিতা চকিতে একবার অবিবাহিতার মুখের দিকে দেখে আমার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বললেন, 'আগে জানলে আমি কখনোই আপনার ট্যাক্সিতে উঠতাম না। আমি আপনার লেখার একজন কঠোর সমালোচক, আপনি আমার সব থেকে অপ্রিয় লেখক।'

অবিবাহিতা ডেকে উঠলেন, 'বৌদি!'

বিবাহিতা তরুণীকে রীতিমতো উত্তেজিত মনে হলো। উত্তেজনা আমার মধ্যেও কম ছিল না। এরকম নাটুকে সমালোচক আমি অনেক দেখেছি, তবু কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে তো! কিন্তু সমালোচনায় আমায় সহনশীলতা অসীম, এটা প্রায় অহঙ্কার করেই বলতে পারি। আমি হেসে বললাম, 'এর জন্যে দুঃখ করবেন না। এটা ভুলে গিয়ে এখন আনন্দের সঙ্গে সিনেমা দেখুন।'

বলে আমি ট্যাক্সিতে উঠে চালককে যাবার নির্দেশ দিলাম। ট্যাক্সি এগিয়ে চললো।

ঘটনার দিন সাতেক পরে একটি পত্রিকা এলো ডাকে। পত্রিকাটি কয়েক মাসের পুরনো, একটি তাত্ত্বিক ইনটেলেকচুয়েল মাসিক পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন বলা যায়। পুরানো পত্রিকা দেখে একটু অবাক হলাম, কিন্তু পাতা ওল্টাতেই রহস্য বুঝতে পারলাম। আমাকে নিয়ে সুদীর্ঘ রচনা পত্রিকাটিতে ছাপা হয়েছে, আর প্রথম লাইন থেকে শেষ অবধি আমার লেখকসত্তাকে অজস্র ছুরিকাঘাতে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে। সমালোচক একজন মহিলা। আমার একটিই মাত্র সান্ত্বনা, সমালোচক মহিলা আমার প্রতিটি লেখা পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করেছেন, কিন্তু ত্রুটি ছাড়া কিছু পান নি।

লেখাটি পড়লাম এবং রেখে দিলাম। এসব আমার কাছে নতুন কিছু না। কারোর চোখে আমার সব কিছুই যদি ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়, আমি কি করতে পারি!

এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই, তবে ত্রুটিগুলো যথাযথ মনে রাখা এক দিক থেকে ভালো। এই পর্যন্তই, তা ছাড়া আমি আর কিছু ভাবি নি। পত্রিকাটির কথা ভুলে যেতেও সময় লাগলো না।

ছ'মাস পরের ঘটনা।

একদিন সকাল দশটা নাগাদ, আমার কলকাতার বাসায় এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। যুবক ভদ্রলোক, সঙ্গে দুজন তরুণী মহিলা। পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাঁর স্ত্রী আর ভগ্নীর সঙ্গে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তরুণী দুজন আর কেউ নন, সেই ট্যাক্‌সির সহযাত্রিণীদ্বয়।

ভদ্রলোক বললেন, 'অনেক পত্রিকা আর প্রকাশকের দরজায় ঘুরে আপনার ঠিকানা আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। আমি মশায় নিরাহ অধ্যাপক মানুষ, আপনার জ্বালায় আমার গৃহের শান্তি নষ্ট হতে বসেছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি, কেন?'

ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার তুমিই বলো, তুমিও একজন অধ্যাপিকা।'

অধ্যাপিকা হলেও, মহিলাকে তরুণীই বলতে হবে। স্বামীর কথায় তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠলো, তিনি বললেন, 'আহা, বাজে বকছো কেন? গৃহের শান্তি আবার নষ্ট হলো কোথায়?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হয় নি? সেইজন্যে আমার বোনটিকেও নিয়ে এসেছি সাক্ষী হিসেবে!'

ওঁরা সকলেই হেসে উঠলেন। অধ্যাপক আবার আমাকে বললেন, 'আপনাকে নাকি উনি কী সব বলেছিলেন, ট্যাক্‌সিতে যেদিন লিফ্‌ট দিয়েছিলেন! তারপর থেকে আবার আপনার বই পড়া শুরু করেছেন। গত দু' সপ্তাহ ধরে আমাকে খালি বলছেন, আপনার কাছে নিয়ে আসবার জন্যে। উনি নাকি এখন খুবই অপরাধবোধে আক্রান্ত।'

আমি ব্যস্তভাবে হেসে বললাম, 'না, না, এতে আবার অপরাধ বোধের কী আছে! আমি তো সে-সব ভুলেই গেছি।'

অধ্যাপিকা বললেন, 'সেটাই আপনার সুবিধে, কিন্তু আমি ভুলতে পারি নি। আপনি কি একটা পত্রিকা পেয়েছিলেন, যাতে আপনার ওপর একটি লেখা ছিল?'

তিনি পত্রিকাটির নাম বললেন। তৎক্ষণাৎ আমার তা মনে পড়ে গেল। বললাম, 'হ্যাঁ পেয়েছি, পড়েছিও। কিন্তু তার জন্যে—।'

অধ্যাপিকা আমাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তার জন্যে আমি নতুন করে আপনার লেখা আবার পড়েছি। যতটা খারাপ মনে হয়েছিল, এখন আর তা ঠিক মনে হচ্ছে না।'

অধ্যাপক অর্থাৎ ভদ্রমহিলার স্বামী বলে উঠলেন, 'আরো পড়ো, দেখবে আস্তে আস্তে আরো কম খারাপ লাগছে।'

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম এবং আমি তাঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলাম।

* বিশেষ কারণে আমার নিজের নাম ছাড়া বাকী চরিত্রদের প্রকৃত নাম প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।—স. ব.